জাতীয় নিরাপত্তা রণনীতি ও সশস্ত্রবাহিনী

আবু রূশ্‌দ

ক্ষুদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর রাষ্ট্র হলেও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি অবহেলা করা যায় না। অবশ্য স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে অব্যাহতভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান সশস্ত্রবাহিনীকে ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলেও সত্য যে, এযাবত বাংলাদেশের রণনীতি নিয়ে কোন সরকারই বাস্তব কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অথচ বাংলাদেশে ১৪ কোটি লোকের বসবাস এবং এশদেশটি রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়েই স্বাধীন হয়েছে।
এ বইটিতে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় নিরাপত্তা, রণনীতি, প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এসাথে রয়েছে বেশক'জন সাবেক সেনা, বিমান বাহিনী প্রধানসহ অবসরপ্রাপ্ত উর্ধতন সামরিক কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা গবেষকদের সাক্ষাৎকার। এতে তারা বাংলাদেশের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ, রণকৌশল, রণনীতি নিয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন। উল্লেখিত প্রসঙ্গে বইটিকে একটি পরিপূর্ণ উপস্থাপনাও বলা যায়।
আশাকরি 'জাতীয় নিরাপত্তা, রণনীতি ও সশস্ত্রবাহিনী' বইটি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে পাঠকদের অনেক প্রশ্নের জবাব পেতে সহায়তা করবে।

–প্রকাশক

জাতীয় নিরাপত্তা, রণনীতি
ও
সশস্ত্রবাহিনী

আবু রুশ্‌দ

পি পি এল

প্রকাশক
শহিদুল ইসলাম
পিপিএল
১৩/এ-৮/এ, বাবর রোড, ব্লক বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১১৮১১৭৯২

প্রথম সংস্করণ
১৫ জুলাই ২০০৩

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

কম্পিউটার কম্পোজ
স্কাই টাচ্ ইন্টারন্যাশনাল
১৪৪, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-32-0796-3

মূল্য
৩০০.০০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি জীবন দিয়েছেন
সেই অকুতোভয় সৈনিক
বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ-এর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

লেখকের কথা

১৯৮৪ সালের ১৮ জানুয়ারী যখন বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীতে যোগ দেই তখন সেনা কর্মকর্তা হওয়ার অদম্য আগ্রহ নিয়েই সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলাম। দীর্ঘ দু'বছর যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি। মোটামুটি ভাল ফলাফল ও শারীরিক সক্ষমতা নিয়েই ১৯৮৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর কমিশন লাভ করি। যাক, ওসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। তবে ১৯৮৯ সালের জুনে যখন স্বাস্থ্যগত কারণে অবসর গ্রহণ করে এলপিআর-এ চলে যাই তখন হতাশা ছাড়া সামনে আর কিছুই ছিল না। তদানীন্তন সরকার ত্বরিত বেসামরিক পর্যায়ে সরকারী চাকুরীর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু যোগ দেইনি। একসময় হতাশা কাটিয়ে ওঠার জন্য পত্র-পত্রিকায় কলাম লেখা শুরু করি। সেনাবাহিনীতে জুনিয়র অফিসার হিসেবে অবসর নিলেও সামরিক বিষয়েই বেশী লিখতাম। কারণ, ঐ পেশাকে আমি ভুলতে পারিনি। এখনো সেনা জীবনের স্মৃতি আমাকে তাড়িয়ে ফিরে।

এরপর একদিন জনাব এলাহী নেওয়াজ খান (বর্তমানে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি) আমাকে সাংবাদিকতায় নিয়ে আসেন। আজ প্রায় এগার বছর হতে চললো এই পেশাতে আছি। এই বইটিও সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত থাকার জন্যই লিখতে পেরেছি। দীর্ঘ প্রায় চার বছর প্রাত্যহিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাকে বইটির জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ সময়ে অনেক প্রখ্যাত সামরিক কর্মকর্তা যাদের মাঝে বাহিনী প্রধানগণও ছিলেন তাদের মতামত নিয়েছি, সাক্ষাতকার গ্রহণ করে পত্রিকায় ছাপিয়েছি। বিশেষ করে যারা এদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা কৌশল প্রণয়নে রত ছিলেন তাদের মতামত নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও সশস্ত্র বাহিনীর রূপরেখা বিষয়ে আলোকপাত করেছি। এক্ষেত্রে লে. জে. (অব.) মীর শওকত আলী, বীর উত্তম, পিএসসি; লে. জে. (অব.) মাহবুবুর রহমান, পিএসসি; ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান, মে. জে. (অব.) এম এ মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি ও মে. জে. (অব.) ইমামুজ্জামান, বীর বিক্রম, পিএসসি'র নাম বলা যায়। তাঁরা হাসিমুখেই সবসময় আমার 'যন্ত্রণা' সহ্য করেছেন। তাছাড়া ২০০০ সালে দৈনিক ইনকিলাব-এর জন্য অপরাপর যাদের সাক্ষাতকার নিয়েছি তারাও তাদের মতামত প্রকাশ করে সার্বিক সহায়তা করেছেন।

বইটিতে সম্ভাব্য সামরিক কৌশল ও ট্যাকটিক্যাল বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা না হলেও (যা সম্ভব নয়) বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে একটি রূপরেখা বা দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, গণবাহিনী না কনভেনশনাল আর্মি-এই বিতর্কের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের যুক্তি তুলে ধরে পাঠকের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত নেবার প্রসঙ্গটি। একইভাবে সেনাবাহিনীতে ট্যাঙ্ক বেশী প্রয়োজন না সে টাকায় পদাতিক বাহিনীর সম্প্রসারণ যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে সমর বিশেষজ্ঞদের মতামতকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর কোনটি ঠিক সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব নীতি নির্ধারকদের। অন্ততঃ একটি কথা জোড় দিয়ে বলতে পারি যে সশস্ত্রবাহিনী ও জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা এবং পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করার যে অচলায়তন

এদেশে ছিল সীমিত পরিসরে হলেও তা ভাঙ্গার চেষ্টা করেছি আলোচ্য বইটিতে। আরো বলতে হয়-বাংলাদেশে সশস্ত্রবাহিনী নিয়ে একটি মহল বরাবরই বিতর্ক সৃষ্টি করে আসছেন। সে প্রেক্ষিতে এই বইটি যে পাল্টা ইতিবাচক যুক্তি দাড় করাতে সহায়ক হবে সে বিশ্বাস আমার আছে।

শেষে বলব আল্লাহর কাছে হাজার শোকর বইটির কাজ শেষ করা ও প্রকাশের সুযোগ দেয়ার জন্য। এক্ষেত্রে বইটির সার্বিক উপস্থাপনায় ড. আব্দুল ওয়াহিদের সহায়তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। অধুনালুপ্ত মাসিক ঢাকা ডাইজেষ্ট-এর সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু'র (বর্তমানে বাসস-এ কর্মরত) অনুপ্রেরণাও ভুলবার নয়। এছাড়া দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক জনাব এ, এম, এম, বাহাউদ্দিন, সহকারী সম্পাদক আব্দুল হাই শিকদার, লেখক-নাট্যকার আহমেদ মুসা ও সহযোগী নুরে আলম চৌধুরী পিন্টু'র সহায়তার কথাও এইসাথে উল্লেখ করতে হয়। আর সহধর্মিনী সুরভী যে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রী, সে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে অপার সহায়তা করে তার প্রতি ভালবাসার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে।

বইটি সশস্ত্রবাহিনী সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অবসানে সহায়ক ভূমিকা পালন করুক এই কামনাই করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

০১ আগষ্ট ২০০৩, ঢাকা। আবু রূশ্‌দ

সূচীপত্র

অধ্যায়-৪ ঃ সমরবিশারদদের সাক্ষাৎকার

পরিশিষ্ট

অধ্যায়-১

সশস্ত্র বাহিনী : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জনসংখ্যাগত পর্যায়ে পৃথিবীতে অষ্টম স্থানের অধিকারী হলেও আয়তনে প্রায় অনুল্লেখ্য একটি ভূখণ্ড। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও এটি দুর্বল একটি দেশ। এর উপর রয়েছে নিরন্তর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, হানাহানি, আদর্শিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ভিনদেশী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রও কম নয়। এমন একটি দেশে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠনের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা, সমালোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এর সবটাই আবার যুক্তিনির্ভর নয়, বেশিরভাগই আবেগাশ্রিত। বিশেষ করে হুজুগপ্রবণ জনমত ও সস্তা জনপ্রিয়তালোভী কতিপয় রাজনীতিবিদ-বুদ্ধিজীবীর ঢালাও মন্তব্য এক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। বলতে গেলে, বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতিই সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থানকে ঘিরে সৃষ্টি করেছে তুমুল বিতর্কের। এদেশে এক পক্ষ আদর্শগত অবস্থানের বিবেচনায় অত্যন্ত স্পষ্টরূপে শক্তিশালী নিয়মিত বা অনিয়মিত যে কোন ধারার সশস্ত্র বাহিনী গঠনের বিপক্ষে, অন্যপক্ষের কেউ কেউ সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে দৃঢ়মত পোষণ করলেও এর সার্বিক রূপরেখা নিয়ে সন্দিহান।

এদিকে শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনীর পক্ষে-বিপক্ষে যে বা যারা যা-ই বলুন না কেন, দু'পক্ষেরই এ নিয়ে যুক্তি রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠনের বিপক্ষে মত প্রদানকারী পক্ষের যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করতে পারি। এ পক্ষের উল্লেখযোগ্য যুক্তি হলো ঃ

১। বাংলাদেশ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। জনগণের মৌলিক চাহিদা- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা নিশ্চিত না করে প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয়।

২। বাংলাদেশের আশেপাশে কোন 'শত্রু' নেই- এটাই এ পক্ষের বোদ্ধা ব্যক্তিদের দৃঢ় অভিমত। সুতরাং সশস্ত্র বাহিনী থাকার প্রয়োজনীয়তা এদের নিকট অপ্রয়োজনীয়।

৩। বৃহৎ সশস্ত্র বাহিনী পশ্চাদপদ ক্ষুদ্র একটি দেশে সামরিক শাসন জারি ও জঙ্গী আইনে দেশ পরিচালনাকারীতে পরিণত হতে পারে- এমন আশংকাও করেছেন অনেকে।

৪। বৃহৎ প্রতিবেশী যদি শত্রুতে পরিণত হয় আর আক্রমণও করে বসে এবং বিপরীতে আমাদের মোটামুটি জনসংখ্যানুপাতিক হারে নির্ধারিত সশস্ত্র বাহিনী থাকে তবুও পার্শ্ববর্তী 'Giant'-এর সাথে কখনোই কোন দিক দিয়ে পেরে ওঠা সম্ভব নয় এবং যুদ্ধ জয় সম্ভব নয় তাই অযথা যুদ্ধসাজে সাজারই বা প্রয়োজন কি?

৫। সুইজারল্যান্ডের মত বাংলাদেশকে 'প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড' অর্থাৎ নিরপেক্ষ দেশে

পরিণত করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক একটি সেনাবাহিনী রেখে ঝামেলামুক্ত ও উন্নত দেশ গঠনে প্রয়াসী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৬। সবচেয়ে বড় কথা হলো সশস্ত্র বাহিনী একটি সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান। এখানে অর্থ ব্যয় দেশের কোন উন্নয়ন বা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক তো নয়ই বরং সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি সার্বিকভাবে দেশের অগ্রগতিকে বাধা প্রদান করে থাকে।

৭। নৈতিকভাবে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠনে জাতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরও অত্যাধুনিক সমরোপকরণ সংগ্রহ বাংলাদেশের জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ ট্যাংক, কামান, বিমান, যুদ্ধজাহাজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় এগুলো প্রয়োজন মতো সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

৮। একটি শক্তিশালী নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গঠন এবং এর লালন-পালনের বিরুদ্ধে সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রশ্নটি হতে পারে-ডিফেন্স এগেইন্সট হুম? অর্থাৎ কার বিরুদ্ধে যুদ্ধসাজ?

অন্যদিকে দ্বিতীয় পক্ষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় একমত। কিন্তু তারপরও তাদের মাঝে সাধারণত দু'ধরনের মতামত প্রতিফলিত হতে দেখা যায় ঃ

১। বাংলাদেশকে অতি অবশ্যই শক্তিশালী নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গঠন করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে আধুনিক অস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত করে প্রতিরক্ষার উপযুক্ত মান নিশ্চিত করতে হবে।

২। নিয়মিত সেনবাহিনী গঠন এবং ভরণ-পোষণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, অথচ জাতীয় নিরাপত্তার জন্য জাতীয় রণনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য, তাই অর্থনৈতিক অবস্থান, আঞ্চলিক পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের রণকৌশলগত অবস্থান নিশ্চিত করে কম খরচে অনিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী বা 'গণবাহিনী' গঠন করাই শ্রেয়।

উপরোক্ত দু'পক্ষের যুক্তি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে সাধারণভাবে মৌলিক যে সব বিষয় আমাদের চোখে ধরা পড়ে তা পরস্পর এতটাই সাংঘর্ষিক যে, সমস্যার সমাধান করতে হলে দেশের মধ্যেই দু'পক্ষের মল্লযুদ্ধের আয়োজন করতে হয়। কারণ উভয়ে উভয়কে দেশের প্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ বিবেচনা করে থাকেন। আদর্শিক পর্যায়ে এদের মাঝে যে দুস্তর ব্যবধান, মূলত সেটিই বাংলাদেশে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠনে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টিতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ "কোরিয়ার পর সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ে জনগণের মাঝে সমরূপতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ, এদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯৮% ভাগ হলো বাংলাভাষী-বাঙালী।"[১]

১। Syed Anwar Hussain, *'Ethnicity and security of small states : South Asian context'* in M. Abdul Hafiz and Abdur Rob Khan (eds.), Security of small states (BIISS, Dhaka, 1987) p.45

সশস্ত্র বাহিনী থাকা না থাকা বা এর আকার, প্রকৃতি, গঠন অর্থাৎ সার্বিক রণনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি গণতান্ত্রিক দেশে সম্পূর্ণতই রাজনীতিবিদদের উপর নির্ভরশীল। এখন যদি আমাদের সংসদে বিল উত্থাপন করে তর্ক-বিতর্কের পর মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সশস্ত্র বাহিনী সংকোচন এমনকি এর বিলুপ্তির পক্ষে আইন পাস করেন, তবে তার বিরুদ্ধে আইনগত ও ন্যায়ত কিছু করা সম্ভব নয় এবং বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে উক্ত সিদ্ধান্ত মন:পূত না হলেও সার্বিক রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে তা মেনে নিতে হবে। কিন্তু যদি বিদেশী কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের পরোক্ষ ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা [২] বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপে [৩] সশস্ত্র বাহিনী সংকোচন বা বিলোপের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তবে তা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং পৃথিবীর ইতিহাসে কোন স্বাধীনচেতা জাতিই তা 'গ্রহণীয়' বলে মেনে নেয়নি।

যা হোক, সশস্ত্র বাহিনী একটি গণতান্ত্রিক বা যে কোন মতাদর্শের একটি দেশে রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ একটি অঙ্গ যার উপস্থিতির জন্য নিম্নলিখিত উপাদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বলে রণকৌশলবিদদের অভিমত এবং এর প্রয়োজনীয়তা আধুনিক বিশ্বে নানা কারণে অত্যন্ত ব্যাপক পরিসরে আলোচিত। মুলত নিম্নলিখিত উপাদানসূহ সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে থাকে ঃ

১। ভু-রাজনৈতিক অবস্থান।

২। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি।

৩। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নাশকতামূলক তৎপরতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন।

৪। শক্তিসাম্য বজায় রাখা।

৫। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ও

৬। স্বকীয়তা রক্ষা।

ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান
(Geopolitical Location)

একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের রাজনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হয় তার রণনীতি। সে দেশ যত ছোটই হোক না কেন, তার অবস্থান ও এলাকার ভৌগোলিক গুরুত্ব সমগ্র বিশ্বকে সে দেশ সম্পর্কে একটি নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে আফগানিস্তান ও ভিয়েতনামের কথা বলাই যথেষ্ট।

২। প্রপাগান্ডা, বুদ্ধিবৃত্তিক মহলকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই ও হীনমন্যতার বীজ রোপণ করা ইত্যাদি।

৩। ভারত-বাংলাদেশ গোপন সাত দফা ও পঁচিশ দফা চুক্তি।

ভিয়েতনামের মানচিত্র সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এক সময় ঐ দেশকে কেন্দ্র করে কিভাবে সোভিয়েত রাশিয়া পুরো এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার লাভে সচেষ্ট ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া হয়ে ক্রমান্বয়ে পশ্চিমে বার্মা, ১৯৭১-এর পর বাংলাদেশ; অপরদিকে পশ্চিম এশিয়ায় সিরিয়া, ইরাক হয়ে আফগানিস্তানকে লক্ষ্য করেই গড়ে উঠেছিল সমাজতন্ত্রের নামে এশিয়ায় সোভিয়েত আধিপত্য বিস্তারের আজন্ম লালিত স্বপ্ন। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতও ছিল এ সব প্রভাব বিস্তারের পরোক্ষ বা ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষ সুযোগ লাভের অংশীদার। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এ কথা ঘুরিয়ে একইভাবে উল্লেখ করা যায়।

সাধারণ দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেশ হিসেবে মনে হলেও আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই ছোট্ট দেশটিকে নিয়েই বৃহৎ শক্তিগুলোর দ্বন্দ্ব আমাদের কাছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গুরুত্ব বোঝার জন্য উদাহরণ হিসেবে প্রতিফলিত হতে পারে। পাশাপাশি ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের পর মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি অতি ক্ষুদ্র দল সাধারণ 'রিলিফ অপারেশনে' বাংলাদেশে আগমন করলে প্রতিবেশী ভারত সরকার ও সংবাদ সংস্থাগুলো এ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ না হলে কেন এত হৈ চৈ আর কেনই বা ১৯৭১-এ মার্কিনীদের সপ্তম নৌ-বহরের আনাগোনা?

প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণে ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার ঃ

প্রথমত; বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরের প্রান্তস্থ দেশ। ১৯৬৮ সালে সুয়েজ খালের পূর্ব পাড় হতে বৃটিশদের পাততাড়ি গোটানোর পর এই অঞ্চল পরাশক্তিগুলোর ক্ষমতাচর্চার উৎকৃষ্ট এলাকায় পরিণত হয়েছে। এখন সোভিয়েত রাশিয়া বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু চীনের জন্য এ অঞ্চল এখন পৃথিবীর চলমান ও পরবর্তী উত্তপ্ততার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিগণিত হতে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত; ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী অব্যাহত থাকায় এ অঞ্চলে সর্বক্ষণ অস্থিরতা বিরাজ করছে, যা যে কোন সময় আদর্শিক কারণে অন্যান্য ক্ষুদ্র দেশকেও উক্ত কর্মসূচীতে টেনে আনতে পারে। এছাড়া মহাচীনের মত একটি বড় শক্তির উপস্থিতি, পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ সামরিক শক্তি হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশ, মায়ানমারে সামরিকতন্ত্রের উপস্থিতি বাংলাদেশকে ঠিক অস্থিরতার কেন্দ্রে ফেলে দিয়েছে।

তৃতীয়ত; এ অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্যের মত অস্থিতিশীল অঞ্চলের ঠিক পাশে অবস্থিত। মধ্যপ্রাচ্যে পৃথিবীর ৬০% ভাগ তেল মওজুদ থাকায় তা সব সময় অস্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পৃথিবীর রাজনীতি ও অর্থনীতির নতুন 'রঙ্গমঞ্চে' পরিণত হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশও স্বাভাবিক কারণে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

চতুর্থত; এ অঞ্চল পশ্চিমে পশ্চিম এশিয়া ও পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে সংযুক্ত করে উক্ত দু'অঞ্চলের মাঝে 'Geographic Bridge' বা ভৌগোলিক সেতু তৈরী করেছে।

এদিকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক হতে বাস্তবে মাত্র একজন প্রতিবেশী রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। ভারতের সাথে বাংলাদেশের ২৫৬৬ মাইল সীমান্তের পাশাপাশি বার্মার সাথে সীমান্ত মাত্র ১৭৬ মাইল। ২৫৭ মাইলব্যাপী উপকূলীয় সীমানায় ভারত যে কোন সময় প্রয়োজনে নৌ-অবরোধ আরোপের চেষ্টা করতে পারে। এ ধরনের অবস্থানকে বিশেষজ্ঞগণ 'Tyranny of Geography' বলে আখ্যায়িত করেছেন। পানি প্রবাহের সকল উৎস [৪] ভারতে থাকায় বাংলাদেশের অবস্থা বহুলাংশে ভারতের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

এছাড়াও অনেক স্বাভাবিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে বেশ নাজুক অবস্থায় নিপতিত করেছে। কিন্তু ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের তেমন কোন আঞ্চলিক প্রভাব না থাকলেও গবেষক অধ্যাপক নুরুজ্জামানের মতে,

> "১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশ এই অঞ্চলে ও বিশ্বে তার স্বকীয় চিন্তা-চেতনা ও সম্পর্কের ধারণা নিয়ে একটি স্বাধীন 'খেলোয়াড়' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।"[৫]

তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজস্ব স্বতন্ত্র অবস্থানের জন্য বাংলাদেশের 'Geostrategic' গুরুত্ব এতদঞ্চলের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে,

প্রথমত: বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের পথ দিয়ে ভারত মহাসাগরে প্রবেশের ক্ষেত্রে আধিপত্য দাবি করতে পারে। এছাড়া চট্টগ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বাংলাদেশের গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এ অঞ্চলের সকল ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্ক বড়ভাইসুলভ থাকায় যে কোন ভারত বৈরী শক্তি বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেবে-এটাই স্বাভাবিক।

এদিকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুক্তিযোদ্ধা শহীদ জিয়াউর রহমান অত্যন্ত সহজ ভাষায় কিন্তু গুরুত্বের সাথে আমাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,

> "মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা আর উত্তরে হিমালয়ের সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ। আর এ পর্বতমালার একপাশে রয়েছে ভুটান, নেপাল, সিকিম আর অন্যপাশে গণচীন। আমাদের পশ্চিম দিকে রয়েছে ভারত এবং পূর্বদিকেও রয়েছে ভারত। তারপর দক্ষিণ-পূর্বে বার্মা। এর আশেপাশে রয়েছে চায়না, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়া।

৪। প্রায় ৯২% ভাগ পানি বাংলাদেশ ভারত হতে পেয়ে থাকে।

৫। Md. Nuruzzaman *'National Security of Bangladesh'* BIISS Journal Vol. 12. No. 3. 1991, pp.377

আবার পশ্চিম দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে ভারত ছাড়িয়ে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান এবং আরো পশ্চিমে মধ্যপ্রাচ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে দু'দিক থেকে স্থলভাগ আস্তে আস্তে সরু হয়ে বাংলাদেশে এসে আরও সরু হয়ে পড়েছে। ভূগঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে বাংলাদেশের মত অবস্থান বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশের রয়েছে। তুরস্কের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন এখান থেকে ইউরোপে স্থল এলাকা ছড়িয়ে পড়েছে আর পূর্বদিকে পড়েছে এশিয়ায়। এরপর আসে মিশরের কথা। এর পশ্চিমে আফ্রিকার বিরাট স্থল এলাকা। আবার পূর্ব দিকে এশিয়ার স্থল ভাগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

এবার পানামার মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। এর উত্তরে আছে মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার বিরাট স্থল এলাকা, দক্ষিণে সাউথ আমেরিকা। আবার ইউরোপের সুইজারল্যান্ডের স্থলভাগ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং এর আশপাশে স্থলভাগ ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে কি হচ্ছে? এতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে আদান-প্রদান তা সংকীর্ণ স্থল এলাকার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে হচ্ছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ, তুরস্ক, মিশর, পানামা প্রভৃতি এলাকা বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের আদান-প্রদানের রাস্তা। সে জন্য এসব এলাকার খুবই স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশের আশপাশে কয়েকটি দেশ রয়েছে? ভারত, বার্মা, ভুটান, নেপাল, সিকিম এবং চায়না এই ছয়টি দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে প্রতিটি দেশ এত সন্নিকটবর্তী যাকে বলে- 'স্টোন থ্রোয়িং ডিসটেনস'। বাংলাদেশ থেকে নেপালের দূরত্ব ১৮ মাইল, ভুটান ৪৫ মাইল এবং চায়নার বর্ডার প্রায় ৪০ মাইল থেকে ৪৫ মাইল বা তার চেয়ে সামান্য বেশি হতে পারে। বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ। আমাদের রাষ্ট্রীয় সীমানার শুরু সমুদ্রের জলরাশি দিয়ে। আর এ মহাসমুদ্রই বাংলাদেশকে দিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান। এ কারণে আমরা হলাম সকলেরই টার্গেট। এটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আর এ জন্যেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এ জন্যেই আমরা বলি, বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগস্থল। আমাদের এ বক্তব্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছে।"[৬]

এখন যে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নিশ্চয়ই নিজ দেশকে টার্গেট হিসেবে অপরের কাছে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় উপস্থাপন করতে চাইবেন না। বরং বাংলাদেশ টার্গেট বলে একে রক্ষার চেষ্টা করবেন- এটাই স্বাভাবিক।

এদিকে বর্তমানে এ উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দু'জন মার্কিন সাংবাদিক-এর মতে, এ উপমহাদেশ হচ্ছে 'পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তপ্ত বিপদসংকুল অঞ্চল'।[৭] নিঃসন্দেহে বাংলাদেশও এই উত্তপ্ততা ও বিপদের বাইরে নয়। এছাড়া ১৯৬২

৬। জিয়াউর রহমান রচিত *'আমাদের পররাষ্ট্রনীতি'* প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

৭। উইলিয়াম ইকনরোজ ও রবার্ট উইনডোম লিখিত *'ক্রিটিক্যাল মাস'* মাসিক অঙ্গীকার ডাইজেস্ট, মার্চ '৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলা সংক্ষিপ্তসার থেকে উদ্ধৃত। উক্ত বইয়ে এই উপমহাদেশকে 'The most dangerous place on earth' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বইটির লেখক দু'জন মার্কিন। একজন উইলিয়াম ইকনরোজ-'দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস', 'দ্যা ওয়াশিংটন পোস্ট', 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিবেদক ছিলেন। বর্তমানে 'নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে'র সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। অপর লেখক রবার্ট উইনড্রেম এনবিসি'র 'নাইটলি নিউজ'-এর প্রডিউসার।

সালের চীন-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৫ ও '৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক গুরুত্ব চীন, ভারত ও পাকিস্তানের নিকট কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বুঝতে হলে এ অঞ্চলের ভারতীয় অবস্থান ও তার মাঝে বাংলাদেশের অবস্থান ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে ভারতের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, তার মাঝে একমাত্র যোগাযোগকারী পথ হচ্ছে তেতুলিয়া সীমান্তের উত্তর পাশের সরু করিডোর যা 'শিলিগুড়ি করিডোর' নামে পরিচিত। তেতুলিয়া সীমান্ত হতে চীনের দূরত্ব মাত্র ৪০/৪৫ মাইল। কাজেই যে কোনরূপ চীন-ভারত সংকটে চীনের প্রথম লক্ষ্য হলো 'শিলিগুড়ি করিডোর' বরাবর আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশের তেতুলিয়া সীমান্ত পর্যন্ত একটি পথ দখল করে দৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করা- যাতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল হতে কোন প্রকার অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদপত্র পূর্ব ভারতে যেতে না পারে। এ অবস্থায় পূর্ব ভারত হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চল।

এ পরিস্থিতির আলোকে ভারত বাংলাদেশকে একমাত্র 'ট্রানজিট রুট' হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তির অন্যতম শর্ত 'একদেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে অপর দেশ সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করবে'-এ ধরনের চাতুর্যপূর্ণ বক্তব্যের আড়ালে মূলত বাংলাদেশকে 'ট্রানজিট রুট' হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়েছিল।

অত্র অঞ্চলে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তার আরেকটি দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায় বিখ্যাত ভারতীয় সমর বিশারদ সুব্রামনিয়াম স্বামীর একটি উদ্ধৃতি হতে। তাঁর মতে,

> "It's (Bangladesh) existence constitutes a weak point in Indian security in the strategic north east region. Should events in Assam and the other 'tribal' states in that region, or in neighbouring Burma, cause deterioration in India's control of the area, Bangladesh proximity would be a critical factor." [৮]

অপর একজন ভারতীয় বিশ্লেষকও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে মন্তব্য করেন,

> "In the unlikely event of a major military conflagration between India and China in the north-eastern region, Bangladesh, because of its geo-strategic location, would acquire immense significance for India's defence planning. Any preemptive Chinese attack

---

৮। K. Subrahmanyam Swami, '*Bangladesh and India's Security*' Compiled and published by Maj Gen. D.K. Palit, Dehra Dun, Palit and Dutt Publishers. 1972 পুস্তকে উদ্ধৃত।

southward from the Tibetan Chumbi Valley might result in the falling of the narrow Siliguri corridor, thus totally cutting of the entire north-eastern region from the rest of the country. In such an eventuality, the territory of Bangladesh could only help to establish a link between thease two regions."[৯]

এক্ষেত্রে চীন-ভারত সরাসরি যুদ্ধের সম্ভাবনা না থাকলেও বলতে হয়, ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষকদের নিকট বাংলাদেশ ভূ-খন্ড হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য 'অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ' এবং তারা রাখ-ঢাক না করে বলেছেন যে, 'বন্ধুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ'ই হতে পারে এতদঞ্চলে তাদের স্ট্র্যাটেজিক দুর্বলতা দূর করায় সবচেয়ে বড় 'সূত্র'। তবে তারা এও বলছেন যে, "ঢাকায় অর্থাৎ বাংলাদেশে কেবলমাত্র একটি বন্ধুপ্রতিম সরকারই ভারতের নিরাপত্তার এসব সংবেদনশীল প্রসঙ্গ অনুধাবন করতে পারবে।"[১০]

অর্থাৎ, সম্প্রতি ভারত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহার ও ট্রানজিট সুবিধা লাভের যে দাবী জানাচ্ছে এবং আন্তঃসীমান্ত গেরিলা তৎপরতা দমন সংক্রান্ত যৌথ উদ্যোগের কথা বলছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য (seven sisters) যথাক্রমে মিজোরাম, অরুনাচল, নাগাল্যান্ড, আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর ও মেঘালয়ের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলপ্রয়োগে দমনের জন্য সহজ রসদ ও সেনা পরিবহণের রাস্তা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের গবেষণা মতে, "মূলত এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ভারত মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহায়তা করেছিল"।[১১] স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ জে. এন. দীক্ষিতও একই মত পোষণ করেছেন তাঁর দেয়া এক সাক্ষাৎকারে। ০২/৪/৯৬ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত উক্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনে ভারতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"....আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আবেগ জড়িয়ে ছিল এই যুদ্ধের সঙ্গে। আমরা যদি আপনাদের সাহায্য না করতাম, এই প্রদেশ হয় তো বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেগ নিয়ে সাহায্যে এগিয়ে যেত, বাঙালি আত্মপরিচয়ের আকাঙ্খা থেকে প্রদেশটি হয় তো অবশেষে বিচ্ছিন্নতার দিকেও এগিয়ে যেত।... সে সময় পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবহার করে পূর্ব ভারতে পাকিস্তান যেসব তৎপরতা চালাচ্ছিল তাতে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে

৯। This viesw was expressed by Inder Malhotra, the Indian journalist. See, Shaukat Hassan, *Indo-Bangladesh Political Relations During Awami League Government, 1972—1975* [Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, Australian National University, 1987] pp.173-4

১০। Srikant Mohapatra '*National Security and Armed Foreces in Bangladesh*', Strategic Analysis [Delhi], August 1991, p.585

১১। See Shaukat Hassan, '*The India Factor in the foreign Policy of Bangladesh*' in M. G. Kabir and Shaukat Hassan [eds.] Issues and Challenges Facing Bangladesh foreign policy. [Bangladesh Society of International Studies; Dhaka 1989], pp. 52-53

উঠেছিলাম। আর এ ধরনের একটি ভাবনা আমাদের সব মহলেই গড়ে উঠেছিল যে, একটি স্বাধীন বাংলাদেশ হয় তো এসব সমস্যার সমাধান দেবে।"

জে. এন. দীক্ষিতের কথা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের ভাগ্য প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশ ভূখন্ডের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের এই যে ভৌগোলিক গুরুত্ব মূলত তাই বাংলাদেশকে রণকৌশলগত খাতে দৃষ্ট নিবদ্ধ রাখতে বাধ্য করেছে এবং এ কারণেই সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতিও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এদেশের জন্য।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি
(Regional and International Situation)

ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের আলোকে আমাদের দেশের অবস্থান বিশ্বে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হলেও দেশের হাতে গোনা ক'জন রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী আমাদের 'প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড' হিসেবে গড়ে ওঠাকেই যথেষ্ট বলে ভেবে থাকেন। কিন্তু শান্তির ললিত বাণীকে বাস্তবে রূপ দিতে এ পৃথিবী কখনোই একক নিরপেক্ষতায় 'অহিংস' পথে পরচালিত হয়নি।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে (তা যত ছেট বা গুরুত্বহীন হোক না কেন) তার আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিমন্ডলের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী পররাষ্ট্রনীতি ও রণনীতি প্রণয়ন করতে হয়। প্রাথমিকভাবে হয় তো কোন দেশকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় না, কিন্তু আঞ্চলিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সেই দেশটিই হয় তো একটি অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এক্ষেত্রে নেপালের উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। বিশ্ব পরিমন্ডলের রাজনৈতিক কূটকৌশলে দরিদ্র নেপাল অনুল্লেখ্য দেশ হিসেবে চিহ্নিত; কিন্তু সে দেশটিই আশির দশকে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে চীনের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা চালালে তাকে প্রতিবেশী ভারতের পর্বতপ্রমাণ বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

এ অঞ্চলে ও বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ দরিদ্র হওয়ার পরও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী দেশ হিসেবে পরিচিত। মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কাল থেকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়ার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমাদের দেশ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মানদন্ড অনুযায়ী বিশ্বে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এমন কি ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল বিশ্বে প্রথম দশটি দেশের একটি ও এশিয়ায় জাপানের ঠিক পরই। এছাড়া তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ

হিসেবে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের সীমা অনেক গভীরে প্রোথিত তাই বৈরী শক্তির চোখ রাঙানিও স্বাভাবিক। বাংলাদেশ সম্পর্কে ১৯৯৪ সালে মহাচীনের পিপলস কংগ্রেসে সেদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লী পেং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সমান গুরুত্ব প্রদান করার আলোকে আঞ্চলিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ কতটুকু গুরুত্বের দাবী রাখে তা বোঝা বেশ সহজ হয়ে যায়।

এখন দেখা যাক যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমাদের অবস্থান, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বৃহৎ শক্তিবর্গের অত্র অঞ্চলে পদচারণা কেন বাংলাদেশের উপর প্রভাব ফেলবে? আমরা যখন কেউ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলি তখন সঙ্গত কারণে ভারতের প্রসংগ সর্বপ্রথম আলোচনার পাদপ্রদীপে উঠে আসে এবং শুধুমাত্র ভারতকে বিবেচনায় রেখে তার শক্তি-সামর্থ্যের বিপরীতে আমাদের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। কিন্তু অনেকের বিবেচনায় ভারত আমাদের শত্রু নয় বন্ধু-মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী। এ ধারণানুযায়ী আমরা 'কোন শত্রু না থাকার' যুক্তিতে না হয় শুধুমাত্র বিজয় দিবসের প্যারেড বা গার্ড অব অনার দেয়ার জন্য Show Piece আর্মি পোষা শুরু করলাম, অর্থাৎ ১০-১৫ হাজার রাইফেলধারী আর্মি লালন-পালন করলাম কিন্তু 'বন্ধু ভারত' আমাদের আক্রমণ না করে যদি পার্শ্ববর্তী বার্মিজরা আক্রমণ করে বসে তখন ঐ পাপেট আর্মি আমাদের রক্ষা করতে পারবে কী?

১৯৯১ সালে রেজুপাড়া বিওপি'র ঘটনা বা রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশ যখন মায়ানমারের সাথে প্রায় যুদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল তখন মায়ানমার আমাদের সেনাবাহিনী অপেক্ষা দ্বিগুণ সদস্যের স্থল বাহিনীর অধিকারী দেশ [১২] হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপের পাশাপাশি নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলায় সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি ঃ

১। মায়ানমারের স্থলবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বাংলাদেশের সৈন্যসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ ছিল। কিন্তু ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তাদের সৈন্যসংখ্যা আমাদের তুলনায় কম ছিল। হঠাৎ করে অল্প প্রশিক্ষণে শুধুমাত্র সংখ্যা বাড়ানোর খাতিরে সেনা সদস্যের সংখ্যা বাড়ানো হলে গুণগত মান অত্যন্ত নীচু হওয়া স্বাভাবিক। মায়ানমারের সৈনিকদের অবস্থা ছিল অনেকটা তাই। অথচ বিপরীতে বাংলাদেশের সৈনিকরা সুপ্রশিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি উন্নত অস্ত্রের অধিকারী ছিল। সামরিক কর্মকর্তা যারা যুদ্ধ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নিয়োজিত থাকেন সেক্ষেত্রে মায়ানমারের অফিসারগণ বাংলাদেশী অফিসারদের বিপরীতে প্রশিক্ষণে ও মানে ছিলেন অনেক নীচে।

২। বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর শক্তি ও গুণগত মান বিচারে বাংলাদেশ প্রাথমিক পর্যায়েই মায়ানমারকে ব্যাপক অসুবিধার মধ্যে ফেলে দিতে পারত-এটি নিশ্চিত বলা যায়।

১২। ২০০১ সালের হিসেবে অনুযায়ী সে সংখ্যা প্রায় ৫ গুণে উন্নীত হয়েছে।

৩। সর্বোপরি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের চাপ প্রয়োগ ও বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন পরিস্থিতি বাংলাদেশের অনুকূলে নিয়ে আসে। বিশেষ করে এতদঞ্চলে চীন উভয় রাষ্ট্রের বন্ধু হওয়ায় একদেশ কর্তৃক অপরজনের উপর আক্রমণকে চীন আগ্রাসন বলে ধরে নিত এবং পরবর্তীতে আগ্রাসী দেশকে সাহায্য বন্ধ করে দিত এমন সম্ভাবনাও ছিল।

৪। সর্বশেষ কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ ছিল যে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের একটি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল যা আমাদের প্রতিপক্ষের ছিল না। এরপরও হয় তো অনেকের বিবেচনায় বাংলাদেশ মায়ানমারের সাথে যুদ্ধে পেরে উঠতে পারতো না বলে পিছিয়ে এসেছে-এমন মনে হতে পারে। কিন্তু নিম্নলিখিত প্রসঙ্গসমূহ পর্যালোচনা করলেই ভিন্ন একটি চিত্র ফুটে উঠবে - সন্দেহ নেই ঃ

(ক) তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নেয়া গেল যে, বাংলাদেশের সৈন্যসংখ্যা কম ছিল বলে মায়ানমারের মত দেশের কাছেও অপমানিত হতে হলো; কিন্তু বাংলাদেশের একটি মোটামুটি সম্মানজনক সংখ্যার সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী থাকার ফলে অন্তত মায়ানমার বাংলাদেশ আক্রমণ করার সাহস পায়নি। এতেই কি একটি সম্মানজনক সংখ্যার সুসজ্জিত নিয়মিত শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না?

(খ) স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সম্পাদিত ২৫ বছরের চুক্তির শর্তানুযায়ী যদি বাংলাদেশের বর্তমান সংখ্যক নিয়মিত বাহিনী ও অস্ত্রপাতি না থাকত এবং সে চুক্তির ধারা মতে তৃতীয় দেশের আক্রমণে ভারতের সহায়তা নিতে হতো তবে পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে ঘোলাটে হয়ে উঠতো। এমতাবস্থায় যদি কোন শক্তিশালী নিয়মিত বাহিনী না থাকায় ভারত 'বন্ধুত্বের' খাতিরে আমাদের সাহায্য করতে সৈন্য পাঠাতো, তাহলে-

প্রথমত; জাতীয় পর্যায়ে আমাদের অপমানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো।

দ্বিতীয়ত; ভারতীয়রা আবার একবার বাংলাদেশে ঢুকতে পারলে আদৌ ফিরে যাবার বাসনা পোষণ করত কি-না তা এককালীন ভারতীয় রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংহের একটি উক্তি থেকেই বোঝা যায়। তিনি বলেছিলন, "ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগ করা ছিল একটি মারাত্মক ভুল"। এমতাবস্থায় তখন ভারতীয় বাহিনী ফিরে যেতে না চাইলে মায়ানমারকে পরাজিত করা তো দূরের কথা, বাংলাদেশের ভিতরে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের আয়োজন করতে হতো এবং একটি যুদ্ধে দেশের যে ক্ষতি হয় তা নিশ্চয় একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী পোষার ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশী।

এদিকে আঞ্চলিক পরিস্থিতি অনেক সময় নিজ দেশে তো বটেই বরং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে কুয়েতের উদাহরণ দেয়া যায়। 'আজকের বন্ধু যা কালকের বন্ধু নাও থাকতে পারে' এবং 'বন্ধুবেশে চক্রান্তই পৃথিবীর ইতিহাসের নির্মমতম অধ্যায়গুলোর জন্মদাতা' তা কুয়েতের এককালীন বন্ধু ইরাকের কুয়েত দখলের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে। হয় তো

ইরাকের বিশাল সামরিক শক্তিকে রুখে দাঁড়ানো কুয়েতের মত ছোট দেশের পক্ষে সম্ভব হতো না। কিন্তু কুয়েতের যদি মাত্র পঞ্চাশ/ষাট হাজার সদস্যের সুসজ্জিত, সুপ্রশিক্ষিত নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী থাকত তবে গোটা বিশ্বকে একটি বড় মাত্রার যুদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতো না। কারণ ৫০,০০০ সদস্যের আর্মি (যদি সুপ্রশিক্ষিত হয়) প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ নিয়ে (কুয়েতের মতো ধনী দেশের সে সুযোগ ছিল) কমপক্ষে ১৫/২০ দিন ইরাকী বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত। আর ঠিক ঐ সময়টুকুই কূটনৈতিক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য চাপ প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট। এর ফলে এককভাবে আরব কাঠামোর ভিতরেই কুয়েতের সমস্যা সমাধানের একটি পথ খোলা পাওয়া যেত। কিন্তু কুয়েত ইরাককে চিরদিনের বন্ধু মনে করে এবং বিলাসী আরব্য চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে প্রতিরক্ষা খাতে বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বেশ কিছু অত্যাধুনিক ট্যাংক ও বিমান থাকার পরও ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। অবশ্য ইরাকী আক্রমণের খবর শোনামাত্র পার্শ্ববর্তী আরব দেশে 'পশ্চাদপসরণের' প্রতিযোগিতায় কুয়েতী সেনা সদস্যরা বিশেষ পারঙ্গমতা দেখিয়েছে। 'কোন শত্রু নেই' দর্শনের উপর ভিত্তি করে তারা ন্যূনতম সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেনি। কুয়েতের পাশে না হয় বেশ কিছু বন্ধু দেশ যেমন - সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ছিল 'পশ্চাদপসরণের' জন্য কিন্তু আমাদের পাশে এমন কোন দেশ আছে কি-না তা ভেবে দেখার বিষয়।

প্রতিটি অঞ্চলেই আঞ্চলিক বলয়ে একটি মূল প্রভাব বিস্তারকারী (Dominant) দেশ থাকে যাকে ঘিরে উক্ত অঞ্চলের রণনীতি আবর্তিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক জনাব আবুল কালাম উল্লেখ করেছেন ঃ

> "পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির পথে দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দ্বান্দ্বিক রণনৈতিক কাঠামো।... দক্ষিণ এশিয়া এমন একটি অঞ্চল যাতে অভিন্ন হুমকিপ্রসূত কৌশলগত সমঝোতা নেই বললেই চলে; বরং এ অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতি হুমকির ক্ষেত্রে কোন না কোন ধরনের আঞ্চলিক ইন্ধন রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। বিশেষ করে এ অঞ্চলের কেন্দ্রস্থ রাষ্ট্র ভারত এবং প্রান্তস্থ প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ভয়-ভীতিজনিত ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে। ... নীতিগত পর্যায়ে এ অঞ্চলের প্রধান দেশ হিসেবে ভারত একটি বিশ্ব ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে সক্রিয় এবং এক্ষেত্রে ভারত যথেষ্ট চাতুর্য ও সূক্ষ্মতার পরিচয় রাখে। .... পাকিস্তান ছাড়া এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে ভারত 'আন্তঃনির্ভরশীল' রণনীতির ভিত্তিতে গড়ে তুলে শান্তিপূর্ণ, বন্ধুপ্রতিম ও সহযোগিতার সম্পর্ক, যদিও অনেকে ভারতের এ ধরনের রণনীতিকে একক ভারতীয় আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কৌশল বলে মনে করছে।"[১৩]

১৩। আবুল কালাম সম্পাদিত *'সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি'*, পৃ, ৮, ৯।

এবং এ জন্যই 'অন্য কারো কর্তৃত্ব' বা 'ভারতীয় সরকারের সমার্থক রাজনৈতিক দর্শন ও আঞ্চলিক অবস্থান' অস্বীকারকারী কোন দেশের স্বাধীন চিন্তাধারা ভারতীয় রণ-রাজনৈতিক দার্শনিকদের চোখে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তাই নেপাল, শ্রীলংকা হতে শুরু করে বাংলাদেশের সাথে ভারতের বারবার বৈরিতার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বাংলাদেশ, চীন ও মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি মোটামুটি একটি নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী থাকায় এবং চীন হতে বেশ কিছু সমরোপকরণ সংগ্রহ করায় ভারত আমাদের সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেনি, যেমন পেরেছে শ্রীলঙ্কা বা মালদ্বীপের ক্ষেত্রে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও এর সাথে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কটি আলোচনায় আনলে প্রথমেই বলা হয় যে, বিশ্বে কখন যে কি ঘটে যায় তা বলা মুশকিল। হঠাৎ যে কোন বিশ্বশক্তির কি ইচ্ছে হয় তা সব সময় হঠাৎ করে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

হিটলারের মত মানুষ বা নেতার অভাব বিশ্বে কখনো হয় না। সম্প্রতি রাশিয়ায় উগ্রবাদী ঝিরিনোভস্কি ও ইটালীর নির্বাচনে ফ্যাসিস্টদের পুনরাগমনের ধ্বনি, ভারতে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটার কথাই মনে করিয়ে দেয়। বিশ্বে যে কোন সময় বিশ্ব শক্তিসমূহের ইচ্ছায় অনেক কিছুই হতে পারে। সে জন্যই আফগানিস্তান আক্রান্ত হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র ছুটে এসেছিল ভিয়েতনামে, নাসেরকে 'শায়েস্তা' করতে আসতে হয়েছিল বৃটেন, ফ্রান্সকে। এমনকি কুয়েতের আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার জন্য সারা পৃথিবীকে মরণখেলায় মেতে উঠতে হয়েছিল। এরকম হাজারো উদাহরণ বিশ্ব ইতিহাস ঘাটলে সহজেই বেরিয়ে আসবে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কখন কোন্ দেশ বিপদে পড়ে, তার সুনির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই। যেমনটি হয়েছিল মালদ্বীপের মতো ছোট্ট, শান্তিপ্রিয় দেশটির ক্ষেত্রে। এছাড়া কোন সময় যে কোন পরিস্থিতিতে বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর সাহায্যার্থে [১৪] আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশীয় সশস্ত্র বাহিনী 'আন্তর্জাতিক বাহিনীতে' লীন হতে পারে।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমাদের মত দরিদ্র দেশের কেন অযথা অপরের সামরিক জোটে সাহায্য করতে যেতে হবে? এর উত্তরে বলা যায়, আমাদের দেশ তৃতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ধনী মুসলিম দেশগুলোর সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী দেশ হিসেবে বাংলদেশ তৃতীয় বিশ্বে বিশেষভাবে সমাদৃত। আজ যদি কোন না কোন কারণে ইসরাইল ও পশ্চিমা কোন শক্তি কোন আরব দেশ আক্রমণ করে বসে তবে বাংলাদেশ বা কোন মুসলিম দেশ কি 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দারের' মত বসে থাকবে, না-কি জোটগতভাবে প্রতিরোধের ডাক

১৪। যেমন মুসলিম উম্মাহর জোট গঠনের প্রয়োজনে, ২য় বিশ্বযুদ্ধ বা উপসাগরীয় যুদ্ধের মতো কোন জোট গঠনে।

আসার পরও 'পাপেট আর্মি' পোষার জন্য সাহায্যে অপারগতা প্রকাশ করবে?

তাই দেখা যায়, ভিয়েতনামের যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার সে যুদ্ধে জড়ানোর কোন বাহ্যিক যুক্তি ছিল না বটে কিন্তু আদর্শিক একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য অস্ট্রেলিয়া আমেরিকান বাহিনীর সাহায্যার্থে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করেছিল।

আজ বাংলাদেশের নাম বিশ্বপরিমন্ডলে বিশেষ করে আরব অঞ্চলে বেশ শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়। অথচ আজ যারা আমাদের প্রশংসা করছে তারাই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত হয় বাংলাদেশকে গণনায় ধরতো না বা মিসকিন বলে অবজ্ঞা করত। এখন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা উপসাগরীয় অঞ্চল হতে শুরু করে বিশ্বের সকল অঞ্চলে জাতিসংঘ সামরিক মিশনে অংশগ্রহণ করছে এবং চমৎকার কর্মতৎপরতা দেখিয়ে বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

এমন কি ১৯৯৫-'৯৬ সালে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম স্থান অধিকারের কৃতিত্ব দেখায় [১৫] যা ২০০২ সালেও অব্যাহত ছিল। এদিকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পৃথিবীর পরিবর্তনশীল ধারাবাহিকতায় শত্রু-মিত্র চিহ্নিত হয়। পূর্বের শত্রু পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী আজ একত্রিত। যে বৃটিশদের বাহু থেকে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়েছিল সেই বৃটিশরাই আজ তাদের বড় বন্ধু। তাদের জনগণও সে দিকেই চিন্তা-ভাবনা করে থাকে।

অনুরূপ কথা চীন ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ভারতের ক্ষেত্রে বিপরীত। সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙ্গনের পর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আদর্শিক দ্বন্দ্ব বিদূরিত হওয়ায় আজকের পৃথিবীতে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা অনেক অস্থিতিশীলতার জন্ম দিচ্ছে এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে আমাদের স্বনির্ভর ও সুনিয়ন্ত্রিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বেশী করে অনুভূত হচ্ছে।

আমাদের জনগণ চায় বিশ্বে ও আঞ্চলিক পরিমন্ডলে একটি শক্তিশালী ও আক্ষরিক অর্থে আধিপত্যবাদ বিরোধী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লাভ। এক্ষেত্রে যদি 'সুইজারল্যান্ড তত্ত্বের' অবতারণা করা হয় তাহলেও বলতে হয় সুইজারল্যান্ডের যে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী ও সমরাস্ত্র রয়েছে তা অনেক 'যুদ্ধবাজ' দেশেরও নেই। নিরপেক্ষতার অর্থ তাই কখনো উদাসীনতা বা নিরাপত্তাহীনতা হতে পারে না।

(সুইজারল্যান্ডের সামরিক শক্তি সম্পর্কে পরিশিষ্টে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।)

১৫। *দৈনিক দেশজনতা*, ১১/৪/৯৬ সংখ্যা

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নাশকতামূলক তৎপরতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন

(Ensure Internal Security, contian Subversion and Insurgency)

'জাতীয় নিরাপত্তা' সম্পর্কে ধনী-গরীব সকল দেশকে ভাবতে হয়। আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা ও উপাদান, প্রকরণ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার সূচক হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিক বিশ্বে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে নিরাপত্তা রক্ষা করা বৈদেশিক হুমকি মোকাবিলা করার চেয়ে বেশী জরুরী। মূলত জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ফাঁক-ফোকরগুলো সম্পূর্ণরূপে না হলেও যতটুকু পারা যায় ততটুকু বন্ধ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৈদেশিক পর্যায়ে হুমকির চেয়ে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে উৎসারিত হুমকি সবচেয়ে বেশী ভয়ের কারণ।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে বারবার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার্থে মাঠে নামানো হয়েছে। ১৯৭২-৭৫ মেয়াদী আওয়ামী লীগ শাসনামলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বিশৃংখল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে সশস্ত্র বাহিনীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং দেশব্যাপী লুট-পাট, মজুতদারী ও ব্যাপক চোরাচালানীতে অতিষ্ঠ হয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে তাঁকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

এছাড়া তাঁর শাসনামলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পত্র নং-২৫/১ ডি-১/৭২ তারিখ ২৭ জুন ১৯৭২-এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলকে অপারেশনাল এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে সেখানে সেনা মোতায়েন করা হয়।

পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময়কালে '৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর দেশ যখন অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী উভয় চাপে আক্রান্ত তখন আমাদের সেনা সদস্যরা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যা করেছে তা তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তখন কেবল "১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সীমান্তে ভারত এক হাজার তিনশ' ষোল বার হামলা চালায়"।[১৬] আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অমিত মনোবলে এরূপ বহু আক্রমণ নস্যাৎ করে দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করেছে। এছাড়া সে সময় 'কাদেরিয়া বাহিনী'র প্রায় ২৫ হাজার সশস্ত্র সদস্য প্রত্যক্ষ ভারতীয় সহায়তায় সীমান্তব্যাপী নাশকতামূলক কর্মকান্ড চালিয়েছিল।[১৭] কিন্তু কোনক্ষেত্রেই এরা সরাসরি কোন হুমকিতে পরিণত হতে পারেনি। আজ তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। এদের দেশবিরোধী

১৬। রেজোয়ান সিদ্দিকী, *'কথামালার রাজনীতি'*, পৃ. ৭০।
১৭। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন অশোক রায়না লিখিত *Inside RAW : The Story of India's Secret Service* ভিকাস পাবলিশিং, দিল্লী।

কার্যকলাপকে দমন করার জন্য নিশ্চয়ই নিরস্ত্র জনগণকে এগিয়ে যেতে হয় নি বরং জনগণের সহায়তা নিয়ে সশস্ত্র বাহিনী এগিয়ে গিয়েছিল।

এরকম আরো বহুক্ষেত্রে নাশকতামূলক কর্মকান্ড, তথাকথিত আন্দোলন দমন করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন হয় । তাই 'The Political Economy of growth' বইয়ে পি. বরণ উল্লেখ করেছেন,

'এটা সত্য যে, চূড়ান্তভাবে না হলেও প্রাথমিকভাবে জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির জন্য, অভ্যন্তরীণ আন্দোলন দমন করার প্রয়োজনে তারা (তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ) সশস্ত্র বাহিনী লালন করে।'

শ্রীলঙ্কা ছিল সার্ক দেশগুলোর মধ্যে শিক্ষায়, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে সবচেয়ে অগ্রসর ও গান্ধীর অহিংস মানবতাবাদের প্রকৃত পূজারী। তারা অনেকটা গর্ব করেই বলতো যে, ওদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই। কারণ চারিদিকে সমুদ্র পরিবেষ্টিত মুক্ত গণতান্ত্রিক একটি দেশ হিসেবে ওরা তো কারো 'পাকা ধানে মই দেয়নি' যে, কেউ ওদের 'রামায়নের কাহিনী' স্মরণ করাতে আসবে। সামরিক বাহিনী পোষা তাদের কাছে ছিল নিতান্তই অপচয়। এ জন্য তারা ১৫,০০০ সৈন্যের একটা 'পাপেট আর্মি' নিশ্চিন্তে পুষছিল। কিন্তু ভারত সৃষ্ট তামিল গেরিলাদের সশস্ত্র তৎপরতায় অতিষ্ঠ হয়ে তারা এখন আর্মিতে অবিরাম রিক্রুট করেও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এমনকি মহিলাদেরও সেনাবাহিনীতে নেয়া হচ্ছে। অথচ ওরা যদি ৪০,০০০-৫০,০০০০ আর্মি পুষত ভালভাবে তবে প্রতিবছর বাজেটে খরচ একটু বেশী হতো বটে কিন্তু তামিল বিদ্রোহের কারণে সৃষ্ট জটিলতায় যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষতি হয়েছে তার ১০ ভাগও হতো না। কারণ একটি ভাল স্ট্যান্ডিং আর্মি বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। ভারত হতে পারে এর একটি অন্যতম উদাহরণ। এদিকে হঠাৎ করে অপ্রস্তুত অবস্থায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে শ্রীলংকার উপর দিয়ে কি ধরনের ঝড় বয়ে যায় তা উল্লেখ করতে গিয়ে SIPRI Year Book-এ বলা হয়েছে-

"Sri Lanka-a peaceful democratic country till the beginning of the 1980s had multiplied its defence budget in 1985. In 1984, the island republic had allocated only 93 million US dollars for it's armed forces but in 1985 the figure stood at US$ 214 million. From '82-'91, the total amount Sri Lanka has spent for defence is US$ 2367 million".[১৮]

অর্থাৎ শ্রীলংকাকে বিরাট অংকের বাজেট সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বরাদ্দ করতে হয়েছে এবং এখানে এ সমস্ত টাকা বৈদেশিক কোন শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীর

১৮। SIPRI Year Book, 1992, p.260

জন্য খরচ করা হয়নি। যদি এই বিপুল অংকের বাজেট বরাদ্দ করার পর সহিংসতা থেমে যেতো বা নিয়ন্ত্রণের মাঝে আসতো তবে 'শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময় আর্মি তৈরী করলে যথেষ্ট ' বাক্যটিকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা যেতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এমনকি অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদ তাদের অসংখ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ একজন জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী প্রেসিডেন্টের নির্মম হত্যাকান্ডের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশে শান্তিবাহিনী এখন যতটুকু হুমকিস্বরূপ, তা হয়তো আরো বেশী হত যদি আমরা শ্রীলংকার মত 'পাপেট আর্মি' পুষতাম। এখানে কথা প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক মীমাংসার অবতারণা হতে পারে সত্যি, কিন্তু শান্তি বাহিনী যদি 'তামিল টাইগার'-দের মত পার্বত্য অঞ্চলকে আমাদের দুর্বলতার সুযোগে প্রথম ধাক্কাতেই মুক্তাঞ্চলে পরিণত করতে পারতো তবে রাজনৈতিক মীমাংসায় ওদের ছাড় দিতে হতো অযৌক্তিকভাবে ওদের ইচ্ছানুযায়ী অনেক বেশী-বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে। অথচ ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর যে শান্তি চুক্তি সাধিত হয়েছে এবং সীমিত পরিসরে হলেও চাকমা শরণার্থীরা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে সেখানে সন্দেহাতীতভাবে বিগত দিনগুলোয় দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে 'Behind the screen' আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পরিচালিত Counter Insurgency অপারেশন একটি বড় নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে বলে দাবী করা যায়। এছাড়া ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ৩ জন বিদেশী নাগরিককে যখন উপজাতীয় দুষ্কৃতকারীরা অপহরণ করে ৯ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করে তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের কমান্ডো অপারেশন পরিচালনা করে জিম্মিদের উদ্ধার করতে হয়। অথচ, শান্তি চুক্তি হওয়ায় আর্মি অপসারণ করলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারতো।

ঠিক একইভাবে ১৯৮৭-'৮৮ সালের দিকে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর প্রত্যেক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ময়মনসিংহ অঞ্চলের 'গারোল্যান্ড' আন্দোলনটিকেও আমাদের সশস্ত্রবাহিনী প্রাথমিক পর্যায়ে Contain করতে সক্ষম হয়।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ হতে পারে কলম্বিয়া। ওখানে মাদক ব্যবসা দেশের নিরাপত্তার প্রধান শত্রু। সেখানে সশস্ত্র বাহিনীর ক্রমাগত প্রচেষ্টায় কিছুটা হলেও জাতীয় নিরাপত্তা এখনো বজায় রয়েছে।

এদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সাধারণত সম্পূর্ণত এককভাবে সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় (বিশেষ করে সেটি যদি হয় একটি গণতান্ত্রিক দেশ)। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ('Insurgent')-দের সামরিক (গেরিলা) তৎপরতার ধাক্কাটি সামলে রেখে রাজনীতিবিদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ করে দেয়। 'Insurgent' রা মূলত আবেগপ্রবণ ও নিয়মিত যুদ্ধকৌশল এবং যুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিয়মরীতি মেনে চলতে অভ্যস্ত নয়, তাই সশস্ত্র বাহিনীর অনুপস্থিতিতে তারা বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে চরম মানবতাবিরোধী, ধ্বংসাত্মক

কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ১৯ কিন্তু যদি প্রাথমিক স্তর হতে শুরু করে ক্রমাগত Insurgent-দের ঠেকিয়ে রাখা যায় তবে তা শেষ পর্যন্ত অন্তত 'লেজে গোবরে' অবস্থার সৃষ্টি করে না। নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী পোষার অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয়তা এখানেই।

শক্তিসাম্য বজায় রাখা
(To maintain Balance of power)

'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' বা শক্তিসাম্য কথাটি এত ব্যাপক পরিসরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যে, একে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কোন বিশেষ সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় না। আবার অন্যভাবে ভাবতে গেলে এর ব্যাখ্যায় অগণিত মনীষীর প্রচুর উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে হয়। অর্থাৎ 'শক্তিসাম্য' কথাটির যেমন একদিকে কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই, অপরদিকে এর হাজারো 'অর্থ' আছে। অধ্যাপক জর্জ সোয়ার্জেনবার্গার (Geogre Schwarzenberger)-এর মতে, 'শক্তিসাম্য' হলো একটি সাম্যাবস্থা (Equilibrium) অথবা "a certain amount of stability in international relations." এবং এই stability বা স্থিতিশীলতা আনয়ন করার ক্ষেত্রে যেকোন স্বীকৃত পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন অধ্যাপক মর্গেনথু'র মতে, এক্ষেত্রে মূলকথা হলো 'শক্তিসাম্য', এবং "এটা রক্ষা করার নীতিসমূহ শুধুমাত্র অনিবার্য নয়, এটা সার্বভৌম জাতি সমবায়ে গঠিত সমাজের স্থায়িত্ব আনয়নের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান।" শক্তিসাম্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পন্ডিতগণ প্রচুর গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সবচেয়ে উপযুক্ত ও সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন সম্ভবত অধ্যাপক সিডনী বি. ফে (Sidney B. Fay) । তিনি Encyclopaedia of the Social Sciences-এ এই বিষয়ে রচিত একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন,

> "It (balance of power) means such a just equilibrium in power among the members of the family of nations as will prevent any of them from becoming sufficiently strong to enforce its will upon the others."

অর্থাৎ 'শক্তিসাম্যের অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শক্তির এমন একটি সাম্যাবস্থা, যা যে কোন একটিকে বাধা দেবে এমন অধিক শক্তিশালী হতে, যাতে সে অপরের উপর তার ইচ্ছাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে না পারে'। অপর কথায় 'শক্তিসাম্য' হলো 'hegemony' বা 'dictation'-এর বিপরীত একটি প্রতিশব্দ।

এদিকে ব্যালেন্স অব পাওয়ার বজায় রাখার কৌশল হিসেবে সাধারণত নিম্নলিখিত প্রধান

১৯। শ্রীলংকায় Well trained Soldier-এর অনুপস্থিতিতে তামিলরা প্রাথমিক পর্যায়ে যে Foot hold বা ভিত্তি গেঁড়ে বসতে পেরেছিল তার ফলশ্রুতিতে শ্রীলংকার ভয়াবহ অবস্থার কথা সকলেই কমবেশী অবগত আছেন।

ছয়টি পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে গবেষকরা মোটামুটি একমত হয়েছেন ঃ

ক। মৈত্রী জোট (Alliances)

খ। অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ (Armaments and Disarmaments)

গ। ক্ষতিপূরণ (Compensations)

ঘ। সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র (Buffer states)

ঙ। বিভক্তিকরণ ও শাসন (Divide and Rule)

উপরোক্ত ছয়টি পদ্ধতির আলোকে সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতির ব্যাপারটি বিবেচনায় আনলে স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভ্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঐ ছয়টি ধারার দ্বিতীয় ধারাটি যেখানে অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণের কথা বলা হয়েছে, সেটি সরাসরি সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও 'মৈত্রীজোট' গঠনেও সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতির ব্যাপারটি প্রাধান্য পায়। অন্যদিকে ব্যাপক পরিসরে আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে, অন্যান্য পদ্ধতির জন্যও 'সশস্ত্র বাহিনী' ও 'যুদ্ধ' কথাটি এসে যাবে।

বাংলাদেশের মত একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশ বৈশ্বিক পরিমন্ডলের শক্তিসাম্যে হয়ত নজরকাড়া কোন অবস্থান গ্রহণ করতে পারবে না; কিন্তু আঞ্চলিক পরিমন্ডলে এদেশ অবশ্যই বিশেষ ভূমিকা পালনের ক্ষমতা রাখে।

'শক্তিসাম্য' বজায় রাখার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার ব্যাপারে আমাদের সাধারণত চিন্তা জগতে বেশ কিছু স্বাভাবিক প্রশ্নের উদয় হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিভ্রান্তি'-গুলো হলো ঃ

ক। শেখ মুজিবুর রহমানের মতে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হচ্ছে "Friendship to all and malice towards none" অর্থাৎ 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়'। স্বভাবতই ধরে নিতে হয়, যেহেতু আমরা সকলের বন্ধু, তাই আমাদের বৈরী কোন শক্তি নেই। এবং যখন বন্ধু হিসেবে 'বন্ধুত্ব' গড়ে নেয়া হচ্ছে, যার অন্যতম শর্ত হলো 'নিরপেক্ষতা' সেখানে বন্ধুদের সাথে লড়ার জন্য নিশ্চয়ই শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই।

খ। পত্র-পত্রিকা, আন্তর্জাতিক সামরিক তথ্য সরবরাহকারী সাময়িকী থেকে আমরা আমাদের সামরিক শক্তি, বিশেষ করে অস্ত্রপাতি, সরঞ্জাম সম্পর্কে যে তথ্য-উপাত্ত পেয়ে থাকি, তাতে প্রথমেই একজন সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে যে, "আমাদের যখন সামর্থ্য নেই 'সম্ভাব্য শত্রু'র বিপক্ষে তার মত (enemy) সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করার, তখন কিভাবে বা কেন আমরা অযথাই সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করায় মরীচিকার পিছনে ছুটবো?"

এক্ষেত্রে সাধারণত 'শক্তিসাম্য' বলতে অনেকেই বুঝে থাকেন 'ওর যদি একটি কামান

থাকে তবে আমারও একটি' বা 'ওর যদি ১০০০টি জঙ্গী বিমান থাকে তবে আমারও থাকতে হবে ১০০০টি, কি নিদেনপক্ষে ৭০০-৮০০টি'। এ অবস্থা কল্পনায় যখন সামরিক শক্তি খাতে ব্যাপক অবস্থানগত পার্থক্য চোখে পড়ে যায় তখন বিভ্রান্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

গ। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের 'অধিশ্বর' সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর সারা বিশ্ব যখন আজ একমেরু বা 'Unipoler' যুগে প্রবেশ করেছে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমগুলোতে যেখানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, সেখানে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা সুনির্দিষ্টরূপে কি হবে তা একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ বর্তমানে অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন ক্ষমতা প্রকাশের অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া এ যুগে কেউ সরাসরি হঠাৎ করে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কব্জা করার চিন্তা করতে পারে না। কুয়েতের ঘটনা এক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ঘ। আঞ্চলিক পরিমন্ডলে আমরা 'সার্ক' নামের একটি সহযোগিতামূলক চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ এবং এ যাবত আমাদের সামরিক খাতের সবচেয়ে বড় বন্ধু বা সরবরাহকারী দেশ চীনের সাথে ভারত সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া অপর প্রতিবেশী মায়ানমারও চীনের অন্যতম বন্ধু রাষ্ট্র। তাই এতদিন আমরা যে শক্তিসাম্যের বলয়ে বাস করতাম সে অবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন হওয়ায়, আমরা কেন ভারত বা মায়ানমারের সাথে বা অন্য যে কারো বিপরীতে অর্থনীতি, শিক্ষা, কৃষি ও যাবতীয় উন্নয়ন খাতকে বাদ দিয়ে অযথা সামরিক সাজ-সরঞ্জামের পিছনে পয়সা নষ্ট করব?

এসব সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রশ্ন ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ই আমাদের 'শক্তিসাম্য' বজায় রাখার ব্যাপারে শক্তিশালী নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী গঠনের বিপরীতে ধারণা প্রদান করে থাকে। কিন্তু 'বন্ধু হতে চেয়ে' যদি হঠাৎ 'শত্রু বলে গণ্য' হই তা হলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে- সে প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন হলেও সশস্ত্র বাহিনীর সরব উপস্থিতি (রাজনীতিতে নয়) অবশ্যই ব্যালান্স অব পাওয়ার রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এখন আমরা পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখবে যে, 'শক্তিসাম্য'র সাথে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর সম্পর্কটি কিরূপ এবং বাংলাদেশের মত একটি দেশ এক্ষেত্রে কি অবস্থানে আছে বা ভবিষ্যতে থাকা উচিত।

ক। পররাষ্ট্রনীতি একটি দেশের রাজনৈতিক দর্শন ও আঞ্চলিক বা বিশ্ব পরিমন্ডলে তার অবস্থানকে সুনির্দিষ্ট করে তোলে। বাংলাদেশ কারো শত্রু হিসেবে বা কারো প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে থাকতে চায় না। তাই যে পাকিস্তানের সাথে আমাদের ভয়াবহ শত্রুতায় স্বাধীনতা যুদ্ধ করতে হয়েছিল, সেই পাকিস্তানের সাথে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। অথচ তখন আওয়ামী লীগ শাসনামলে আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি-আদর্শ ও আঞ্চলিক বা বিশ্ব পরিমন্ডলের আদর্শিক অবস্থান ছিল রুশ-ভারত ক্ষমতা বলয়ের সহযোগী হিসেবে। তখন আমরা ভারতের বন্ধু

হতে চেয়ে ভুল করেছিলাম কি-না তা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতির আলোকে 'শক্তিসাম্য' বজায় রাখার জন্য ভারত-বাংলাদেশ ২৫ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি সাধিত হয়েছিল। সে চুক্তির ৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী 'একপক্ষ তৃতীয় কোন পক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হলে অন্যপক্ষ শর্তানুযায়ী আক্রান্ত পক্ষের সাথে একত্রিত হয়ে আক্রমণকারী পক্ষের বিরুদ্ধে লড়বে' বলে উল্লেখ ছিল। এখন এখানে যদি বাংলাদেশের কোন সশস্ত্রবাহিনী না থাকে তবে ঐ চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে কিভাবে সাহায্য করা সম্ভব ছিল? এবং কখনো যদি বাংলাদেশ–ভারত যৌথভাবে কোন সামরিক জোটে আবদ্ধ হতে চায় তাহলেও বাংলাদেশের একটি মানসম্পন্ন সশস্ত্র বাহিনী থাকার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। ১৯৯৬ সালে আন্তঃসীমান্ত গেরিলা তৎপরতা দমনে যৌথ অভিযান পরিচালনার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেখানেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ভারতীয়দের প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারবে বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু যারা সশস্ত্র বাহিনী থাকার প্রয়োজন নেই-এ ধারণায় বিশ্বাসী তাদের কথামতো বাংলাদেশের কোন সেনাবাহিনী না থাকলে 'বন্ধুদেশ ভারতকেও' এই সহযোগিতা প্রদান সম্ভব ছিল না এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলেও সম্ভব হবে না।

এবার যদি '৭৫-পরবর্তী সরকারগুলোর কথায় আসি, তবে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের দেশে তখন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দর্শনেরও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং এ অঞ্চলে তখন থেকেই আমরা চীনের সাথে এবং আরো বড় পরিসরে মুসলিম দেশগুলোর সাথে মোটামুটি জোটবদ্ধতা বজায় রেখেছি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী 'কারো সাথে শত্রুতা' করতে না চাওয়ায় আমরা তখন আমাদের সীমান্তে সেনা সমাবেশ না করলেও ভারত যে বিপুল পরিমাণ সেনা সমাবেশ করেছিল তা সবারই জানা। আর এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমরা শত্রুতা করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে না রাখলেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক আদর্শ পরিবর্তনের জন্য হঠাৎ করে অন্য কারো শত্রুতে পরিণত হতে পারি। অর্থাৎ আমাদের শত্রু তৈরী হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। শত্রু থাকার সম্ভাবনা থাকলে তো সশস্ত্র বাহিনীকে পুষতেই হবে, তা নিয়মিতই হোক আর নিয়মিত-অনিয়মিত মিলিয়ে যেকোন বাহিনীই হোক।

একথা অনস্বীকার্য, 'মৈত্রীজোট' বা 'Alliance' গঠন শক্তিসাম্য রাখার সবচেয়ে প্রধানতম উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাশিয়া না জড়িয়েও নেপথ্যে সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী জোট গঠনের মাধ্যমে পাক-মার্কিন-চীন-এর জোটগত ভীতিকে অকার্যকর করে দিয়েছিল। কিন্তু দূরবর্তী দেশ হওয়ায় তারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়নি। তখন যদি ভারতের সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে জোট বাঁধার পরও নিজস্ব সেনাবাহিনী না থাকতো তাহলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া ভারতের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াত, কারণ সোভিয়েতদের পূর্ব পাকিস্তানে আসার সরাসরি সহজ কোন পথ ছিল না।

তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বৃহৎশক্তির সাথে জোট গঠন করলেও নিজস্ব

শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন হয়; নতুবা সে জোট কার্যকরী কোন ফল লাভে ব্যর্থ হয়। যেমন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালীর নীচুমানের প্রশিক্ষিত সৈনিকদের মিত্রবাহিনীকে মোকাবেলায় ব্যর্থতার জন্য জার্মান বাহিনীকে নিজ এলাকা ছেড়ে ইতালীয় বাহিনীর সাহায্যে বারবার যেতে হয়েছে। এর ফলে জার্মান বাহিনীর Area of Responsibilities বেড়ে যাওয়া ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ায় মিত্রবাহিনীর হাতে মার খেতে হয়। যেহেতু জোট গঠন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একে অপরকে সাহায্য করা, তাই উভয় পক্ষের বা প্রত্যেকের সাধ্যানুযায়ী সশস্ত্র বাহিনী থাকতে হয়। তা না হলে একপক্ষের দুর্বলতায় অন্যপক্ষও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নিজের স্বার্থ সর্বাগ্রে বিবেচিত হয় বলে অপরের বিপদে প্রথম পর্যায়েই জোটবদ্ধ 'মুরুব্বী দেশ' এগিয়ে আসে না। বরং আক্রান্ত দেশকেই প্রাথমিক বাধা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়।

খ। 'শক্তিসাম্য' তত্ত্বের প্রথম কথাই হল আঞ্চলিক বা বিশ্ব পরিমন্ডলে কোন একক শক্তিকে সর্বশক্তিতে বলীয়ান হয়ে স্বৈরতান্ত্রিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা থেকে বিরত রাখা। প্রথম পর্যায়ে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত আলোচনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, একটি অঞ্চলে কোন একটি দেশকে কেন্দ্র করে সাধারণত উক্ত অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয় বা হতে পারে। তবে যদি সে দেশটি তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, নীতি-আদর্শ অযাচিতভাবে ক্ষুদ্র দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা না করে তবে অসুবিধের কিছু নেই। কিন্তু অত্র অঞ্চলে ভারত নামের যে দেশটি বিশাল আকার-আকৃতি ও ততোধিক বিশাল আর্য অহংকার নিয়ে অবস্থান করছে তার আচার-আচরণে এ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, ভারত যেন তার সকল প্রতিবেশীকেই অনুগত হিসেবে দেখতে চায়।

এক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারত এই এলাকার সকল দেশের সাথে কি ধরনের আচার-আচরণ করেছে ও করছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়োজন নেই। তবে ভারতের নেতৃত্ব হতে শুরু করে স্ট্রাটেজিক বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে প্রায় সকলে ভারতকে এ অঞ্চলে তো বটেই বরং আজকাল একটু আগ বাড়িয়ে বিশ্ব পরিসরেও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে খবরদারী করার মত একটি দেশে পরিণত করতে চাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ছিল 'সুদূর আফ্রিকা হতে ইন্দো-চীন পর্যন্ত অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করা।'[২০] এমনকি নেহেরু মন্তব্য করেছিলেন,

> "There are many advanced, highly cultured countries, but if you peep into the future and of nothing goes wrong, wars and the like, the obvious fourth country in the world is India."[২১]

২০। জওহরলাল নেহেরু লিখিত *'ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া'* পুস্তকে উদ্ধৃত

২১। Quoted in Baldev Raj Nayar, *'A world role : The dialectics of Purpose & Power'* in John W. Mellor [ed.] India-A Rising Middle Power, Delhi, 1981.

অর্থাৎ তিনি যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পরেই চতুর্থ শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

এদিকে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের পত্রিকা BIISS Journal-এর প্রাক্তন সম্পাদক ব্রিগেডিয়ার এম আব্দুল হাফিজ ভারতের এ অঞ্চলে Politico-Strategic Overview সম্পর্কে লিখেছেন,

"India's perception of smaller countries around falling within her security orbit and her tightening of grip on land-locked Nepal, Bhutan and Sikkim as well as strategic island of Sri Lanka through various treaty obligations and cerefully cultivated politico cultural relations caused equal anxiety as to India's interntions."[২২]

এই Security orbit-এ নেয়ার মানসেই ভারত সরকার বহু পূর্বেই নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকার সাথে চুক্তি করার পর বাংলাদেশের সাথে এমন কি পাকিস্তানের সাথেও চুক্তি করে এবং এক পর্যায়ে সিকিমকে কব্জা করে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েমে সচেষ্ট হয় এবং এ অঞ্চলে ভারত অন্য যে কোন দেশের সাথে পার্শ্ববর্তী কোন দেশের সু-সম্পর্ক সহ্য করবে না বলে সরাসরি জানিয়ে দেয়। ভারতের বিশিষ্ট সমরবিশারদ কে. সুব্রামনিয়াম স্বামীর মতেঃ

"This country (i.e India) with it's population, size, resources and industrial output will be a dominant country in the region just as the US, Soviet Union and China happen to be in their respective areas. This is just fact of geography, economics and technology."[২৩]

এখন ভারত যদি ভূগোল, অর্থনীতির সূত্র মেনে Dominant দেশে রূপান্তরিত হতে চায় তবে আপাতঃদৃষ্টিতে তাতে কোন অসুবিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু তারা আজ এমনও বলছে যে,

"India will not tolerate any external intervention in a conflict situation in any South Asian country, if the intervention has any implicit or explicit anti-Indian implication. No South Asian government must, therefore, ask for external military assistance with an anti-Indian bias from any country."[২৪]

২২। M. Abdul Hafiz, *'South Asia's security : Extra-Regional Inputs'*. BIISS Journal Vol. 10 No. 2. 1989. p. 131

২৩। K. Subrahmanyam, *'India's Security Perspectives'*. New Delhi, ABC Publishing House 1983. pp.122-23

২৪। Bhabani Sen Gupta, *'The India Doctrine'*-India Today, 31 August, 1983

অর্থাৎ সোজা কথায় ভারত এ এলাকার কোন দেশের ভারত-বিরোধী কোন দেশের সাথে সখ্যতা কোনভাবেই মেনে নেবে না। তাই দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশ যেন ভুলেও এ ধরনের কোন চিন্তা না করে।

যদিও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রায়শ সকলকে 'গণতান্ত্রিক উদারতায়'এ বলে আশ্বস্ত করেন যে, "বৃহৎ, ক্ষুদ্র বা কোন ধরনের শক্তি হবার ইচ্ছে বা প্রবৃত্তি ভারতের নেই ও প্রতিবেশী দেশগুলোর ব্যাপারে কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করতে (ভারত) ইচ্ছুক নয়।''[২৫]

কিন্তু বাস্তবে ভারত পার্শ্বস্থ সকল দেশের সাথে কোন না কোন ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে ও বন্ধুত্বের বাতাবরণে 'সহযোগিতা' মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

এসব নামমাত্র মৈত্রী চুক্তির আড়ালে একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া অন্যান্য দেশকে তার (ভারতের) নিজস্ব নিরাপত্তা বলয়ের বাইরে ক্ষতিকর কোন পদক্ষেপ নিতে বাধা দিয়েছে। এমন কি কোন পদক্ষেপ কোন দেশের নিতান্ত বাঁচা-মরার প্রশ্ন হলেও তাকে হুমকি, পরোক্ষ চাপ বা সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, মৈত্রী চুক্তি সবসময় বড় ও প্রভাবশালী দেশের স্বার্থের অনুকূলে যায়, যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে তা মনে হয় না। তাই বিশ্লেষকরা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন,

> "For a small country the best neighbour is a rich country with a small army. The most dangerous enemy is a poor country with a big army."[২৬]

অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র দেশের জন্য সর্বাপেক্ষা ভাল প্রতিবেশী হচ্ছে একটি ধনী দেশ যার রয়েছে ক্ষুদ্র একটি সেনাবাহিনী। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ শত্রু হচ্ছে বৃহৎ সেনাবাহিনীর অধিকারী দরিদ্র একটি দেশ।

ভারতের ক্ষেত্রে এ যুক্তিটি শতকরা একশত ভাগ প্রযোজ্য এবং এর সাথে যুক্ত হয়েছে পন্ডিত নেহেরুর ভাষ্য-"প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সমস্ত এলাকা একদিন ভারতের একচ্ছত্র দখলে চলে আসবে"-এমন স্পষ্ট আগ্রাসী বাসনার ভবিষ্যত ভীতি। বিশ্বের রণকৌশলগত অবস্থানের আলোকে এ মনোভাব অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ পায় ভারতীয় বিশ্লেষকদের মন্তব্য থেকে। তাদের মতে, "কিছু কিছু রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভারত বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের রণনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিতে পারে'' ।[২৭]

সে জন্য এতদঞ্চলে ভারত এমন একটি Grand strategy (মহারণনীতি) কার্যকর করত চায় যাতে দক্ষিণ এশিয়ায় তার একাধিপত্য সুসংহত হয় এবং "এরূপ লক্ষ্য অর্জনে ভারত 'আন্তঃনির্ভরশীলতা' (Inter-dependence) রণনীতি বাস্তবায়নে সক্রিয়" ।[২৮]

২৫। *'Aspects of our foreign policy from speeches and writings of Indira Gandhi'*-New Delhi; an AICC Publication. 1973. p. 86.
২৬। Prof. G.B. Khanal of Nepal-quoted in *Newsweek*, September 25, 1989
২৭। Pradyumna P. Karan, *India's Role in Geopolitics* in K.P. Misra, [ed.), *'Foreign policy of India'* A Book of Readings; New Delhi; Thomson Press [India] Ltd. 1977. p-2
২৮। K.R. Narayanam *'New perspectives in Indian Foreign Policy'* in K.P. Misra [ed.] Ibid, p-177

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও ভারত তার আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে প্রয়াসী যাতে ক্ষমতাধর "ভারত মানব জাতির সেবায় বিশ্ব রাজনীতির পুরোভাগে স্বীয় আসন লাভ করতে পারে"।[২৯]

"এভাবে আন্তঃনির্ভরশীলতা রণনীতি গ্রহণ সত্ত্বেও এ অঞ্চলে ভারতের বাস্তব অবস্থান ও আচরণ এবং এসবের পাশাপাশি ভারতের বিশ্ব অভিলাষ-সবকিছু মিলিয়ে নয়াদিল্লী এমন একটি ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে যে, ভারতকে আধিপত্যবাদী আশা-আকাঙ্খার দায়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। ... ভারতের কেন্দ্রস্থ অবস্থান, এর বিশাল আয়তন ও ব্যাপকভাবে শক্তির কারণে সার্কভুক্ত পার্শ্ববর্তী দেশগুলো প্রায় অনবরত ভারতভীতিতে সন্ত্রস্ত। দৃশ্যমান ধারণা যে, এ অঞ্চলের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলো তার নিরাপত্তা বলয়াধীন"।[৩০] এবং এ জন্য "এসব দেশকে অতি অবশ্যই ভারতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ সংরক্ষণে ভারতীয় কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে, থাকতে হবে ভারতীয় কোটরাধীন"।[৩১] অতএব অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই যে প্রতিবেশীদের মাঝে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভারতভীতির যৌক্তিকতা অনুভূত হবে তা বলাই বাহুল্য।

রাজনীতিবিদ নাজিম কামরান চৌধুরীর মতে, "সংযুক্তিকরণ ছাড়া ভারত এখনো পর্যন্ত কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সামরিক আগ্রাসন চালায়নি"[৩২] ও "বর্তমান বিশ্ব পরিবেশে বহিঃআগ্রাসনের প্রবণতা দিনে দিনে কমে আসছে,"[৩৩] তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতের আগ্রাসী মনোবৃত্তি তাকে ভবিষ্যতে শক্তিমদমত্ততায় মাতাল হয়ে যে কোন সরাসরি হস্তক্ষেপে ইন্ধন যোগাতে পারে।

ক্ষেত্রবিশেষে ভারত তার আধিপত্যবাদী মনোভাব প্রকাশ এতটাই 'চাছাছোলা' যে, মুক্তিযোদ্ধা মেজর জয়নুল আবেদীন-এর মতে,

> "India Never criticised the soviet invasions of Hungary, Czechoslovakia (1968) and Afganistan (1979) and the Vietnamese invasion of Combodia (1987). Rather India maintained diplomatic relation with the illegal govts. installed by the invaders and advocated their causes in international forums. India did not support any resolution accepted by the UN General Assembly demanding the withdrawl of Soviet troops from Afganistan or of

২৯। Rajiv Gandhi; *Statements on Foreign Policy,* November 1984-[New Delhi; External Publicity Division, Ministry of External Affairs, 1985]. p.20

৩০। আবুল কালাম, ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার সহযোগিতা-সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি [আবুল কালাম সম্পাদিত] পৃ, ১১৫

৩১। Shelton Kodikara, Strategic Factors in *'Interstate Relations in South Asia'*-Canberra Papers on Strategy and Defence; No. 19 [Canberra: The Strategic and Defence Studies Center, The Research School of Pacific Staudies, The Australian National University] 1979. pp.65-66

৩২। নাজিম কামরান চৌধুরী 'বাংলাদেশ ঃ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সশস্ত্র বাহিনী', পৃ. ৪৪-৪৫

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫

Vietnamese troops from Cambodia....No other government outside the communist block supported so shamelessly the Soviet invasion of Afganistan and the Vietnamese invasion of Cambodia. India silently supported Iraqi invasion in Kuwait... While the rest of the world denounces the Serbian ocupation of and atrocities in Bosnia-Herzegovina, India keeps mum..."৩৪

এবং এভাবে সব জায়গায় আগ্রাসনের ক্ষেত্রে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সমর্থন জানানোর কারণ অনুসন্ধান করে মুক্তিযোদ্ধা ও ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর জয়নুল আবেদীন তাঁর উপরোক্ত বইয়ে আরো উল্লেখ করেছেন,

"The basic reason for India's supporting the invaders is that she herself swallowed many territories such as Kashmir, Junagarh, Manvadar, Hyderabad, Goa, Daman and Due illegally and forcibly. She grabbed the Himalayan Kingdom of Sikkim by treacherous and shady means." ৩৫

অনেকে এসব ঘটনাকে অতীত ইতিহাস বা গণতান্ত্রিক উপায়ে 'ভারত মাতার' সাথে একদেহে লীন হওয়া অর্থে বুঝিয়ে থাকেন। অথচ ভারত ১৯৮৭ সালের ২৯ জুলাই শ্রীলংকার সাথে সরাসরি হুমকির মাধ্যমে যে চুক্তি স্বাক্ষর করে সেখানে শ্রীলংকার অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে এক বিশ্লেষক একে অভিহিত করেন, "কনের সম্মতিবিহীন বিয়ের আয়োজন রূপে"। ৩৬

এভাবে সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে বলা যায় যে, ভারত এ অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্যকে নিজের অনুকূলে নিয়ে গিয়ে আপন অভিলাষ চরিতার্থ করায় অবিরত চেষ্টা চালিয়ে গেছে, যাচ্ছে ও যাবে।

মনে রাখতে হবে, ভারত আমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু নাও হতে পারে কিন্তু তার প্রত্যক্ষ শত্রু পাকিস্তান ও চীনের বিপরীতে অন্যান্য ক্ষুদ্রদেশকে তার প্রভাবাধীনে আনতে সে সব সময়ই সচেষ্ট। অন্ততঃপক্ষে এ দেশগুলোকে ভারত নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখতে চায়, যাতে পার্শ্ববর্তী কোন দেশ শক্তিশালী হয়ে কোন সময় তার বিপক্ষে অবস্থান নিতে না পারে। ৩৭

এদিকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পর্যায়েও ব্যাপারটি অনেকটা এক রকম। যদি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ভারতের বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারত অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত

৩৪। Major Zainul Abedin, *India Needs Veto Power?* p.10

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ-১১

৩৬। Sadek Khan in Holiday, 14 Aug 1987

৩৭। এরকম না হলে উক্ত দেশ তার আদর্শ বজায় রাখার জন্য শক্তি সঞ্চয় করবে এবং ভারতকে এখানে ঐ দেশের বিপরীতে সেনা মোতায়েন রাখতে হবে যা তার সশস্ত্রবাহিনীকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় নিপতিত করবে।

হয়ে তার অবস্থান আরো ভাল করবে; পাশাপাশি ক্ষুদ্র দেশগুলো দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ঐসব দেশের জন্য ভারতের কোন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রাখতে হবে না ও একাধিপত্য বিস্তার এবং নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রচুর সুবিধা হবে। সে জন্য ভারত সব সময় ছলে বলে কৌশলে যেকোন পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত। এ ধরনের অবস্থা কখনো পৃথিবীর ইতিহাসে মঙ্গল ডেকে আনেনি। তাই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের দিকে মনোযোগ দেয়া ভারতের প্রতিবেশী প্রতিটি দেশেরই কর্তব্য।

এরপর যদি USA-র মত বৃহৎ শক্তি "প্রকাশ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে প্রভাব বিস্তারকারী দেশ হিসেবে মেনে নেয় ও আঞ্চলিক একাধিপত্য বিস্তারে সমর্থন জোগায়"[৩৮] তা হলে কি hegemony প্রতিষ্ঠার ভয়ে ভীত দেশগুলোর Counter action-এ নামার প্রয়োজন পড়ে না? কারণ, "আমরা এ অঞ্চলে কোন বৃহৎ শক্তির উত্থান দেখতে চাই না। কেননা তাতে করে এ অঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য ব্যহত হবে।" [৩৯]

উপরোক্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমরা একথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, আমাদের মত ছোট ছোট দেশগুলোর জন্য ভারতীয় একাধিপত্য প্রতিহত করেই কেবল স্বাধীনভাবে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গেলে আমাদের সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী হওয়া ছাড়া ভিন্ন কোন পথ খোলা নেই এবং জোটগত শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব শক্তি বলয় বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই কেবল শ্রীলংকা, মালদ্বীপ বা নেপালের মত পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব।

গ। অস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া বা সশস্ত্র বাহিনীর আকার-আকৃতিতে শক্তিসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে যে প্রতিপক্ষের হুবহু শক্তিসম্পন্ন হতে হবে - এমন কোন যুক্তিসঙ্গত কথা শক্তিসাম্য নিশ্চিতকরণের জন্য নিশ্চিতভাবে প্রযোজ্য নয়। এক্ষেত্রে অনেকেই Balance of power concept-এর সাথে এ চিন্তাকে গুলিয়ে ফেলেন।

অথচ, উপমহাদেশ ও এর পার্শ্বস্থ এলাকার সমরশক্তি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে বাংলাদেশ কিভাবে এ এলাকায় ক্ষমতায় ভারসাম্য বজায় রাখায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ধরা যাক, এখন যদি ভারতীয় সীমান্তে চীন ৮-১০ ডিভিশন সেনা মোতায়েন রাখে, পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে ১৭-২০ ডিভিশন ও বাংলাদেশ ৭ ডিভিশন সেনা মোতায়েন করে তবে তার বিপরীতে ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে ৬-৮ ডিভিশন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২০-২৫ ডিভিশন এবং বাংলাদেশের বিপরীতে ৮-১০ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করতে হবে।

এ ছাড়াও বিচ্ছিন্নতাবাদের ডামাডোলে আক্রান্ত ভারতে বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েনের ফলে কখনোই 'চীন-পাক-বাংলাদেশ অক্ষে'র যে কোন একটি দেশের বিরুদ্ধে ভারত সরাসরি Overwhelming majority অর্জন

৩৮। প্রাগুক্ত ক্রমিক ২২, দ্রষ্টব্য, পৃ.১৩৮
৩৯। ১১ ডিসেম্বর ১৯৯২ তারিখে ভারতের 'দি হিন্দু'র সাথে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রদত্ত সাক্ষাৎকার

করতে পারবে না। যেমন, যদি পাকিস্তানের সাথে ভারতের সরাসরি যুদ্ধ লেগে যায়, তবে কখনোই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে সম্পূর্ণ Neutralise না করে বাংলাদেশ সীমান্ত হতে বেশী সৈন্য সরিয়ে পাক সীমানায় মোতায়েন করা সম্ভব হবে না।

অন্যদিকে ট্যাংকের কথা যদি বিবেচনায় আনা হয় তবে একথা মনে রাখত হবে যে, ভারতের ৩৪০০ ট্যাংকের বিপরীতে চীনের প্রায় ১৩,০০০ ট্যাংকের তুলন করা উচিত নয়। কারণ চীন কেবলমাত্র ভারতের জন্য ১৩,০০০ ট্যাংক ভারত সীমান্তে নিয়ে আসেনি এবং একই যুক্তিতে ভারত তার সব ট্যাংক নিয়ে বাংলাদেশের দিকে ধাবিত হবে - এমন মনে করাও হাস্যকর। কারণ ভারতের ২৪০০-এর মত ট্যাংক কেবলমাত্র পাক সীমান্তেই মোতায়েন অবস্থায় আছে, বাদবাকী ট্যাংক চীন, নেপাল, বাংলাদেশ সীমানায় ছড়িয়ে আছে। অন্যান্য সরঞ্জামের ক্ষেত্রেও অবস্থাটা এ দৃষ্টিতে চিন্তা করতে হবে।

তাই বাংলাদেশের বিপরীতে যদি ভারত ৩০০-৪০০ বা ৫০০ ট্যাংক মোতায়েন রাখে তবে বাংলাদেশের বর্তমানে যে পরিমাণ ট্যাংক আছে সে অবস্থায় কখনোই ভারত কোন Offensive-এ যেতে পারবে না। 'শক্তিসাম্য' রক্ষার ব্যাপারটি এভাবেই প্রক্রিয়াজাত হয়ে থাকে।

ঘ। জোটগত শক্তিসাম্য রক্ষায় প্রায়ই একটি বড় রকমের বিপত্তি ঘটে থাকে। যেকোন কারণেই হোক না কেন, হঠাৎ করে জোটের (হয়ত) মাত্র একটি দেশের (বিশেষ করে বড়, প্রাধান্য বিস্তারকারী দেশের জন্য) জন্য জোট ভেঙ্গে যায়। তখন শক্তিশালী একটি দেশের যে 'নিরাপত্তা ছত্রছায়ার' নীচে তুলনামূলক ছোট বা অল্পশক্তির দেশগুলো থাকে তারা বেশ বেকায়দায় পড়ে যায়। যেমন-সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ায় ভারত হঠাৎ করে অনেকটা অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায় বা পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য স্থগিত হওয়ায় পাকিস্তান পূর্বে সরবরাহকৃত মার্কিন অস্ত্রপাতির খুচরা যন্ত্রাংশ পাওয়া হতে বঞ্চিত হতে থাকে।

এমন পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের মোটামুটি 'দ্বিতীয় পন্থা' হিসেবে নিজস্ব প্রযুক্তি চালু থাকায় অন্তত প্রথম ধাক্কায় সামাল দেয়া গেছে। আরেকটা প্রমাণ হিসেবে শ্রীলংকার সাথে ভারতের চুক্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ভারতীয় বাহিনী শ্রীলংকায় প্রবেশ করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে সেখান থেকে পাততাড়ি গুটাতে হয়েছে এবং শ্রীলংকার সশস্ত্র বাহিনীকেই এককভাবে সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। সুতরাং শক্তিসাম্য বজায় রাখার জন্য মৈত্রীজোটের আশ্রয় নেয়া হলেও যেকোন সময় তার ব্যর্থতার আশংকায় সব সময় নিজস্ব একটি সশস্ত্র বাহিনী বা দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকার কোন বিকল্প নেই।

পৃথিবী কখনোই কোনকালে বিশেষ কোন দীর্ঘ সময়ের জন্য শক্তিসাম্য বলয়ের বাইরে থাকেনি। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি দ্বিমাত্রিক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা বজায় থাকত। তারপর আবার সে অবস্থার পরিবর্তনে অন্য

আরেকটি বলয় সৃষ্টি হত। যেমন-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বেশ ক'টি আদর্শিক শক্তির দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যুদ্ধ-পরবর্তীতে দ্বি-মাত্রিক একটি আদর্শিক শক্তিসাম্য ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। আজ পর্যন্ত বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের পর হতে যখন যুদ্ধাস্ত্র ও রণকৌশলগত ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তখন কোন না কোন বড় মাপের যুদ্ধ বা আদর্শিক ঝাঁকুনি খেয়ে পৃথিবী আবার পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে।

এ অঞ্চলের প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি ভারত যার সকল কৌশল বা "All doctrines aimed at treating the smaller countries lying within her security orbit and implied that these countries must subserve Indian interest, particularly in security and foreign policy matters."[৪০] অর্থাৎ ভারত তার নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত সকল ছোট দেশের প্রতি তার সকল নীতমালা এমনভাবে নির্ধারণ করে ও চাপিয়ে দেয় যাতে সেসব দেশ অবশ্য অবশ্যই ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ - বিশেষ করে ভারতের নিরাপত্তা ও বিদেশ নীতির সমান্তরাল ভূমিকা পালন করে। এ পরিস্থিতিতে ভারতের Hegemonic role-এর বিপরীতে শক্তি সঞ্চয় করার কোন বিকল্প থাকতে পারে না এবং শক্তি সঞ্চয়ই হচ্ছে এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র দেশগুলোর টিকে থাকার বা ভারসাম্য বজায় রাখার অন্যতম উপায়। এখন এই Balance বা শক্তিসাম্য যেভাবেই অর্জিত হোক না কেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাটি সেখানে একান্তভাবে লক্ষণীয়।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা
(Preserve Sovereignty and Independence)

রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণের মতে, যদিও স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীই একমাত্র নিশ্চয়তাবিধানকারী প্রতিষ্ঠান নয় বরং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জোটবদ্ধতা ও আনুষঙ্গিক আরো অনেক কিছুই এর সাথে জড়িত- তবুও স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী প্রধান নিয়ামক শক্তি বলে বিবেচিত। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যে সব সময় কেবলমাত্র বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ বা আগ্রাসন দ্বারাই বিনষ্ট হবে - এমন কোন নিশ্চিত উদাহরণ নেই।

অনেক সময় গৃহযুদ্ধ, অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব বা শত্রুদের পরোক্ষ কিন্তু ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে একটি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। যেমন - ১৯৭১ সালে অখন্ড পাকিস্তানে অসন্তোষ সৃষ্টি, আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠা ও গৃহযুদ্ধ শুরুর ধারাবাহিকতায় যখন পশ্চিম পাকিস্তানের দৃষ্টিতে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তখনই কেবলমাত্র শেষ পর্যায়ে ভারত সরাসরি পাকিস্তান আক্রমণের ঝুঁকি নেয়। যখন কোন দেশ তার বিপক্ষে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ

৪০। প্রাগুক্ত, ক্রমিক ২২ দ্রষ্টব্য, পৃ, ১৫৯

কোন শত্রুর অবস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয় তখন অবশ্যই সরাসরি বহির্মুখী বা বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা গণনার মধ্যে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং যখনই নিজস্ব নিরাপত্তার প্রশ্নটি আসে তখনই সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার প্রশ্নটিও সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। মূলত "রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী গঠনের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো বহিঃশত্রুর হামলা থেকে দেশের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রচেষ্টা প্রতিহত করা। মানবতাবোধ এখনো যুদ্ধ প্রবণতাকে পরাজিত করতে পারেনি বলে এবং আন্তর্জাতিক আইন এখনো কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ছাড়া আগ্রাসন রোধে অক্ষম বলে প্রতিটি জাতিই তাদের নিজ নিজ সেনাবাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।"[৪১]

পৃথিবী অনেক তত্ত্ব, পদ্ধতির আলোকে পরিচালিত হয়ে আসছে। শান্তির গালভরা বাণী ও ইদানিং জাতিসংঘের আওতায় ছোট দেশের উপর সর্বপ্রকার বহিঃআক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থার নমুনাও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। হাজার মানবতা, সভ্যতা, শান্তির ললিত বুলি আওড়িয়ে জাতিসংঘ নামক পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত সংস্থাটি মূলত যা প্রসব করছে তা আমাদের আরো ভালো করে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, নিজেদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আমাদের নিজস্ব উদ্যোগেই রক্ষা করতে হবে। অন্তত একথাটি তো সত্যি যে, কেউ যদি আমাদের সরাসরি আক্রমণ করে বসে বা নিতান্তই খন্ডভাবেও সীমান্তে হামলা চালায় তবে সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া সেটি ঠেকাতে যাবে কে?

অনেক সময় আবার সরাসরি যুদ্ধ বেধে না গেলেও খন্ড যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। যেমন-পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ১৯৬৫ সালের বসন্তে 'রান অব কাচ'-এর যুদ্ধ এবং সাম্প্রতিককালে সিয়াচেন হিমবাহ নিয়ে যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। আমাদের ক্ষেত্রেও যে ভবিষ্যতে এমন ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? কারণ আমরা যদি ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে কোন সময় একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক-সামরিক শক্তিতে কারো চক্ষুশুলে পরিণত হই তখন ওরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন চীন, উত্তর কোরিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পর মধ্যপাড়া ও বড়পুকুরিয়া খনিজ প্রকল্পের কাজ এখন শেষ হতে যাচ্ছে এবং যমুনা সেতু তৈরীর প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের উপর যে কোন পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ গোপন চাপ আসা অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। ভারতে গ্যাস রপ্তানী প্রসঙ্গে চাপ প্রয়োগের প্রক্রিয়াকে 'পাহারা' দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেয়া একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি ছাড়া কার্যকর করা অসম্ভব। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে জনৈক বিদেশী বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছিলেন যে, কোন প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প অবকাঠামো ছাড়া শুধু দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে বাংলাদেশ নামক দেশটি কতদিন টিকে থাকতে পারবে? কিন্তু বর্তমানে

৪১। প্রাগুক্ত, ক্রমিক ৩২ দ্রষ্টব্য, পৃ-১১

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান মিলেছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকলেও আর দুর্ভিক্ষ নেই। তাই আমরা যে এগিয়ে যেতে পারব না - কথাটি কোনভাবে সত্য নয়। অনেকে বলে থাকে, প্রচুর উন্নয়ন ও অর্থ ছাড়া সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব নয় এবং উচিত নয়। কিন্তু ১৯৬২ সালের চীনের সাথে যুদ্ধের পর ভারতের এমন কি শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল যে, তারা ব্যাপকভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন আরম্ভ করলো? মূলত ভারত তার জাতীয় নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ধারাকে নিশ্চিত করতে তার নাগরিকদের একটি প্রজন্মকে কষ্টে রেখে হলেও সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নে নজর দেয়। চীনও ঠিক ঐরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং দু'টি দেশই তাদের শত্রুর হাত হতে পরবর্তী পর্যায়ে সরাসরি আক্রমণের বা আগ্রাসনের সম্ভাবনা রহিত করে দিতে সক্ষম হয়। এটি তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকেও ছত্রছায়া প্রদান করে।

ভিয়েতনামও ঠিক ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করায় তার এককালের মিত্র চীনের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে চীনসহ সকল দেশকে তাকে না ঘাটানোর জন্য ইঙ্গিত প্রদানে সক্ষম হয়। অনেকে এক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ টানতে পারেন। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া চীনের মত অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ব্যালান্স রক্ষা না করে উদ্ভট নিবর্তনমূলক সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করায় এবং পৃথিবীব্যাপী সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটানোর মানসে বিপ্লব রপ্তানীতে এমনভাবে ব্যাপৃত ছিল যে, নিজের অবকাঠামোর অভ্যন্তরে সি.আই.এ'র পরোক্ষ তৎপরতা অনুধানব করতে পারেনি।

বাংলাদেশ 'কারো সাথে শত্রুতা নয়' নীতি যতই অবলম্বন করুক না কেন আমরা যদি আমাদের সরকার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা অব্যাহত রাখি বা একসময় কেবলমাত্র মুসলিম দেশ হওয়ার অপরাধে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হই তখন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলে রেহাই পাওয়া যাবে না।

আমরা উন্নত দেশ না উন্নয়নশীল দেশ সে তর্ক পরে করা যাবে কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞের মতে "No matter how strong or weak a state may be, a sense of insecurity is likely to arise if that state feels that a foreign power has stepped upon a policy which is in due course of time may be aggressive upon it or it's friends."

অর্থাৎ একটি দেশ কতটুকু শক্তিশালী বা দুর্বল সেটা বড় ব্যাপার নয়, লক্ষণীয় বিষয় হলো যদি একটি বিদেশী শক্তি এ দেশ ও তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে একটি আগ্রাসী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে তা হলে ঐ দেশ অবশ্যই তার নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় আমরা কি একাধিক বা বিশেষ করে একটি দেশের অনুসৃত আগ্রাসী মনোবৃত্তি থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেব না?

স্বকীয়তা রক্ষা

(To protect Internal values)

"আদর্শগত কারণেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক স্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নতুন একটি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রাথমিক একটি স্পৃহাই থাকে, শক্তিশালী একটি শসস্ত্র বাহিনী গঠন। ... দেশের জনগণকে গৌরববোধে উজ্জীবিত করার জন্য, ...ভাবমূর্তি গঠন প্রয়োজন হয় যাতে করে জনগণ উপলব্ধি করতে পারে যে, আপদকালে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে রয়েছে একটি সুসংগঠিত শক্তি।" [৪২]
পাশাপাশি গুলটারিজের মতে,

> "আধুনিক একটি রাষ্ট্রের জাতীয় ভাবমূর্তি সৃষ্টির একটি উপায় হলো কার্যকর একটি সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনী গঠন।"

উপরোক্ত দু'জনের মতের আলোকে বলতে হয়, আমাদের দেশ কি স্বাধীনতা সংগ্রাম করে স্বাধীন হয়নি? আমরা কি একটি আধুনিক জাতি নই?

আমার দেশের কি নীতি হবে তা একান্তই আমার নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে কারো চাপানো পররাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দর্শন আমরা সহ্য করব না। যদি করি তবে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন নই বা আমার জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত বা নিরাপদ নয়। ওয়াল্টার লিপম্যান-এর মতে

> "A nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values, if it wishes to avoid war, and is able, if challanged, to maintain them by such victory in such a war." [৪৩]

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আমাদের মৌলিক মূল্যবোধগুলোর প্রকৃতি কি রকম ও এগুলো রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাটিই বা কিরূপ? এ পর্যায়ে আমাদের এককালীন শত্রু পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ অস্ত্র সরবরাহকারী যুক্তরাষ্ট্র হলেও যখন তথাকথিত 'ইসলামিক বোমা' তৈরীর অজুহাতে তারা সামরিক-অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেয় তখনও পাকিস্তানকে দুর্বল করে ফেলা সম্ভব হয়নি বা পাকিস্তান মার্কিন চোখ রাঙানোর ভয়ে পারমাণবিক কর্মসূচী থেকে পিছিয়ে আসেনি। বরং তার নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে গেছে। এমন কি ১৯৯০ সালে যখন ভারত পাকিস্তান আক্রমণে তৈরী হয়ে গিয়েছিল তখন খুব ভালভাবেই তার স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা করতে পেরেছিল। এখন পর্যন্ত পাকিস্তানকে কোন হুমকি দ্বারা তার নিজস্ব পথ গ্রহণ থেকে বিরত রাখা যায়নি। ভারতের ব্যাপারটিও তাই এবং এ জন্যেই আজ ভারতকে পাশ্চাত্য ও চীন আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। ন্যায় হোক অন্যায় হোক ভারত তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি

৪২। প্রাগুক্ত, ক্রমিক ৩২ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১৩

৪৩। Walter Lippmann, *'US Foreign Policy: Shield of the Republic'* [Boston, Little Brown, 1943] p.5

হতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাশ্মীরে সামরিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। কিন্তু বিপরীতে কোন বিশেষমাত্রায় বৈদেশিক চাপ তাকে সহ্য করতে হচ্ছে না বা হলেও সে গায়ে মাখছে না। কারণ ভারত যেমন তার শক্তি সম্পর্কে আস্থাশীল, তদ্রূপ অন্যরাও সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

একথা সকলেই জানে যে, বিশ শতকে ও এখন পৃথিবী যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ও হবে এবং যারা নিজ দেশের পরিচয়ে গর্বিত সেখানে গর্বের উৎসটি অবশ্যই হলো সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব। পাঁচটি পরাশক্তি তাদের ইচ্ছেমত নিজস্ব ধ্যান-ধারণা লালন-পালন করছে সামরিক শক্তির বলে। আজ ডিভি লটারী জিতে গর্বিত আমেরিকান হওয়াকে বাংলাদেশীরা এত গুরুত্বের সাথে কেন নিচ্ছে তা খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, পৃথিবী জুড়ে আমেরিকানদের শক্তিমদমত্ততার সাথে বিচরণ প্রত্যক্ষ করে সকলে আমেরিকাকে অবচেতনভাবে Great ভাবতে শিখে গেছে। জাপানের বা জার্মানীর উদাহরণ টেনে অনেকে এখানে সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে জাতিসত্তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু জার্মানী ও জাপান তো সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহাপরাক্রমশালী দুই শক্তি হিসেবেই সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছিল এবং বর্তমানেও তাদের সামরিক শক্তি কম নয় ও তাদের নিরাপত্তা জোটগত নিরাপত্তা চুক্তি দ্বারা নিশ্চিত।

এ প্রসঙ্গটি ব্যাপক পরিসরে আলোচনার দাবী করলেও অন্তত এটুকু বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি অর্থাৎ আমাদের স্বকীয়তা রক্ষা পাবে তখনি যখন আমাদের থাকবে একটি গর্ব করার মতো সশস্ত্র বাহিনী, যা আকারে বড় না হয়েও হবে দুর্ধর্ষ এবং এভাবেই সম্ভব শ্রীলংকা, নেপাল বা কুয়েতের মত মান-সম্মান বিসর্জন না দিয়ে কারো চোখরাঙানোকে উপেক্ষা করা।

বাংলাদেশের মত একটি দেশে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী থাকা কেন প্রয়োজন এ নিয়ে এ পর্যন্ত যতগুলো 'কারণ' উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলো ছাড়াও দুর্যোগ মোকাবিলা, উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন সহযোগি হিসেবে কাজ করার [৪৪] জন্যও সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে বলে প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণ দৃঢ় মত পোষণ করেন।

শেষে বলা যায়, সশস্ত্র বাহিনীর আকার, প্রকৃতি, সাংগঠনিক ভিত্তি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলো পর্যালোচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু সবারই ঘরবাড়ি প্রয়োজন বসবাসের জন্য, জিনিসপত্র রাখার জন্য। কি বড়লোক, কি দরিদ্র কারোরই এ ব্যাপারে দ্বিধা নেই। যার একেবারেই ঘর নেই সে ভাসমান ব্যক্তি। স্বাধীন দেশ কখনো ভাসমান হয় না। ঘরের বেড়াটা যেরূপ দরকার চোর-ডাকাত হতে আব্রু, সম্পদ রক্ষার জন্য, তদ্রূপ স্বাধীন জাতি তা যতই দরিদ্র হোক না কেন, তার দরকার একটি সামর্থ্য অনুযায়ী সেনাবাহিনী। তাই 'অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা' কথাটি ১০০ ভাগ সত্য।

৪৪। ইন্দোনেশিয়ার মত দেশে বেশ কিছু ভারী শিল্প-কারখানা সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনা করে ও সে স্থাপনার লাভ সশস্ত্র বাহিনী পরিচালনায় ব্যয়িত হয়। এরূপ আরো অনেক ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন অনুভূত হয়ে আসছে।

এ আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে একটা সত্য ঘটনা দিয়ে ইতি টানতে চাই। ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর ইসরাইলের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামায়ারকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার সৈনিকেরা কিভাবে এতগুলো আরব দেশের সাথে যুদ্ধ করে? একবারও পশ্চাদপসারণ করে না কেন?' গোল্ডমায়ারের উত্তর ছিল, "আমার দেশের তিনদিকে আরব দেশ। একদিকে সমুদ্র। আমার সৈনিকেরা পশ্চাদপসারণ করে যাবে কোথায়? সমুদ্রে!" আমাদের বাংলাদেশের অবস্থাটা কি অনেকটা ওরকম নয়? যদিও ভারত একটি বৃহৎশক্তি, কিন্তু "The fact should be remembered that a little bear can not live with a giant wolf in a totally insecure condition."[৪৫]

এই বাস্তবতা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একটি শিশু ভালুক একটি বিশাল হিংস্র হায়েনার পাশে কখনোই সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। এছাড়া স্বয়ং আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে সূরা আন্ফাল-এ বলেছেন, "তোমরা শক্তি সংগ্রহ কর, যতটা সম্ভব"। তাই বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দেশ হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে আত্মরক্ষার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে যে কখনোই এগিয়ে যাওয়া যাবে না, তাও আমাদের মনে রাখতে হবে। সামগ্রিক বিশ্লেষণে এটা বলা যায় যে, নিরাপত্তা হচ্ছে "একজনের টিকে থাকার প্রতি হুমকি থেকে অবমুক্তি। তাই স্বকীয় স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা ও জাতীয় মৌল চেতনাসমূহ রক্ষার সামর্থ্যই হচ্ছে নিরাপত্তা।"[৪৬]

বাংলাদেশের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ ভারতের একজন প্রাক্তন সেনাপ্রধান কে. সুন্দরজীও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় শক্তি সঞ্চয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন,

"To be weak is not virtuous, being prepred is not being provocative".[৪৭]

৪৫। Md. Nuruzzaman, '*National security of Bangladesh*', BIISS Journal Vol. 12, No. 3, 1991

৪৬। Maj Gen Ghulam Quader, '*The challenges of security and Develpement : A view from Bangladesh.*' BIISS Journal. Vol. 15, No. 3,1994, pp-213-214

৪৭। Quoted is Ashequa Irshad, '*Indian Military Power and Policy*', BIISS Journal, Vol. 10, No. 4, 1989, p.410.

অধ্যায়-২

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ

আমাদের মত একটি দরিদ্র দেশে শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী কেন প্রয়োজনীয়, এর ব্যয় বরাদ্দ হবে কিভাবে বা আর্থিক সঙ্গতির সাথে প্রতিরক্ষা খাতের সমন্বয়ের চিত্রটি কেমন হবে, তা বর্ণনা করার জন্য প্রয়োজন বিস্তর পরিসর। তবে আমরা যদি কেবলমাত্র বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে প্রকৃত ব্যয় এবং এর যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই যে, সত্যের সঙ্গে এসব প্রচারণার মিল নেই। এক্ষেত্রে প্রথমেই দেখা যাক, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ব্যয় বরাদ্দে যুক্তি কি বলে? একথা সত্য যে, বাংলাদেশের আর্থিক ও ভৌগোলিক অবস্থান কোনো দেশের সাথে দীর্ঘমেয়াদী প্রচলিত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অনুকূলে নয়। বিপরীতে অনেকেই সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসেবে যে দেশটির নাম বলে থাকেন, সেদেশের সাথে সমানে সমান পাল্লা দেয়ারও প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু তারপরও বলতে হয়, মূলত সামরিক খাতে প্রস্তুতি ও ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া এ জন্যই বজায় রাখা হয় যে, এতে অন্তত ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকে বা Detterent নিশ্চিত হয়, যা অন্যান্য পর্যায়ে ক্ষমতা প্রতিফলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, "More than ever before India is exhibiting its independence abroad, backed by a large military force."[১] অর্থাৎ ব্যাপক সামরিক শক্তির জোরেই ভারত আজ পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় তার স্বাধীনতা চেতনাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরছে। একারণেই ২৮ এপ্রিল '৯৫ তারিখে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যে কোন মার্কিন চাপকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী চালিয়ে যাবে বলেও ঘোষণা করেছে। অথচ এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ন্যূনতম পর্যায়েও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা ভারত রাখে না। চীনের বিপরীতেও ভারতের অবস্থান অনেকটা একইরূপ।

ব্যাপক দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ভারতের সামরিক খাতে ব্যয় পর্যালোচনা করলে অবাক হতে হয়। এমনকি কোনো কোনো সময় ভারতের সামরিক ব্যয় গণচীনকেও ছাড়িয়ে যায়। যেমন, ১৯৮৯ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে চীনের বাজেট বরাদ্দ ছিল মাত্র ৮.৯ বিলিয়ন ডলার। এখন, এখানে আমরা ভারতের প্রতিরক্ষা নিয়ে বা তাদের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যবহৃত বাজেট নিয়ে কেন আলোচনা করব, এ প্রশ্ন আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আমাদের দেশে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠনের বিরোধী প্রায় সকল বুদ্ধিজীবী যখন রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি নিয়ে কোন স্ট্যানডার্ড নির্ধারণ করেন, তখন তাঁরা ভারতের উপমাই টেনে আনেন যত্রতত্র। তারা বলেন, ভারতে আছে অবাধ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভারত আজ এগিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধির

১। Ashequa Irshad, *Indian Military power and policy*, BIISS Journal, Vol-10, No-4, 1989

পথে। এছাড়া একটি গণতান্ত্রিক দেশের উদাহরণ টানতে হলেও এরা ভারতের গণতন্ত্রায়ণকেই টেনে নিয়ে আসেন। এখন, সবকিছুতেই যদি আমাদের অনুসরণ করতে হয় ভারতকে, তা হলে আর প্রতিরক্ষা খাতই বা বাদ থাকবে কেন?

একথা কে না জানে, বর্তমানে এ অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য কখনোই ভারতের অনুকূলে নয়। পাকিস্তানের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু শুধু যদি চীনের কথাই ধরা যায় তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? প্রথমেই দেখা যাক, চীনের সামরিক শক্তির সাথে ভারতের সামরিক শক্তির অবস্থান কোথায় ঃ

		চীন	ভারত
১।	(সর্বমোট) সশস্ত্রবাহিনীর সংখ্যা	২,৯৩০,০০০	১,২৬৫,০০০
২।	রিজার্ভ	১,২০০,০০০	৬০০,০০০
৩।	সেনাবাহিনী	২,২০০,০০০	১,১০০,০০০
৪।	নৌ বাহিনী	২৬০,০০০	৫৫,০০০
৫।	বিমান বাহিনী	৪৭০,০০০	১১৬,০০০
৬।	মিলিশিয়া/প্যারা মিলিটারী	১,২০০,০০০	১২৭,৫০০
৭।	ট্যাংক	১৩,০০০+	৩৪০০
৮।	সাঁজোয়া যান	২,৮০০+	১৫৭
৯।	আর্টিলারী (গোলন্দাজ) (Towed)	১৪,৫০০	৩,৩২৫
১০।	আর্টিলারী (Self Propelled)	unknown	unknown
১১।	স্ট্র্যাটেজিক সাবমেরিন (SSBN)	০১	-
১২।	ট্যাকটিক্যাল সাবমেরিন	৬০	১৫
১৩।	ডেস্ট্রয়ার	১৮	-
১৪।	ফ্রিগেট	৫২	১৮
১৫।	পেট্রোল ও কোস্টাল যুদ্ধ জাহাজ	৮৭০+	৪০
১৬।	মিসাইল বোট	২১৭	৬
১৭।	টর্পেডো বোট	১৬০	-
১৮।	মাইন ওয়ারফেয়ার জাহাজ	২১১	২০
১৯।	উভচর জাহাজ	৫৯	৯
২০।	অন্যান্য জাহাজ	১৬৪	২২
২১।	নৌ বিমান বাহিনী	৯৩৮	৬৫
২২।	বোমারু বিমান	৪৭০	-
২৩।	যুদ্ধ বিমান (FGA, Fighter)	৪,৫০০	৭৯৯
২৪।	পর্যবেক্ষণ বিমান	২৯০	১৬
২৫।	পরিবহণ বিমান	৬০০	১৯২
২৬।	হেলিকপ্টার	৪০০	১৪০

এ তো গেল সাধারণ বা কনভেনশনাল বাহিনীর তুলনামূলক বিবরণ। এছাড়া অনিয়মিত

সমরাস্ত্রের ক্ষেত্রেও ভারত কোনো অবস্থাতেই চীনের ধারে-কাছে পৌছার স্বপ্ন দেখার সামর্থ্য রাখে না। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ-এর বাৎসরিক পত্রিকা দি মিলিটারী ব্যালান্স ৯৮ অনুযায়ী চীনের অনিয়মিত সমরাস্ত্র ও বিশেষ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এ রকম ঃ

ক। স্ট্রাটেজিক মিসাইল বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৯০,০০০। এরা ৬টি বেসে বিন্যস্ত। এ বাহিনীতে রয়েছে আই সি বি এম বা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল (আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র), যেগুলোর পাল্লা ৮,০০০ কিলোমিটার থেকে ১৩,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। এছাড়া রয়েছে প্রচুর আই আর বি এম বা ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল। এমনকি সম্প্রতি স্ট্র্যাটেজিক বাহিনীতে সংযুক্ত হতে যাচ্ছে একটি গলফ (Golf) শ্রেণীর সাবমেরিন যা থেকে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা সম্ভব। এ প্রযুক্তিতে যে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয় তাকে বলে SLBM বা Submarine Launched Ballistic Missile.

(খ) নৌ-বিমান বাহিনী ও বিমান বাহিনীর অনেক বিমান থেকেই পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা সম্ভব। এছাড়া এমন বিমানও রয়েছে যা ALCM বা Air Launched Cruise Missile নিক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে।

অথচ, বিপরীতে ভারতের এখনো কোন আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নেই এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সেগুলো যদি ভারতের সমরভান্ডারে সংযুক্ত হয়ও, তাতেও সে কখনো চীনের ব্যাপক মিসাইল ফোর্সের বিরুদ্ধে কোনো ন্যূনতম কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারবে না। অর্থাৎ সার্বিকভাবে বলা যায়, একদিকে চিরশত্রু পাকিস্তানকে সামাল দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য ও সমরাস্ত্র মোতায়েন রাখার পর ভারতের পক্ষে কখনো চীন বা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয়। যেমন, ভারতের কাছে যে ৩,৪০০ ট্যাংক রয়েছে তার প্রায় ২,৫০০ ট্যাংকই সে মোতায়েন করেছে পাকিস্তান সীমান্তে। বাদবাকী ট্যাংকের কিছু আছে বাংলাদেশের চারদিকে। অবশিষ্ট ৫০০/৬০০ ট্যাংক দিয়ে ভারত কিভাবে পুরো চীনা বর্ডার কভার করবে? যদি কভার করতে হয়, তাহলে ভারতকে হয় এই চরম দরিদ্র অবস্থায় হাজার হাজার ট্যাংক বানাতে হবে, নয় তো মেনে নিতে হবে চীনের আধিপত্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ভারত শত দারিদ্র্যের মাঝেও সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছে এই আশায় যে, এক সময় সে হয় তো চীন সীমান্তে ব্যালান্স অব পাওয়ার মোটামুটি সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসতে পারবে বা যে কোন চীনা আক্রমণের ক্ষেত্রে অন্তত কিছু দিনের জন্য চীনকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে। এক্ষেত্রে ভারত যদি 'আমার তো সামর্থ্য নেই, আমি তো চীনের সাথে পারবো না, এবং যেহেতু পারব না, সেহেতু সামরিক খাতে বেশী ব্যয় বরাদ্দেরও প্রয়োজন নেই' এ কথা বলে সমরসজ্জা বন্ধ রাখে, তবে তা চীন, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের জন্য সুখকর হলেও ভারতের জন্য কখনো যৌক্তিক হতে পারে না। তবে এখানে সবচেয়ে যা লক্ষ্যণীয়, তা হলো ভারতের একজন বুদ্ধিজীবীও কখনো, কোন পত্রিকায়, কোন একটা লেখাতেও ভারতের সমরসজ্জার যৌক্তিকতা নিয়ে বিরূপ কোন

মন্তব্য করেননি। তারা কখনোই বলেননি যে, যেহেতু চীনের সাথে, আমেরিকার সাথে পাল্লা দেয়া সম্ভব নয়, তাই অযথা সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ করে কোন লাভ নেই। আসলে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিমন্ডলে সমরসজ্জার যৌক্তিকতাই হলো মূলত ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা। এবং নিরাপত্তার অভাববোধ থেকেই সামরিক বাহিনী গঠন, লালন-পালনের প্রশ্ন আসে। এখন সেই সামরিক বাহিনী ছোট হোক আর বড় হোক বা তার জন্য কম হোক বেশী হোক যে খরচই করা হোক না কেন।

এবার দেখা যাক, বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর পিছনে বা প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ আসলে কত এবং এর যৌক্তিকতাই বা কি? এ পর্যায়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ হওয়ায় আমরা সামরিক খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে পারি। নীচের ছক[২] হতে এ ব্যাপারের একটি চিত্র পাওয়া সম্ভব ঃ

দেশ/অঞ্চল	জিডিপি'র শতকরা হারে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়	স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের হার	জাতীয় মোট আমদানীর তুলনায় সমরাস্ত্র আমদানীর হার	সশস্ত্র বাহিনী (১৯৯০) প্রতি ১০০০০ জনের বিপরীতে	প্রতি শিক্ষকের বিপরীতে	প্রতি ডাক্তারের বিপরীতে
বাংলাদেশ	১.৪	৪১	৬.৪	১.০	০.৩	৬
ভারত	৩.১	৬৫	১২.০	১.৫	০.৩	৪
নেপাল	১.৬	৩৫	-	১.৯	০.৪	৩.৫
পাকিস্তান	৬.৫	১২৫	৮.৩	৪.৯	১.৫	৯
শ্রীলংকা	৪.৫	৬০	২.০	৪.০	০.৬	১৯
স্বল্পোন্নত দেশ	৩.৪	৩৩	-	৮.৭	০.৮	৪

উপরোক্ত সারণী মতে, কোন ন্যূনতম ইতিবাচক ধ্যান-ধারণা লালনকারী ব্যক্তি কিভাবে, কোন যুক্তিতে বলতে পারেন যে, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা খাতে অতিরিক্ত ব্যয় করছে? এমনকি ঐ সারণীতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশের অর্থনীতি নেপালের তুলনায় অনেক ভালো হওয়ার পরও নেপালের জিডিপি-তে যেখানে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় শতকরা ১.৬ ভাগ, সেখানে বাংলাদেশে সে হার মাত্র ১.৪ ভাগ, অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই, অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশ হতেও আমরা অনেক-অনেক কম খরচ করছি। এদিকে ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৭ সালের হিসাবে বাংলাদেশে জিএনপি'র শতকরা হারে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ছিল ১.১ ভাগ যেখানে ভারতে এর হার ৩.০ ভাগ, পাকিস্তানে ৫.৪ ভাগ ও শ্রীলঙ্কায় ৫.৮ ভাগ। ঐ

২। *ইউ, এন.ডি.পি- মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯৪*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়াদিল্লী, ১৯৯৪, সারণী ২১, পৃ. ১৭১-২

একই রিপোর্ট থেকে আরও দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতে মাথাপিছু প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ছিল ১১ ডলার, পাকিস্তানে ২৭ ডলার, শ্রীলঙ্কায় ৪৭ ডলার ও বাংলাদেশে মাত্র ৪ ডলার।

এভাবে বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় তুলনামূলকভাবে বরাবর বেশী থাকার পরও প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা প্রতিবছরই প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে একমাত্র ভারতের উদাহরণ উপস্থাপন করাই যথেষ্ট। ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০০০ তারিখে প্রণীত বাজেটে ভারত তার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে শতকরা ২৮ ভাগ। টাকার অঙ্কে এই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বিগত ৫৩ বছরের মধ্যে ঐ বাজেটই হচ্ছে সর্বোচ্চ, যেখানে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৩.৬২ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৬১ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল হারে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করলেও ভারত কিন্তু এখনও একটি দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ নয়। বরং গত অর্থবছরে (২০০০-২০০১) জাতিসংঘ খাদ্য সংস্থা প্রণীত হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের অভুক্ত জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বাস হল ভারতে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সাথে জনসংখ্যানুপাতে ভারতের জনসংখ্যা ৭ গুণ বেশী হলেও প্রতিরক্ষা খাতে ভারত বাংলাদেশ অপেক্ষা ২০ গুণ বেশী অর্থ ব্যয় বরাদ্দ করেছে।

এসব তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় তাই কখনও একথা বলা হয়ত যৌক্তিক হবে না যে, বাংলাদেশ অপ্রাসঙ্গিক বা অযৌক্তিক হারে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ করছে। বরং সামগ্রিক পর্যালোচনা থেকে এটাই বলা যায় যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় বরাদ্দ মোটামুটি স্থিতিশীল ও সার্বিক অর্থনৈতিক মানদন্ডে সুসহনীয়। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত এদেশে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা যেমন খুব একটা বাড়েনি, তেমনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কোন সমরাস্ত্র সংগ্রহেও অর্থ ব্যয় করা হয়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে রাজস্ব ব্যয়ের পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীন খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দ দেয়া হলেও প্রতিরক্ষা খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তার প্রায় পুরোটাই হচ্ছে রাজস্ব ব্যয়। অর্থাৎ ১৯৯৯-২০০০-এ যে ৯০৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা থেকেই কিন্তু বেতন ভাতা, প্রশিক্ষণ খরচ চালিয়ে সমরাস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এত অল্প অর্থ দিয়ে কোন মানসম্পন্ন, আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব কি-না তা একটি জটিল প্রশ্ন বটে। এর উপর প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয়ের সাথে সরকার দেশের ১০টি ক্যাডেট কলেজের ব্যয় নির্বাহও সংযুক্ত করায় মূলত সামরিক প্রয়োজনে প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করা হয়নি বলে ধরে নেয়া যায়।

এদিকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক মন্দা বা অন্যান্য নেতিবাচক প্রকরণের জন্য এককভাবে কখনোই প্রতিরক্ষা বাহিনী বা প্রতিরক্ষা নীতির দোষ দেয়া যেতে পারে না। বরং আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বিগত বছরগুলোয় এ দেশের জন্য কম ত্যাগ স্বীকার করেনি। শান্তিবাহিনীর সৃষ্টিকালেই 'অশান্তি' দমনে এই সামরিক বাহিনীর সদস্যরাই দেশের জন্য নির্ভয়ে, বিনা প্রশ্নে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, '৯০-র গণআন্দোলনেও এদের

ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রফেশনালিজমের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। এ ব্যাপারে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগনের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে। ওয়াশিংটনে মার্কিন সিনেটে এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ দেয়া একটি রিপোর্টে পেন্টাগন মন্তব্য করেছে যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনী অবদান রাখছে।[৩] এ সবের বাইরেও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবে বিদেশে শুধু যে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছে তা-ই নয়, বরং তারা '৯৫ অর্থ বছরে রেমিটেন্স হিসেবে পাঠিয়েছে প্রায় ৮শত কোটি টাকা। সামরিক খাতকে যারা অনুৎপাদনশীল খাত বলেন, তারা এ টাকা পাঠানোকে কি বলবেন জানি না, তবে তাদের জ্ঞাতার্থে আরো একটি জটিল বিষয় এখানে তুলে ধরছি। ইউএনডিপি-র রিপোর্টে দেখা যায়, বর্তমানে শ্রীলংকার সামরিক খাতে ব্যয় জিডিপি-র ৪.৮% ভাগ, যা এ এলাকায় পাকিস্তানের পরে সবচেয়ে বেশী। অথচ এই শ্রীলংকা সম্পর্কে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৯৮৫ সালে জিডিপি'র শতকরা হারে শ্রীলংকার সামরিক ব্যয় ছিল ৩.২ ভাগ, সেখানে '৮৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪.৪ ভাগে এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ৪.৮ ভাগে।[৪]

উল্লেখ্য, সামরিক খাতে শ্রীলংকার ব্যয় বৃদ্ধি পায় আশির দশকে। এর পূর্বে শ্রীলংকার কোন মানসম্পন্ন, প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী ছিল না বললেই চলে। সে সময় শিক্ষা, শিল্পোন্নয়নে শ্রীলংকা দক্ষিণ এশিয়ায় সকলের চেয়ে এগিয়ে ছিল। কিন্তু তামিল সমস্যা যখন শুরু হল, তখন প্রাথমিক ধাপে শ্রীলংকা সামরিক পর্যায়ে কোন বিশেষ মাত্রায় বাধা দিতে না পারায় তামিলরা প্রথম ধাক্কাতেই তাদের ভিত্তি শক্ত করে ফেলে। এর পর শ্রীলংকা যখন হুড়মুড় করে সশস্ত্র বাহিনীর আকার বাড়াতে থাকে, তখন একদিকে যেমন সুপ্রশিক্ষিত সেনা সদস্য পাওয়া যাচ্ছিল না, তেমনি অন্যদিকে একটি মোটামুটি মানসম্পন্ন সশস্ত্রবাহিনীর অবকাঠামো দাঁড় করাতে করাতে তামিলরা মাত্রাতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে ফেলে। ফলে শ্রীলংকা যতবারই রাজনৈতিক সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছে, ততবারই তামিলরা হয় তাতে পাত্তা দেয়নি, নয় তো রাজনৈতিক আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করে শক্তি বাড়িয়েছে। তাই আপাতঃদৃষ্টিতে শান্তিকালীন সময়ে খরচ একটু বেশীই মনে হতে পারে, তবে তা ভবিষ্যতের 'বীমা'র মত বিপদের বন্ধু।

বাংলাদেশেও আমরা তাই কখনো সামরিক খাতকে অনুৎপাদনশীল খাত বলতে পারি না, বলা উচিতও নয় এবং যারা বলেন, তারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মর্মমূলে আঘাত হানেন, অস্বীকার করেন মুক্তিযুদ্ধের রক্তে গড়া সংগঠন বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীকে।

এবার আলোকপাত করা যাক, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে। এ পর্যায়ে আমরা ১৯৯৪ থেকে ২০০১ সালের বাজেট তুলে ধরতে পারি।

৩। দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ জুলাই ১৯৯৫

৪। SIPRI Year Book, *World Armament and Disarmament, 1992*

খাতওয়ারী বাজেট বরাদ্দ
(অঙ্কসমূহ কোটি টাকায়)

	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১
শিক্ষা	৩৪৫৭.১০	৩৭৫৩.২১	৩৯৭৬.৬৫	২৮০৩.১	২৮৭২.১৯
স্বাস্থ্য	১৫৬২.৪৯	১৭৪১.৩৭	১৮৯১.৩৭	২৩৬৩.৩৫	২৬৮৮.৩৯
স্বরাষ্ট্র	-	-	১১৫৬.৩১	১৫৯২.৫৯	১৫৯৫.৬২
পরিবহণ	২৪৬৪.৯৪	৩০৫২.৯২	১৬৭০.৯৯	-	-
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	-	-	-	২৪৩৫.০৭	২৪৩৫.৪১
প্রতিরক্ষা	১৮২৪.০	১৯৩৫.০	২৫২৫.১৩	৩৩০৩.০	৩৩৪১.৫৮

এ ছাড়াও নিম্নে উল্লেখিত দু'টি ছক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার অপরাপর দেশের তুলনায় বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

ভারত এবং পাকিস্তানে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি (বাৎসরিক %)[৫]

	ভারত আর্থিক	পাকিস্তান আর্থিক	আর্থিক	প্রকৃত
স্বাধীনতা (১৯৪৭) হতে ১৯৬১-২[ক]	৪.৭	১.৭	৮.৬	৫.৬
১৯৬২-৩ হতে ১৯৭১-২	১২.৯	৮.৬	১৮.১	১২.০[খ]
১৯৭২০৩ হতে ১৯৭৯-৮০	১৬.৫	৩.৩	১১.২	১.৮
১৯৮০-১ হতে ১৯৮৯-৯০	১৬.৬	৯.৮	১৬.৪	৯.৯[গ]
১৯৯০-১ হতে ১৯৯৫-৯৬	১১.৩	১.১	৮.৫	-২.২
স্বাধীনতা হতে ১৯৯৫-৯৬ (গড়)	১১.৮	৫.২	১২.৪	৬.২

টীকা ঃ প্রকৃত বৃদ্ধি হিসাব করার জন্য পাকিস্তানের জিডিপি ডিফ্লেক্টর এবং ভারতের পাইকারি মূল্যসূচক ব্যবহার করা হয়েছে, যদি না অন্যভাবে বলা হয়ে থাকে। [ক] বাৎসরিক মুদ্রাস্ফীতির হার ৩% ধারা হয়েছে। [খ] ভোক্তার মূল্যসূচক ১৯৬২-৬৩ এর পরিবর্তে ১৯৬০ সালের ধরা হয়েছে। [গ] পাইকারি মূল্যসূচক ১৯৮০-এর পরিবর্তে ১৯৮১-৮২ ধরা হয়েছে।

৫। *Government of India 1996, Government of Pakistan 1996,* Tahir, 1993.

স্নায়ু যুদ্ধোত্তর সামরিক বোঝা (% পরিবর্তন, ১৯৭৮-৯৪) [৬]

সামরিক ব্যয়	সেনাবাহিনীতে জনবল পরিবর্তন (%) (১৯৮৭-৯৪)	সামরিক দখলে সম্পত্তির পরিমাণ ১৯৯৪ সালের অবস্থান (ইউএস ডলার, মিলিয়ন)	পরিবর্তন (%) (১৯৮৭-৯৪)	১৯৯৪ (হাজার)	পরিবর্তন (%) (১৯৮৭-৯৪)
বাংলাদেশ	৭.৫	৩৮০	১২.৪	১১৫	৫৬.৩
ভারত	৪.২	৯,৫০০	০.০	১,২৬০	১৬.৩
নেপাল	৪৩.০	৪০	১৬.৩	৩৫	পাওয়া যায়নি
পাকিস্তান	৩০.০	৩,৫০০	২২.০	৫৯০	৩৭
শ্রীলঙ্কা	১০৮.৩	৫০০	২৯৪.২	১২৬	৪৯.৩
দক্ষিণ এশিয়া	১২.৪	১৩,৯২০	৭.৫	২,১৩১	৪৩.০
সকল উন্নয়নশীল দেশসমূহ	-১৩.০	১৭১,৪২০	-১০.০	-১৪.৯১৭	-৪.৮
শিল্পোন্নত দেশ	-৪১.২	৬২২,১০৭	-২৪.২	৯,২১৫	-২১.৯
পৃথিবী	-৩৬.৭	৭৯৩,৫৮০	-১৬.০	২৪,১৩২	-১৪.৫

টীকা ঃ যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ, কামান এবং ট্যাংকে সম্পর্কিত তথ্য।

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্তের আলোকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাদেশ বরাবরই প্রতিরক্ষা খাতে একটি সহনশীল মাত্রায় ব্যয় বরাদ্দ করে আসছে। যদিও এই বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়, তবুও এই উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ আরো বাড়ানো উচিত বলে প্রতিরক্ষা গবেষকদের অনেকেই উল্লেখ করেছেন । এ ক্ষেত্রে আবার এই উপমহাদেশ, বিশেষ করে পাকিস্তান ও ভারতের সামরিক ব্যয় প্রসঙ্গ পর্যবেক্ষণের উপর অনেকেই গুরুত্বারোপ করেছেন।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারত ও পাকিস্তান উভয়েরই পারমাণবিক এমনকি হাইড্রোজেন বোমা রয়েছে। পৃথিবীতে দক্ষিণ এশিয়াই হচ্ছে একমাত্র অঞ্চল যেখানে দু'টি পরস্পরবিরোধী রাষ্ট্রই পারমাণবিক বোমার অধিকারী যারা আবার প্রতিবেশীও বটে। এছাড়া এ দু'টো দেশ এখন ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎপাদনেও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ পর্যায়ে ভারতের 'অগ্নি' যেমন বাংলাদেশের সকল এলাকাসহ পাকিস্তান ভূখন্ডে ও চীনের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় আঘাত আনতে সক্ষম, তেমনি পাকিস্তানের তৈরী 'ঘোরি-৩' ক্ষেপণাস্ত্রও সুদূর পাক ভূখন্ড থেকে ভারতের সকল অঞ্চল ও বাংলাদেশে আঘাত হানতে পারবে যে কোন মুহূর্তে। এছাড়া "পাকিস্তান ও ভারত উভয়েই রাসায়নিক অস্ত্র সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছে অথবা এর মওজুদ গড়ে তুলেছে বলে

৬। BICC 1996

পশ্চিমা দেশগুলো ধারণা পোষণ করছে।"[৭]

একথাও এখন কারো অজানা নয় যে, পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশই এখন ট্যাঙ্ক, কামান, যুদ্ধ বিমান, যুদ্ধ জাহাজ এমনকি সাবমেরিন পর্যন্ত নিজ দেশে তৈরী করে থাকে। ২০০১ সালের প্রথম দিকে 'Idea 2000' নামের একটি আন্তর্জাতিক সমর মেলা যা পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় তাতে দেখা যায় যে, পাকিস্তান ইতোমধ্যে অত্যাধুনিক আল-খালিদ ট্যাঙ্ক, বিভিন্ন ধরনের মিসাইলসহ ফ্রান্সের লাইসেন্স নিয়ে 'মিডজেট' ও 'অগাস্টা' সাবমেরিন তৈরী করছে। পাশাপাশি চীনের সাথে যৌথ উদ্যোগে জঙ্গী বিমান তৈরীর পরিকল্পনাও করেছে পাকিস্তান। অপরদিকে ভারত যেমন নিজে ট্যাঙ্ক তৈরী করে থাকে তেমনি রাশিয়ার লাইসেন্স নিয়ে 'মিগ-৩১' ও 'সুখোই-৩০'-এর মতো অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান তৈরীরও উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি যুদ্ধ জাহাজসহ বিমানবাহী রণতরী তৈরীতেও ভারত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা যায়। তবে সবচেয়ে আশঙ্কার কথা হলো, ভারত তার জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ ভাগ অংশকে দারিদ্র্যসীমার নীচে রেখে অস্বাভাবিক হারে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে চলেছে। একমাত্র ২০০০-২০০১ অর্থ বছরেই ভারত প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে শতকরা ২৮ ভাগ। প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের অব্যাহত ব্যয় বৃদ্ধি ও সমরাস্ত্র উৎপাদন নিয়ে আরো জানা যায় যে, "উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সর্বমোট উল্লেখযোগ্য সমরাস্ত্র উৎপাদনের শতকরা ৩১ ভাগই উৎপাদন করেছে ভারত যেখানে ইসরাইলে উৎপাদিত হয়েছে ২৯ ভাগ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ৯ ভাগ। বিপরীতে সকল আসিয়ান (ASEAN) দেশ একত্রে উৎপাদন করেছে মাত্র ২ ভাগ।"[৮]

একই সাথে "১৯৮৮-৯২ সময়কালে যেখানে শ্রীলঙ্কা আমদানী করেছে ১৬৪ মিলিয়ন ডলারের প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আমদানী করেছে যথাক্রমে ১.১০ বিলিয়ন ডলার ও ৩.৪৮ বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র, সেখানে ভারত একাই আমদানী করেছে ১২.২৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র।"[৯] এখানেই ভারত থেমে থাকেনি। বরং পাকিস্তান ও চীনের কথা বলে সে অব্যাহতভাবে সমরাস্ত্র আমদানী, উৎপাদন ও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়িয়েই চলেছে। এক্ষেত্রে ভারতের প্রতিবেশী হিসেবে ন্যূনতম পর্যায়ে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থেই বাংলাদেশের নজর দিতে হবে সামরিক খাতে।

এখানে একটি বিষয়ে আলোকপাত না করলেই নয়। অনেকেই প্রতিরক্ষা খাতকে অনুৎপাদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবকাঠামোয় এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করেন। অথচ, "সশস্ত্র বাহিনী এদেশে উন্নতির পথে অন্তরায় নয়, বরং উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের

৭। Robert S.Mac Namara, *'The Post-Cold War World: Implications for Military Expenditure in the Developing Countries.'* World Bank, Processesings of the World Bank Annual Conference on Developement Economics, 1991, World Bank 1992, p.116

৮। Michael Brozoska and Thomas Ohlson, [eds.] *Arms Production in the Third World, quoted in, MacNamara,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৯। SIPRI year Book, 1993, Stockholm 1993, pp.479-481

সকল পর্যায় এবং ক্ষেত্রে বিরাজমান সর্বাত্মক দুর্নীতি। দারিদ্র্য বিমোচন-২০০০ শিরোনামে ১৩ জুন ২০০০ তারিখে ঢাকায় প্রকাশিত রিপোর্টে ইউএনডিপি বলেছে, বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণে সম্পদের যে ক্ষতি হচ্ছে, তার পরিমাণ দেশের জাতীয় আয়ের দ্বিগুণ। উক্ত রিপোর্টে দুর্নীতিকে দারিদ্র্য বিমোচনের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং বাংলাদেশে দুর্নীতি সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, দুর্নীতি না থাকলে দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধি দাঁড়াতো পাঁচ শতাংশের বেশী। এর ফলে দারিদ্র্য বিমোচনের হারও দ্বিগুণের চেয়ে বেশী হতে পারতো। ইউএনডিপি'র রিপোর্টে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রেও সর্বগ্রাসী দুর্নীতিকে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে যে, দুর্নীতি মাথাপিছু আয়ের তুলনায় দ্বিগুণ।.... দুর্নীতির কারণে ব্যয়িত সম্পদের পরিমাণ সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে ব্যয়িত অর্থের চেয়ে বহু বহু গুণ বেশী।" [১০]

উপরোক্ত বিশ্লেষণ বাংলাদেশের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির পক্ষে আলোকপাত করলেও বাস্তবে বিগত বছরগুলোয় এই খাতে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যয় বৃদ্ধি ঘটেনি বলেই বলা চলে। এক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১০। মেজর জেনারেল [অব.] এম. এম. মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা*. পৃ.১১১

অধ্যায়-৩

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ছোট্ট দেশ-বাংলাদেশ। পরম প্রিয় মাতৃভূমি। একটি তুলনামূলক উন্নততর সমরশক্তিকে পরাজিত করেই এদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাক সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জে. নিয়াজী যে মুহূর্তে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন, ঠিক সেক্ষণ থেকেই এদেশ স্বাধীন এবং স্বাধীনতার সেদিন থেকেই নিরাপত্তার প্রসঙ্গটিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে স্বাধীনতার প্রায় তিন যুগ অতিক্রান্ত হলেও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্ছিদ্র করার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে কোন সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। সামরিক বাহিনী-এর অস্তিত্ব, সম্প্রসারণ ও বিপরীতে এর 'অপ্রয়োজনীয়' ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা করা হলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্বরূপ সন্ধানে কেউ এগিয়ে আসেনি। অথচ, একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয়া এদেশে সঙ্গত কারণেই নিরাপত্তা প্রসঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত নীতিমালা থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এবং কেবলমাত্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলেই স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভব, অন্যথা নয়। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্বরূপ ও ব্যাপ্তি নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

জাতীয় নিরাপত্তা, মহারণনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা রক্ষায় কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে যে শুধুমাত্র সমরশক্তি বা সমরসজ্জাকেই বোঝায় তা নয়। বরং স্বাধীনতার সাথে সার্বিকভাবে জাতীয় নিরাপত্তা (National Security) ও মহারণনীতি (Grand Strategy) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে প্রথমেই ভেবে দেখতে হবে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়।

জাতীয় নিরাপত্তা কি (Concept of National Security)

ওয়েব স্টার কলেজিয়েট ডিকশনারীতে উদ্ধৃত 'নিরাপত্তার' অর্থ হলো "Freedom from exposure to danger, protection, safety or insurance of certainty or protecetion of defence." এদিকে বিশিষ্ট বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে জাতীয় নিরাপত্তাকে বলেছেন, "The protection and preservation of the minimum core values of any nation : political independence and territorial integrity."[১] আবার পাকিস্তানী বিশেষজ্ঞ জাভেদ আহমেদ শেখের মতে, "It is

১। Talukder Maniruzzaman, *'The security of small states in the Third world'*, Canberra papers on Strategy and Defence, No. 25 [Canberra, Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University, 1982] p. 15

generally viewed in terms of power, avoiding war or is equated with survival and for some it is the relative freedom from harmful threats."[২] সাধারণত পশ্চিমা বিশ্ব ব্যবস্থা বা শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রের নিকট জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার ধারণা বিদেশী শত্রু রাষ্ট্র হতে সামরিক আক্রমণের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। বেশিরভাগ পর্যায়ে এ ধরনের বহির্মূখী ধারণার জন্য জাতীয় নিরাপত্তার এরূপ সামরিক চরিত্রের একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা হলো, "Seceruty is the immunity of a sate or nation to theats emanating from outside it's boundarie."[৩] অবশ্য ওয়াল্টার লিপম্যান সর্বপ্রথম নিরাপত্তার বহির্মূখী ধারণাসঞ্জাত সংজ্ঞা প্রদান করেন। তাঁর ভাষায়, "A nation is secure to the extent to which, it is not in danger of having to sacrifice core values, if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by such victory in such a war."[৪]

জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে যেহেতু পশ্চিমা উন্নত দেশগুলো ও তার বিপরীতে তুলনামূলক অনুন্নত দেশসমূহ একইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয় না, তাই জাতীয় নিরাপত্তার ধারণা যে শুধুমাত্র বহির্মূখী বা সামরিক চরিত্রের হবে তা নয়। বরং একেক পর্যায়ের দেশের জন্য একেক রকম সমস্যা চিহ্নিত করা যেতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য উত্তর কোরিয়ার সামরিক কার্যক্রম ও সরাসরি আক্রমণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার প্রধানতম প্রকরণ হতে পারে কিন্তু ভারত বা পাকিস্তানের জন্য বৈদেশিক হামলা যেমন ভয়ের ব্যাপার, তেমনি আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদ বা ধর্মীয় হানাহানিও সমান ভীতিকর। আবার বাংলাদেশের জন্য আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও অন্যান্য উপসর্গই মূলত উল্লেখের দাবিদার। পাশ্চাত্য উন্নত বিশ্বে বর্তমানে আভ্যন্তরীণ সমস্যা বলতে গেলে নেই এবং তারা যতই দিন যাচ্ছে ততই আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে নিজেদের আরো সুশৃংখল করে তোলার চেষ্টা করছে। অবশ্য তাদের এ পর্যায়ে যেতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। শিল্প বিপ্লবের পূর্ব থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের যন্ত্র সভ্যতার যুগে প্রবেশ করে তারা ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বোপরি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে একটি জাতীয় একতায় উপনীত হয়েছে। মূলত শিল্প বিপ্লবের সময় পাশ্চাত্য দেশগুলো পৃথিবী জুড়ে উপনিবেশন স্থাপন করে থাকার ফলে একদিকে যেমন যান্ত্রিক সুবিধা তাদের হাতে ছিল, তদ্রূপ অন্যদিকে কাঁচামাল ও বিস্তীর্ণ এলাকার সম্পদ এবং শ্রমিকের সাহায্যও তারা পেতে থাকে। তাই তারা স্বভাবতই সভ্যতার চরম উৎকর্ষতা লাভের সময়টিতে নিজেদের উন্নতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। স্বভাবতই তাদের উপনিবেশগুলোকে পিছনে ফেলে রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ সমস্ত ব্যবস্থার

২। See Javeed Ahmed Sheikh, *'Security Perceptions of Weak Nations : A Case study of* Pakistan' in Syed Forooq Hasnat and Anton Peliska [eds], *'Security for the weak Nations : A Multiple perspective'*, [Izharsons, Lahore, 1986], p. 83

৩। Md. Nuruzzaman, *'National Security of Bangladesh: Challenges and Options'*, BIISS Journal, Vol. 12, No. 3, 1991, p. 369

৪। Walter Lippmann, *'US Foreign Policy : Shield of the Republic'* [Boston, Little Brown, 1943] p.51

অন্যতম ছিল বিভেদ সৃষ্টি ও স্থায়ী দারিদ্র্য নিশ্চিত করা। যদিও স্থায়ী দারিদ্র্য নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি কিন্তু বিভেদ সৃষ্টিসহ অন্যান্য উপসর্গ এসব দেশে ভালভাবেই বিরাজমান আছে। উন্নত দেশসমূহ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে গত শতাব্দীর শুরুতে বা নিদেনপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে, সেরূপ আভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোকে সম্প্রতি। নির্দিষ্ট একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধনের একপর্যায়ে পাশ্চাত্য বা উন্নত বিশ্ব সামরিক উৎকর্ষতা লাভ করেছে এবং তাদের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকিকে শুধুমাত্র বৈদেশিক সামরিক হামলার মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এখন তাদের আর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কোন নজরদারি করতে হয় না বা চিন্তান্বিত হতে হয় না, বরং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের মূল প্রচেষ্টা ও বিপুল সম্পদ সামরিক খাতে নিবদ্ধ হয়। অথচ তৃতীয় বিশ্বে বহুমুখী সমস্যা বিবেচনা করে একমাত্র সামরিক পর্যায়ে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যয় করা সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা অনুন্নত বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা বিবেচনায় তাই বলেছিলেন,

> "Security means development. Security is not military hardware, though it may include it, security is not military force, though it may involve it, security is not traditional military activity, though it may encompass it. Security is development and without development there can be no security."[৫]

অর্থাৎ ম্যাকনামারার মতে, জাতীয় নিরাপত্তায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা থাকতেও পারে আবার নাও পারে কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রবহমানতা অবশ্যই থাকতে হবে। আমাদের দেশে যদিও হুবহু ম্যাকনামারার যুক্তি মানার অবকাশ নেই তবুও নির্দ্বিধায় বলতে হবে যে, সশস্ত্র বাহিনীকে বাদ দিয়ে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেরূপ সম্ভব নয়, তদ্রূপ উন্নয়নকে স্তিমিত করে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও সহজ নয়। দুটোর সংমিশ্রণেই কেবল বাংলাদেশে 'Core national values' রক্ষা করা যেতে পারে। যদিও প্রায় ক্ষেত্রেই এদেশের নিরাপত্তা ধারণাকে সামরিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু সমরবিশারদ মেজর জেনারেল গোলাম কাদের-এর মতে,

> "In the post cold war era there is a renewed emphasis on the interconnections of mility security with various aspects of the national life-political, societal, economic and environmental. The stronger is the society, polity and economy, the lesser is the vulnerability of the country to any security threats."[৬]

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভারতীয় একজন প্রতিরক্ষা গবেষকের মতে, জাতীয়

৫। Robert Mc Namara, '*The Essence of Security*' (New york, Harper and Row, 1968). p. 149

৬। Maj Gen. Ghulam Qader, '*The Challenges of Security and Development : A view from Bangladesh*', BIISS Journal Vol. 15, No. 3, 1994, p. 214

নিরাপত্তা সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণাসমূহকেও চিহ্নিত করা যেতে পারে ঃ

(a) National security is related exclusively to the defence of territorial integrity and national sovereignty.

(b) To consider security threats in terms of a nation being completely occupied and its population being subjugated.

(c) Security risks are evaluated only in terms of actual use of force, but not in terms of threats of use of force or coercion to use the elegant American phrase 'force without war.'[৭]

আবার, একটি দেশের নিরাপত্তার প্রতি সরাসরি সামরিক আগ্রাসন ছাড়াও আরো ক'টি খাত থেকে হুমকি আসতে পারে বলে একই গবেষক উল্লেখ করেছেন। তার মতে এগুলো হলো ঃ

(ক) বিভিন্ন স্বাধীনতাকামী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে বাইরের সমর্থন।

(খ) একটি দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীতে বিদেশী হস্তক্ষেপ। এর মাঝে বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক তার অর্থনৈতিক নীতিমালা চাপিয়ে দেয়া ও অর্থনৈতিক খাতে শোষণ প্রক্রিয়া অন্যতম।

(গ) বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক আঞ্চলিক পানিসীমা ও 'এক্সটেনডেড একোনমিক জোন' লংঘন করা।

(ঘ) খাদ্য, তেল, প্রযুক্তি, যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহে শত্রু দেশ কর্তৃক অস্বীকৃতি জানানো ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এবং

(ঙ) নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে সেদেশের প্রতিবেশী ও তাদের নীতিমালা নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করা।[৮]

উল্লেখিত বিশ্লেষণসমূহ ছাড়াও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হুমকির খাতকে প্রাচীন ভারতীয় বিশ্লেষক কৌটিল্য[৯] তার 'অর্থশাস্ত্র'[১০] বইয়ে চিহ্নিত করেন এভাবে ঃ

(ক) বৈদেশিক হুমকি-বৈদেশিক জটিলতা সমৃদ্ধ।

(খ) আভ্যন্তরীণ হুমকি-আভ্যন্তরীণ জটিলতা সমৃদ্ধ।

(গ) বৈদেশিক হুমকি-আভ্যন্তরীণ জটিলতা সমৃদ্ধ। ও

(ঘ) আভ্যন্তরীণ জটিলতা সমৃদ্ধ আভ্যন্তরীণ হুমকি।

৭। Pradyot Pradhan, *'Indian Security Environment in the 1990s-External Dimesion'*, Strategic Analysis, September 1989, p. 649

৮। প্রাগুক্ত পৃ. ৬৫০

৯। যিনি ইতিহাসে প্রতারক কূটনীতিবিদ চানক্য নামে পরিচিত

১০। এ বইটির রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৩২১ সাল থেকে ৩০০ সালের মধ্যে। এতে জাতীয় নিরাপত্তার ধারণার পাশাপাশি কূটনীতি ও গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকির ক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও এর অস্তিত্বের প্রতি হুমকির স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞগণ প্রধানত দু'টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেন। এর একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পর্যায় হতে নিরাপত্তার প্রতি হুমকি ও অপরটি হলো বৈদেশিক হুমকি।

১। আভ্যন্তরীণ হুমকি (Internal Threats)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা গবেষক কে. সুব্রামনিয়াম মন্তব্য করেছিলেন, "নিরাপত্তা প্রশ্নে বৈদেশিক পর্যায়ে বাংলাদেশের কোন মাথাব্যথা থাকার কথা নয় এবং দেশটির একমাত্র মাথাব্যথা হবে আভ্যন্তরীণ পর্যায়ের নিরাপত্তা নিয়ে।"[১১] এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন, "বাংলাদেশের প্রতি কোন হুমকিকে চিহ্নিত করা হবে ভারতের প্রতি হুমকি হিসেবে- এক্ষেত্রে কোন চুক্তি থাক আর না থাক।"[১২] পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা এখন ভারতের উপর নির্ভরশীল কি-না বা এদেশের প্রতি কোন হুমকিকে সাম্প্রতিক সময়ে ভারত কি দৃষ্টিতে দেখে- সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে এটা হয় তো বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্ব বলয়ের আওতায় বৈদেশিক হুমকি অনেকটা গৌণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরাসরি হস্তক্ষেপ বা যুদ্ধের দিকটি পর্যালোচনায় আনা হয়। কিন্তু পাশাপাশি বিদেশী শক্তির পরোক্ষ হুমকির সম্ভাবনা মোটেই কমেনি বরং তা আভ্যন্তরীণ সমস্যার আড়ালে ভিন্নমুখী সমস্যা হিসেবে আরোপ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী গ্রুপগুলোর সহায়তায় সমান্তরাল কর্মসূচীর আড়ালে বাংলাদেশবিরোধী কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে ভারতীয় নীতি নির্ধারকগণ এক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপ না করে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করায় কাজ করে যাচ্ছেন বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, "Instead of a military threat, the political therat from India loomed large in popular perception. The likely Indian strategy, it was felt, would be nonconventional use of force to destabilise a regime in Dhaka if it allowed anti-Indian sentiments to grow."[১৩] অর্থাৎ বাংলাদেশে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের চাইতে ভারত থেকে রাজনৈতিক পর্যায়ে থাবা বিস্তার করাই হবে সহজ উপায়। এক্ষেত্রে ঢাকায় কোন ভারত বিরোধী সরকার যদি ক্ষমতায় থাকে তবে তাকে অস্থিতিশীল করায় ভারত অপ্রচলিত পথে শক্তি প্রয়োগ করবে বলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এছাড়া অনুন্নত, অসচেতন জনগণের দেশ হিসেবে এখানে আভ্যন্তরীণ সমস্যা

১১। K. Subrahmanyam, *'Security of Bangladesh,'* Economic and Political Weekly [Bombay] Vol. 7, no. 19, May 6, 1972, p. 946

১২। প্রাগুক্ত

১৩। বাংলাদেশী সরকারী কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের সাথে মতবিনিময়কালে ১৯৯০ সালের এপ্রিলে এ ধারণা পেয়েছেন বলে ভারতীয় গবেষক শ্রীকান্ত মহাপাত্র Strastegic Analysis পত্রিকার আগস্ট ১৯৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত *'National Security and Armed Forces in Bnagladesh'* নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, পৃ. ৫৮৪

সৃষ্টি করা সহজ ও তা খুব তাড়াতাড়ি সারাদেশ জুড়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে ফেলতে সক্ষম। বর্তমানে বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতেই মূলত আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং সেসব দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে। আদর্শিক ও গোত্রগত সমস্যা ইউরোপের বলকান অঞ্চল, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোয় কিরূপ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে তা আমরা প্রতিদিনই টেলিভিশনের পর্দায় দেখছি। এখানে ২৬-৬-৯৪ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, "১৯৯৪ সালের জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের বেশ ক'টি রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সংঘাত-সংঘর্ষে আক্রান্ত হবে, দ্বিখন্ডিত হবে বা ধসে পড়তে পারে।" অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত, জাতিগত বা ধর্মীয় সংঘাত ও ক্ষেত্রবিশেষে গৃহযুদ্ধের মত পরিস্থিতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি ততো ভয়াবহ না হলেও ভয়াবহ করার চেষ্টা পুরোদমে সক্রিয় থাকায় বাংলাদেশ জাতিসংঘের উক্ত হুমকির বাইরে অবস্থান করতে পারে না। এক্ষেত্রে ৬/৫/৯৭ সংখ্যা 'সাপ্তাহিক রাষ্ট্র' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ হতে পারে-পাশ্চাত্যে গবেষণার নতুন দৃষ্টিকোণ' শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করা যায়। এতে বলা হয়,

> "পাশ্চাত্যের একজন ফুলব্রাইট স্কলার ও স্ট্র্যাটেজিক গবেষক অভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির বাংলাদেশে বর্তমান সামাজিক বিভক্তিকে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বা গৃহবিবাদের ভয়ঙ্কর আলামত হিসাবে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, অভিন্ন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির দেশ সোমালিয়া ও কম্বোডিয়ায় একইভাবে রাজনৈতিক ও বহির্প্রভাবজনিত বিভক্তি, ওয়্যার লর্ডদের আবির্ভাব এবং ইন্টারনেল ওয়্যার বা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ দেশ দু'টিকে জাতিরাষ্ট্রের ভগ্নস্তূপে পরিণত করেছে। বাংলাদেশে অতিমাত্রায় মেরুকরণের ফলে দুটো স্রোত তৈরী হয়েছে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে।
>
> এ বিভেদ আরও তীব্র আকার ধারণ করলে সশস্ত্র ও দীর্ঘস্থায়ী আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আবির্ভাব ঘটতে পারে বলে এ গবেষক তার গবেষণার প্রারম্ভিক খসড়ায় উল্লেখ করেছেন।
>
> বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, দেশ আজ দু'স্রোতে বিভক্ত। একদিকে শেখ হাসিনার বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ অপরদিকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতাকে গবেষক নিজের পায়ে দাঁড়ানোর বদলে নানা শক্তির উপর নির্ভরশীল হবার ফলে উদ্ভূত বলে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারত বিভাগের আগে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে ছিল। ১৯৪৭ হতে '৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে ছিল। ১৯৭১-'৭২-এ আবার বাংলাদেশ ভারতের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছিল। আবার বাংলাদেশ পরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। পুনরায় ছদ্ম ও প্রকাশ্য-বহির্প্রভাবে চলে যাচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশে প্রো চাইনীজ, প্রো এমেরিকান গ্রুপ সৃষ্টি হচ্ছে। এ সকল গ্রুপের সংঘাতই বাংলাদেশের ভেতরে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। একেকটি গ্রুপ অন্য গ্রুপকে উৎখাতের জন্য ভয়ংকর আয়োজনে লিপ্ত। এখন চাপা গৃহযুদ্ধের অবস্থায় খুন, হত্যা,

আক্রমণ ঘটে চলেছে। চূড়ান্ত মেরুকরণে তা ভয়াল রূপ নেবে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণায় বলা হয়েছে, যে প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সে প্রক্রিয়ায় নাইজেরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ বায়াফ্রা স্বাধীন হতে চেয়েছিল। বায়াফ্রার জন্য কোন ইন্ডিয়া ছিল না বলেই ভূখন্ডটি স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য বাংলাদেশ একটি অনন্য (ইউনিক) ঘটনা।

বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যদিয়ে স্বাধীন চিন্তা ও অবস্থানের ব্যাপক জনমত গড়ে না উঠলে রাজনৈতিক বিভক্তি এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতা এদেশ কাটিয়ে উঠতে পারবে না বলেও গবেষক উল্লেখ করেছেন।

যত ন্যায় না অন্যায় হোক, ভালো বা খারাপ হোক এক দল লোক একবাক্যে বিএনপিকে সমর্থন করছে। আবার এক দল লোক আছে, তারা আওয়ামী লীগকে একই রকম অন্ধভাবে যুক্তির বাইরে সমর্থন ও মদদ দিচ্ছে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এ অন্ধ অনুসরণ ও বিভক্তিই শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বলে গবেষণায় হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। এ জাতীয় বিভক্তির জন্য দায়ী এই দুই পার্টিকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের দল হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে পাশ্চাত্যের গবেষণায়। বলা হয়েছে, এদের ক্ষমতায় বসিয়ে ঐ দু'টি শ্রেণী তাদের সকল বাসনা, পদ, পদবী, অর্থ, বিত্ত, ক্ষমতা, প্রতিপত্তির বাসনা পূরণ করতে চায়। আবার হেরে গেলে এসব দলের সমর্থকরা নতুন করে ট্রয়ের ঘোড়া সাজায়।"

এ পর্যায়ে আমাদের দেশে আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার যে সমস্ত ক্ষেত্র মোটামুটি চিহ্নিত করা যায়, সেগুলো হলো-

(ক) আর্থ-সামাজিক পর্যায়ে হুমকি।

(খ) রাজনৈতিক পর্যায়ে হুমকি।

(গ) সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পর্যায়ের হুমকি।

(ঘ) নাশকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হুমকি।

এখন যে কোন সচেতন ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন, তবে উপরোক্ত সকল পর্যায়ে একই রূপ না হলেও জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার মত যথেষ্ট আলামত খুঁজে পাবেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন একটি অস্থিতিশীল দেশ হিসেবে পরিচিত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের দেশে কখনো স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যেতে পারেনি। যদিও দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয়েছে এবং পাকিস্তান অর্জনেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীদের অবদানই বেশি ছিল, তবুও স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বারবার এদেশবাসীর স্বপ্ন হয়েছে ভঙ্গ। রাজনৈতিক দল ও নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও সামরিক শাসনের যাঁতাকল বারবার আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা রূপে কাজ করেছে। ফলে বাংলাদেশে কখনো কোন স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। সশস্ত্রবাহিনীও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অসহনশীল মনোভাব ও বারবার

রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতায় জাতিগতভাবে আমরা বহুবার জাতীয় পর্যায়ে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছি। মোটামুটিভাবে আমাদের দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে যে সমস্ত সমস্যা বিরাজিত, তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দলীয় আদর্শে ব্যাপক পার্থক্য।
(খ) জাতীয়তা প্রশ্নে স্পষ্ট দু'ভাগে বিভক্তি।
(গ) ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাজনীতিতে ধর্মের অবস্থান নিয়ে বিভক্তি।
(ঘ) জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের অবস্থান নিয়ে দলাদলি ও তীব্র মতিবিরোধ।
(ঙ) পেশী শক্তির ব্যাপক ব্যবহার।
(চ) বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণে কোন কোন দলের স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টা।
(ছ) পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে স্পষ্ট মতবিরোধ।
(জ) বৈদেশিক শক্তির সরাসরি স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা। ও
(ঞ) সহনশীলতার অভাব।

উপরোক্ত সমস্যাগুলো নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণে না যেয়ে শুধুমাত্র জাতীয়তা নিয়ে যদি কোন প্রশ্ন তোলা যায় তবে একমাত্র ঐ কারণেই আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধাটির সন্ধান পাওয়া যাবে। 'বাঙালি' ও 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদীদের মাঝে কোনটি খাঁটি বা যুগোপযোগী সে তর্ক ভিন্ন কিন্তু জাতীয়তার প্রশ্নে এই পার্থক্যই এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে ব্যাপক বিভক্তি, বিভ্রান্তি ও অনৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট। মূলত এই বিভেদগুলোই নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্বরূপ নির্ধারণের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। বৈদেশিক হুমকি (External Threats)

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে পর্যালোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, বিশেষজ্ঞগণ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে বৈদেশিক হুমকিকে গৌণ হুমকি বলে অভিহিত করেছেন। যদিও বৈদেশিক হুমকি বলতে সাধারণভাবে সরাসরি হস্তক্ষেপ বা আগ্রাসন বোঝানো হয়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ হুমকির প্রকরণগুলোর মত বৈদেশিক পর্যায় থেকেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে তা আভ্যন্তরীণ সমস্যার আড়ালে সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করা ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষভাবে জোড় খাটিয়ে প্রয়োগ করা হয়।

বৈদেশিক হুমকি বলতে আমরা বৈরী দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক, বেসামরিক কর্মকান্ডকে বুঝে থাকি। প্রত্যক্ষ সামরিক, বেসামরিক কর্মকান্ডের মাঝে যুদ্ধ ঘোষণা, আগ্রাসন ও সীমান্ত এলাকায় হামলাকে বোঝানো হয়ে থাকে। পরোক্ষ খাতগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকে বুঝতে না পারলেও মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈরী দেশের আগ্রাসী হস্তক্ষেপ বা গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। অনেক সময় আভ্যন্তরীণ সমস্যার সাথে তাল মিলিয়ে

বৈদেশিক পরোক্ষ চাপকে কাজে লাগানোকেও সম্প্রতি চাপ প্রয়োগের সবচেয়ে সফল প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বৈদেশিক হুমকি যে খাত থেকে উৎসারিত হোক না কেন বা যেভাবেই প্রয়োগ করা হোক না কেন এটি মূলত একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বহির্মুখী হুমকির ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলতে গেলে অত্যন্ত সহজ কথায় বলতে হয়, "বৈদেশিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অর্থ হলো জাতিগতভাবে সকল পর্যায়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অনন্ত প্রয়াস চালানো।"

ব্যাপক অর্থে কোন দেশের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় বৈদেশিক খাতে নজরদারীর ক্ষেত্রে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের আলোকে দেশজ সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, স্বার্থ ও তুলনামূলক ক্ষমতা বলয় রক্ষা করা অন্যতম প্রধান শর্ত।

জনগণের মানসিক অবস্থা বা গঠন, নেতৃত্বের গুণাবলী ইত্যাদি বিবেচনা করে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ধারা নির্ধারণ 'নিরাপত্তা চেতনা'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যাবলীকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। একটি দেশ কতটুকু শক্তিশালী বা দুর্বল তা বড় কথা নয়, কিন্তু তার মাঝে স্বভাবতই অনিরাপত্তাবোধ জেগে উঠবে যদি কোন বৈদেশিক শক্তি তার বিরুদ্ধে বা তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে কোনরূপ আগ্রাসী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বা সেক্ষেত্রে তার চরিত্রে আগ্রাসনের আগ্রহ প্রকাশ পায়।

মহারণনীতি (Grand strategy)

প্রতিটি স্বাধীন দেশের একটি নির্দিষ্ট জাতীয় লক্ষ্য থাকে এবং সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষানীতি, মহারণনীতি (Grand strategy) এসব কিছুর সীমারেখা নির্ণিত হয়। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে প্রতিটি দেশ অবিরাম গতিতে তার লক্ষ্য হাসিলের দিকে ধাবিত হয়। জাতীয় ক্ষমতার শ্রীবৃদ্ধি করা ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল মূলত মহারণনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিবিদরা সকল পর্যায়ের জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যার অনুসরণে জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারিত হয় এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য Grand Strategy ঠিক করা হয়। তাই Grand Strategy হচ্ছে, "The art and science of developing and using the political, economic and psychological powers of a nation together with its armed forces, during peace and war to secure national objective". অর্থাৎ, মহারণনীতি হলো, "শান্তিতে ও যুদ্ধে জাতীয় লক্ষ্য অর্জন বা সমুন্নত রাখার জন্য একটি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতাকে এর সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মিলিতভাবে ব্যবহার ও উন্নয়নের কৌশল।"

এ্যাডমিরাল মরিসনও অনুরূপ বলেছেন, "Grand strategy is the art and science of employing all of a nation's resources to accomplish objectives defined by national policy." অর্থাৎ, এসব হতে আমরা নিশ্চিত করে ধারণা পাচ্ছি যে, শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীই সার্বিকভাবে একটি দেশের মহারণনীতি বাস্তবায়নের জন্য এককভাবে প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু অবশ্যই অন্যান্য পর্যায়ে ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি একটি সংযুক্ত প্রয়াসের অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে।

একটি দেশ বহির্বিশ্বের কাছ থেকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোঃ আবদুল হালিম নিম্নলিখিত খাতসমূহকে চিহ্নিত করেছেন-

(ক) আত্মরক্ষা।

(খ) অর্থনৈতিক অগ্রগতি।

(গ) অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় নিজের জাতীয় শক্তিকে রক্ষা ও প্রয়োজনবোধে বৃদ্ধি করা।

(ঘ) নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা। ও

(ঙ) জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

আবার 'আত্মরক্ষা'র (Self preservation) ব্যাপারে বলতে গিয়ে অধ্যাপক আবদুল হালিম বলেছেন,

> "অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের বেলায়ও একথা সত্যি যে, আত্মরক্ষা হলো আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ। কোন রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা বলতে সাধারণত বোঝায় তার সার্বভৌমত্ব (Sovereignty), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political independence), ভৌগোলিক অখন্ডতা (Territorial integrity) বজায় রাখা। এর সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত জাতীয় নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখার বিষয়টি। বস্তুতপক্ষে জাতীয় নিরাপত্তার ধারণাটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখন্ডতার সম্মিলিত প্রতিফলন মাত্র।.....এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পরও বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি বহুবার বিভিন্ন দিক থেকে হুমকি এসেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখা বাস্তবিকই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। একথা সত্যি যে, আত্মরক্ষার প্রশ্নটি বাংলাদেশের জন্য অপর যে কোন ব্যাপারের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।"[১৪]

সম্প্রতি বিশ্ব রাজনীতির মোড় পরিবর্তন, উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া একটির পর একটি ঘটনায় জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রশ্নবোধক চিহ্নের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করায় আমরা বেশ কিছু

১৪। মোঃ আবদুল হালিম, *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি*, পৃ, ১৫২

সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। অবশ্য একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে, এ সকল সমস্যার ৯০% ভাগই সীমান্তের বাইরে থেকে আরোপিত, লালিত-পালিত এবং চর্চিত। এ সব সমস্যার ওপর আলোকপাত করে সেগুলোর সমাধান করার মাধ্যমেই জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

এদিকে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বর্তমান বিশ্বে যেখানে আর্থ-রাজনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রসমূহ প্রতিনিয়ত খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, সেখানে একটি ক্ষুদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ঐরূপ দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে কোন ক্ষেত্রে খুব বেশী মাত্রায় কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। এমনকি পৃথিবীর উন্নততম দেশগুলো-যাদের সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালা আছে, শত্রু-মিত্র নির্ধারিত ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোন কোন অবস্থান হতে হুমকি আসতে পারে তাও নির্ধারিত আছে- তারাও বর্তমান বিশ্বে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিনিয়ত হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের দেশ-যা দীর্ঘদিনের বৃটিশ শাসনের উত্তরাধিকার, সেখানে শাসক হিসেবে যারা এ পর্যন্ত বহাল ছিলেন বা আছেন তারা বৃটিশ ধ্যান-ধারণার বাইরে এখনও কিছু ভাবতে পারেন না বলেই অনুমিত হয়। ঢাকার অভিজাত আমলা ও প্রশাসনিক শ্রেণী কার্যক্ষেত্রে এখনও অনেকে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বলতে কেবলমাত্র সামরিক খাতকেই বুঝে থাকেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, এ সব ব্যক্তি কখনো কোন স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেননি এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার অন্যান্য খাতকেও উপেক্ষা করে এসেছেন। শুধুমাত্র সামরিক খাতের কথাই যদি আসে, তবে আমরা কি দেখতে পাই? প্রথমত, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আকার-আয়তন ও অস্ত্রশস্ত্রে অনুল্লেখ্য; দ্বিতীয়ত, যাকে শত্রু বলে আভাসে-ইঙ্গিতে বোঝানো হচ্ছে, তাকে বেশিদিন প্রতিহত করার মত কোন সামর্থ্য আমাদের নেই; তৃতীয়ত, আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে আকারে কতটুকু বাড়াব বা কি কি সমরাস্ত্র কি পরিমাণে কোথা হতে সংগ্রহ করব সে সম্পর্কে জনগণের সামনে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই; চতুর্থত, বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও বৈষয়িক কাঠামোয় সশস্ত্র বাহিনীকে কতটুকু উন্নত করা সম্ভব ও পঞ্চমত, অতিসম্প্রতি বাংলাদেশে সকল পর্যায়ে যে অস্থিতিশীলতা ও অনৈক্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তাতে সশস্ত্র বাহিনী কি একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে পারবে-এ বিষয়গুলো নিয়ে কোন সুস্পষ্ট নীতিমালাও কখনো নির্ধারণ করা হয়নি।

জাতীয় ক্ষমতা বা শক্তি (National Power)

শক্তিশালী বা কার্যকরী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক নিঃসন্দেহে তা হলো জাতীয় ক্ষমতা বা শক্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। পরিবেশ, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আমাদের মতো সমস্যাসংকুল দেশে রাজনৈতিক বা আদর্শগত পর্যায়ে রণনীতি বা জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ অপরিহার্য।

জাতীয় ক্ষমতা-আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল, পরিবেশ, পরিস্থিতির মধ্যে যে কোন রাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পৃথিবীতে সকল রাষ্ট্রই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যাপারে যথাসাধ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করে থাকে। অবশ্য, প্রতিটি রাষ্ট্রেই ক্ষমতা সংরক্ষণ ও প্রতিফলনের পরিমাপ এবং প্রকৃতি ভিন্ন। নরম্যান ডি, পামারের মতে, জাতীয় ক্ষমতা বা শক্তি হলো 'A vital and inseperable feature of the state system.'[১৫] এবং অধ্যাপক মরগেনথু'র মতে, শক্তি সঞ্চয়ের প্রতিযোগিতা হচ্ছে, 'Universal in time and space and is an undeniable fact of expericnce.' জাতীয় শক্তি অর্জনের মূল লক্ষ্য বিভিন্ন পর্যায়ে একটি রাষ্ট্রকে 'আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিশেষ একটি অবস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, যার মাধ্যমে সে অপর রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং নিজের ওপর অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারকে প্রতিহত করতে পারে'।[১৬] এছাড়াও বিভিন্ন মনীষী আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, যার মাধ্যমে জাতীয় শক্তি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যে শক্তির প্রয়োজন এবং এই ক্ষমতা ব্যতীত ছোট-বড় ধনী-গরীব কোন রাষ্ট্রই তার (যে কোন একটি ক্ষমতার উপাদানের মাধ্যমে) অনুসৃত নীতিকে বাস্তবায়িত করতে পারে না।

জাতীয় ক্ষমতা প্রকাশের উপায়
(Forms of National Power)

জাতীয় ক্ষমতা প্রতিফলনের উপায় বিভিন্নরূপ। অধ্যাপক ই, এইচ, কারের মতে, মূলত তিনটি মাধ্যমে বা উপায়ে জাতীয় ক্ষমতা প্রকাশিত হয়-

১। **সামরিক শক্তির মাধ্যমে** (Through Military Power)

২। **অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে** (Through Economic Power)

৩। **মতামত প্রকাশের আধিপত্যের মাধ্যমে** (Power Over Opinion)

জাতীয় ক্ষমতার উপাদান হিসেবে নিম্নলিখিত উপাদানগুলোকেও চিহ্নিত করা যায়-

১। **ভৌগোলিক উপাদানসমূহ** (The Geographic Elements) : কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ, প্রযুক্তিগত ও শিল্প/কলকারখানার উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

২। **ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপাদান** (Historical Psychological and Sociological Elements) : রাষ্ট্রের ইতিহাস, সামাজিক ভিত্তি/বন্ধন, জনগণের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান অর্থাৎ আদর্শিক ও মনোবল সংক্রান্ত উপাদান।

১৫। Norman D. Palmer and Perkins, *'Interantional Relations : The world Community in Transition'*.

১৬। Prof. Charles O. Lerche, Jr. *'Principles of International Politics'* p.61

৩। **সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক উপাদান** (The Organizational and Administrative Elements) : সরকারি ও বেসরকারী পর্যায়ে জাতিগত সাংগঠনিক মান, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং জাতিগত নেতৃত্ব।

৪। **জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাদান** (Element related to People) : জনসংখ্যা, বয়স ও লিঙ্গভেদে অবস্থান, জনগণের মানসিক অবস্থা, জনগণের মাঝে সামরিক বিশেষত্ব বা প্রবণতা।

৫। সামরিক উপাদান (The Military Element): সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যাগত অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণে উৎকর্ষতাগত উপাদান।

এখানে জাতীয় ক্ষমতা সম্পর্কে যে সমস্ত মাধ্যম বা উপাদানের কথা বলা হলো সেগুলো আসলে একটি আরেকটির সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, জাতীয় পর্যায়ে সফলতার জন্য প্রত্যেকটির উৎকর্ষতা প্রয়োজন। কিন্তু স্বভাবতই একটি দেশ সকল পর্যায়ে সব সময় সকল প্রকরণের একত্র সমাবেশ ঘটাতে পারে না এবং তা সম্ভবও নয়। কিন্তু একটি উপাদানের দুর্বলতায় যদি অন্য আরেকটি উপাদানের উন্নতি সাধন করা যায়, তবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেমন- ইসরাইলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঐ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, শত্রু অপেক্ষা জনসংখ্যার পরিমাণ, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের দুর্বলতা সত্ত্বেও (কারণ সারা পৃথিবী হতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, জড়ো হওয়া ইহুদীরা কেবলমাত্র ধর্মের ওপর ভিত্তি করে আগ্রাসী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে যা দুর্বল অপরাধপ্রবণ মানসিকতার জন্ম দিতে বাধ্য) জনগণের সামরিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্টতা সঞ্জাত সামরিক উপাদানের উৎকর্ষতা, বৃহৎশক্তির সহায়তায় অর্জিত স্থিতিশীল অর্থনীতি ও সর্বোপরি নিজস্ব মতামত বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার সফলতা তাদের আরবদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। অপরদিকে আরববিশ্ব সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার পরও জনগণের সামরিক ক্ষেত্রে অনুপযোগী মন-মানসিকতার জন্য বার বার ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ কে এবং কেন?

আমরা যদি আমাদের মাতৃভূমির উপর বৈদেশিক কোন শক্তির প্রভুত্ব বিস্তারকারী মনোবৃত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করি এবং সাধারণভাবে সামরিক বা ভূ-রাজনৈতিক উপাত্তগুলোকে বিবেচনায় আনি তবে খুব সহজেই বলা যায়, একটি দেশের প্রতি বৈদেশিক হুমকির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস হলো তার সবচেয়ে নিকটবর্তী বা ভৌগোলিকভাবে প্রভাব বিস্তারকারী স্বীকৃত প্রতিবেশী। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বিশ্লেষক লে. জেনারেল এ. আই. আকরাম (অব.) মনে করেন, একটি দেশের জন্য "Potential enemy is the neighbour, always the neighbour, only the neighbour."[১৭]

১৭। Lt. Gen. A.I. Akram, *'Security of small states'*-Security of small states in the south Asian context প্রবন্ধে উল্লেখিত

অর্থাৎ "সম্ভাব্য শত্রু হচ্ছে প্রতিবেশী, সব সময় প্রতিবেশী এবং অবশ্যই প্রতিবেশী।" উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে প্রথম ও সুনিশ্চিত শত্রু হিসেবে ভারতের নাম উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের সাবেক সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মতেও "ভারত হচ্ছে আমাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ ও হুমকির সম্ভাব্য উৎস।"[১৮] এবং জে. এরশাদ মনে করেন, ভারতের সাথে "এই সমস্যা যৌথভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও প্রত্যক্ষ প্রকৃতির হতে পারে।"[১৯] তবে শুধু যে ভারতই ভৌগোলিক কারণে আমাদের একমাত্র মাথাব্যথার কারণ নয়, তা বার্মা বা মায়ানমার আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে ১৯৯১ ও ২০০০ সালে। বরং বার্মার সাথে অনেকটা সমতাভিত্তিক ক্ষমতাবলয় বিরাজ করায় সরাসরি হুমকির মাত্রাও অনেক সময় বেড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এছাড়াও ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? আঞ্চলিক রাজনীতি, মতাদর্শ যদি পরিবর্তিত হয়, তাহলে 'স্টোন থ্রোইং ডিসটেন্সের' মহাচীনের অবস্থানকেও আমরা হেলাফেলা করতে পারি না। আজকের যুগ ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির যুগ হওয়ায় মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট এলাকার মাঝে অবস্থানকারী যে কোন দেশ যে কোন সময় শুধুমাত্র মতাদর্শগত কারণে অপরের শত্রুতে পরিণত হতে পারে। ভবিষ্যত পৃথিবীর সংঘাতের ক্ষেত্র যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় আদর্শগত দ্বন্দ্ব তা এখন ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। তাই তো সুদূর ইসরাইলও পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রযুক্তি উন্নয়নে শংকিত বোধ করে, বাংলাদেশের জন্য 'ইসি'র মাথাব্যথা সৃষ্টি হয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সকলেই এত ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী যে, তারা যে কোন সময় যে কোন অজুহাতে পৃথিবীর যে কোন দেশে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে কোন দেশ তাদের (পাশ্চাত্য) আদর্শবহির্ভূত কোন কাজ করলে বা যে কোন দিকে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করলে মার্কিন বলয়ভুক্ত সকলে হয় তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, না হয় একঘরে করে ফেলে অথবা শেষ ব্যবস্থা হিসেবে সামরিক হস্তক্ষেপের পথ খোলা রাখে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও তাদের মনোভাব যে কোন সময় পরিবর্তিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

দিন যত যাচ্ছে বৈদেশিক পর্যায়ে নিরাপত্তা হুমকির সম্ভাবনাও তত বাড়ছে। পূর্বে যখন প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক মানদন্ডের বিচারে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পিছিয়ে ছিল ও বিশ্ব মোটামুটি একটি দ্বিমুখী সাম্যাবস্থায় ছিল তখন সকল দেশের নিরাপত্তার প্রতি বৈদেশিক হুমকি আসার পর্যায় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা ভিন্ন। পাশ্চাত্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে পুলিশী ভূমিকা বজায় রাখতে গিয়ে হয় তো এক সময় আর্থিক সমস্যাতে পড়তে পারে। অথচ অন্যদিকে পূর্বের অনুন্নত অনেক দেশ ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চললেও তাদের মাঝে 'ন্যাটো'র মত কোন কার্যকরী জোটবদ্ধতা না থাকায় সেসব দেশের শক্তিসঞ্চয় বিক্ষিপ্ত

১৮। Mushahid Hussain, '*Bangladesh Journey : A conversation with President Ershad*', Nation [Lahore], January 14, 1990

১৯। Bangladesh Observer, [Dhaka], September 16, 1985

শক্তির জন্ম দিচ্ছে; যা হঠাৎ যে কোন অঞ্চলে প্রতিযোগিতার নেশায় যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সম্প্রতি বিশ্বে বৈদেশিক হুমকির বিস্তৃতি ঘটেছে এবং সুনির্দিষ্ট শত্রু নির্ধারণ করা এখন বেশ কঠিন। পাকিস্তান ও ভারতের কথা উল্লেখ করলে প্রথাগত বিশ্লেষণে যে কেউ দু'দেশকে দু'দেশের একমাত্র বড় শত্রু বলে উল্লেখ করবেন। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে যে, পারমাণবিক বোমা তৈরি, চীন থেকে এম-১১ মিসাইল ক্রয় ও অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল পাশ্চাত্য দেশ ও ইসরাইলের বড় মাথাব্যথায় পরিণত হয়েছে। পূর্বে পাকিস্তান যেখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে একটি নির্দিষ্ট অবকাঠামোয় দাঁড় করতে পারতো, সেখানে এখন তাকে বিশ্ব পরিমন্ডলের ধারণায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পন্থা উদ্ভাবন করতে হচ্ছে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে বৈদেশিক হুমকির ক্ষেত্র বর্তমানে কমেনি রবং ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য কি পাকিস্তানের উদাহরণ প্রযোজ্য? এ প্রশ্নের উত্তর শতকরা ১০০ ভাগ পাকিস্তানের পরিস্থিতির আলোকে নির্ণিত না হলেও বেশকিছু পর্যায়ে আমাদের দেশের নিরাপত্তা রক্ষার সমস্যা ধীরে ধীরে অনেকটা পাকিস্তানের অভিজ্ঞতার পর্যায়ে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবেশীর কথা প্রাথমিকভাবে বিচার্য বিষয় বলে ধরে নিলেও বর্তমান যুগে আমরা বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্তা পাশ্চাত্য শক্তিকে অবহেলা করতে পারি না। পার্শ্ববর্তী আগ্রাসী শক্তির মনোবৃত্তি সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমাদের বিশেষজ্ঞরা যথেষ্ট আলোকপাত করায় আমরা সে উৎস হতে সৃষ্ট হুমকি সম্পর্কে মোটামুটি সজাগ হয়ে উঠেছি। কিন্তু পাশ্চাত্যের ছলনা সম্পর্কে অনেকটা অন্ধকারে থেকে গেছি। তাই প্রতিবেশীর চোখ রাঙ্গানোর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে আমরা তৎপর হলেও ক্রমদৃশ্যমান মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যের আরো কয়েকগুণ ভয়ঙ্কর হুমকি মোকাবেলায় মোটেই তৎপর নই। এছাড়া প্রতিবেশীর সাথে আমাদের বৈরিতার কারণ রাজনৈতিক, কিন্তু পাশ্চাত্যের সাথে আমাদের ভবিষ্যত দ্বন্দ্ব হবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আদর্শগত পর্যায়ে। রাজনৈতিক আবেগ ও সংঘর্ষ হতে সামাজিক-ধর্মীয় আবেগ ও সংঘর্ষ অনেক বেশি মাত্রায় ধ্বংসাত্মক। প্রখ্যাত প্রফেসর স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনও 'সভ্যতার সংঘাত' বলে যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন তাতে পাশ্চাত্য আদর্শের সাথে মুসলিমপ্রধান দেশগুলোকে যেমন বাইরে লড়তে হতে পারে তেমনি দেশের অভ্যন্তরে দু'টি শ্রেণীর মধ্যেও সংঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এদিকে ভবিষ্যতের পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, বর্তমানে এ অঞ্চলের বিরাজমান সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা চিন্তা করলে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণগত পর্যায়ে প্রতিবেশীদের কথা বেশি করে ভাবতে হয়। প্রচলিত যুদ্ধের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পার্শ্ববর্তী দেশগুলোই আমাদের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসন চালাবার সহজ পদ্ধতি অনুসরণে সক্ষম। এদিকে একটি অঞ্চলে সব সময় একটি বা দু'টি প্রভাব বিস্তারকারী শক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যা আমাদের এ অঞ্চলে অত্যন্ত

স্পষ্টরূপে প্রযোজ্য। এছাড়া এ অঞ্চলের প্রায় সকল দেশ পূর্বে একক শাসনের আওতায় ছিল। এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মাঝে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে একতা বা সাযুজ্য গড়ে উঠেছে তা রাজনৈতিক সীমানা বিভক্তির পরও প্রবল আবেগসঞ্চারী অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে যে কোন আঞ্চলিক শক্তি আমাদের ওপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তারের সহজ চেষ্টা চালিয়ে যেতে সক্ষম। অন্যদিকে নৃতাত্ত্বিক পরিচিতিতেও আমরা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কোন না কোন অঞ্চলের জনগণের সাথে একাত্মতা বোধ করে থাকি। এভাবে নৃতত্ত্বগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত মিল যে কোন ক্ষেত্রে বড় ও প্রভুত্ব বিস্তারে আগ্রহী দেশের কাছে ক্ষুদ্র দেশে সকল পর্যায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আগ্রাসন চালাবার জন্য অত্যন্ত উপযোগী অবস্থা বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় রণনীতি ঃ বাংলাদেশের প্রতি ভারতের মনোভাব

আমরা দক্ষিণ এশিয়ার অধিবাসী। আমাদের এ অঞ্চল এমন একটি অঞ্চল, যা বর্তমান বিশ্বের রণনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি উৎকৃষ্ট চারণভূমি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এখানে বর্তমানে 'স্থানীয়', 'আঞ্চলিক' ও 'বিশ্বমানের' শক্তির অবস্থান লক্ষ্য করা যায় এবং এগুলো পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি। বাংলাদেশের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যা-ই বলা হোক না কেন, এর অবস্থানই এর প্রতি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর উৎসাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় অবধারিতভাবেই 'কেন্দ্রস্থ' বা 'Pivotal' রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের নাম উল্লেখ করতে হয়। এটি কোন অবাস্তব কল্পনা নয় বরং অর্থনীতি, জনসংখ্যা, আয়তন ও সামরিক শক্তির অতিসাধারণ যোগ-বিয়োগের হিসেব। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ভারতকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ এশিয়ার আবর্তন ঘটে থাকে।

জাতিগতভাবে ভারতীয়দের শৌর্য-বীর্য প্রকাশের মানদন্ড যা-ই হোক না কেন, জাতীয় ক্ষমতা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভারত নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে রয়ে গেছে। মূলত তাদের একটি নির্দিষ্ট শক্তিমান জাতি হিসেবে উত্থান ঘটে ১৯৪৭ সালে। বৃটিশ শাসক শ্রেণী এ উপমহাদেশে আসার পূর্বে ভারতীয় জাতিসত্তার বর্তমান অবয়ব বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। অবশ্য এর পূর্বে মোগল রাজশক্তি ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে মোটামুটি একটি একতার বন্ধন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তখনও বর্তমান ভারতের পৌরাণিক সংস্কৃতিভিত্তিক অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। বৃটিশ শাসনামলে ভারতীয়রা তাদের হারানো ঐতিহ্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে এবং 'ভারতমাতা'র চেতনায় 'মহাভারতের' স্বপ্নে সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

১৯৪৭ সালে বৃটিশরা এ উপমহাদেশ ত্যাগ করে। বৃটিশদের সাথে পূর্ব থেকেই ভারতীয় কংগ্রেসের সখ্যতা ছিল। ব্যক্তিগত পর্যায়ে জওহরলাল নেহেরু ও লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের

মধুর সম্পর্ক সে সময় এলাকার রণকৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বৃটিশরা তখন ক্ষয়িষ্ণু শক্তি হিসেবে নিজেদের বিশ্বব্যাপী সামরিক প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে ছিল অক্ষম। কিন্তু তখন তারা পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিলে একটি নতুন ক্ষমতা বলয় সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ঠিক ঐ সময়টিতে চলছিল পৃথিবীতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটার প্রাথমিক প্রস্তুতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সমগ্র পাশ্চাত্য জগত বিশেষ করে ইংল্যান্ড মুসলিমবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন ইসরাইল সৃষ্টি করা হয়েছিল, তেমনি দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বজায় রাখার জন্য ভারতকে একচেটিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা হয়। ভবিষ্যত মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবি-দাওয়ার দিকে নজর না দিয়ে ভারতের অনেক অন্যায় আবদার মেনে নেয়া হয়। এমনকি স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর হায়দরাবাদ, গোয়া, দমন, দিউ ও কাশ্মীরে ভারতীয় আগ্রাসনের পক্ষে বৃটিশরা পরোক্ষ সমর্থন জুগিয়েছিল।

বৃটেনের সাথে ভারতের সখ্যতা ও পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক ও আদর্শগত গুরুত্ব ১৯৪৭ সালের পূর্বে বৃটেনের ক্ষেত্রে রণনীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। পরবর্তীতে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পাশ্চাত্যের সহায়তায় ও উস্কানিতে পূর্বে প্রণীত রণনীতির মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রাখে।

বৃটিশ ভারতে বৃটেন ভারতকে মূল কেন্দ্র (Base) ধরে সমগ্র এশিয়ায় ও ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তারের জন্য যে রণনীতি নির্ধারণ করেছিল তাকে 'বৃটিশ নিরাপত্তা নীতি বা ডকট্রিন' (British Security Doctrine) বলা হতো। সে সময়কার রণরাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে বৃটিশ নিরাপত্তা নীতি প্রণীত হয়েছিল তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ঃ

১। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষা করা। কারণ এ পথ দিয়েই সকল আক্রমণকারী ভারতে প্রবেশ করেছে ও ভারতীয় শাসকদের পরাভূত করার সুযোগ পেয়েছে।

২। ভারতীয় উপমহাদেশের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহকে যে কোন বৈরী শক্তির আওতাধীন হওয়া বা প্রভাব বলয়ে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং

৩। ভারত মহাসাগর অঞ্চল ও এর আশপাশে কর্তৃত্ব বজায় রাখা। কিছু নির্দিষ্ট বা সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বৃটিশ শাসক শ্রেণী উপরোক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল।

এগুলোর মাঝে বৈদেশিক হুমকি আসার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার ক্ষেত্র ছিল ঃ

(ক) জার শাসিত রাশিয়া ও ফ্রান্স, যা পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ বলে চিহ্নিত করা হয়। মধ্য এশিয়া হয়ে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে যাতে কোন 'সমাজতান্ত্রিক' আক্রমণ বৃটিশ-ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে সে জন্য বৃটিশ রণকৌশলবিদগণ 'প্রলম্বিত সীমান্ত' বা 'Extended Frontier' পদ্ধতি প্রয়োগের ধারণা দেন।

এই রণকৌশলের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে- "ভারতের নিরাপত্তার প্রতি যে কোন হুমকি ভারতের সীমানা থেকে যতদূরে সম্ভব মোকাবিলা করতে হবে, যাতে তা কখনো কোনভাবে ন্যূনতম পর্যায়েও ভারতের সীমান্তে আঘাত হানতে না পারে।" এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করে বৃটিশ সরকার তার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা লাইন ইরান-আফগানিস্তানব্যাপী নির্ধারণ করে।

অন্যদিকে হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য, যেমন-নেপাল, ভূটান ও সিকিমের সাথেও বৃটিশ সরকার একটির পর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ঐ সমস্ত চুক্তি ছিল নির্জলা সামরিক উদ্দেশ্যে প্রণীত। এসব চুক্তি অনুযায়ী ঐ সমস্ত রাজ্যের সকল প্রকার নিরাপত্তা রক্ষা সরাসরি বা পুরোপুরি বৃটিশদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনকারী দেশগুলোতে বৃটিশ সরকার যখন-তখন সেনা মোতায়েনের ক্ষমতা লাভ করে ও বিপরীতে ঐ সমস্ত দেশের স্বাধীনভাবে কোন সামরিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা লোপ করা হয়। অন্য কথায় "বৃটিশ-ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চুক্তি সম্পাদনকারী দেশগুলোর নিরাপত্তা রক্ষা করা প্রয়োজন; কিন্তু শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য বৃটেনের কোন দায়বদ্ধতা নেই।"

(খ) ভারত মহাসাগর অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করার জন্যও সে পথে আসা কোন হুমকি প্রতিরোধের জন্য বৃটিশ সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে ভারত মহাসাগর এলাকায় মালয়, জাভা ও পেনাং দখল করা হয়। অন্যদিকে সিঙ্গাপুরকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে বার্মা ও শ্রীলংকাকেও এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যার ধারাবাহিকতায় মরিশাস ও 'কেপ অব গুড হোপ'-কেও বৃটিশ শাসনে টেনে আনা হয়। এভাবে সমগ্র ভারত মহাসাগর এলাকা একটি পরিপূর্ণ নিরাপদ এলাকা হিসেবে গড়ে উঠে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মাকে ঢাল হিসেবে বৃটেন ব্যবহার করেছিল এই 'এক্সটেনডেড ফ্রন্টিয়ার পলিসির' কারণেই।

পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতের রণনীতি উপরোক্ত বৃটিশ রণকৌশলের প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রণীত হয়। ফলে ভারতের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশসমূহের প্রতিও ভারত বৃটিশের অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে। বৃটিশ নিরাপত্তা নীতিকে মূল প্রতিপাদ্য ধরে ভারতও 'Extended Frontier' পদ্ধতিতে তার সার্বিক নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করে। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সেও বৃটেনের মত তার চারাপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা ও নিরাপত্তার প্রতি যে কোন হুমকিকে তার সীমানার বাইরে অন্যান্য প্রতিবেশীর নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট করার প্রচেষ্টাতেই নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করে আসছে। প্রতিটি প্রতিবেশীর সাথে সহযোগিতার নামে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও সে সব দেশে বন্ধুভাবাপন্ন অর্থাৎ ভারতীয় মতাদর্শের সমান্তরাল আদর্শ অনুসরণকারী সরকার প্রতিষ্ঠায় ভারতের অবিরাম প্রচেষ্টা থেকে এ বিশ্লেষণের স্বপক্ষেই প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ভারতের নীতি ও অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশের একজন বিশ্লেষক উল্লেখ করেন ঃ

"The image of India in the region is that of a power which demands habitual obedience from its neighbors. According to the stratgic doctrine of India drawn from that of British India, the country's defense perimeter is given not by the boundaries of India but by the outer boundaries of its regional neighbours. The main theme of the doctrine is that South Asia is to be regarded as an Indian backyard. The critical factor is a combination of the comprehensive power potential of the country with a great power psyche nourished by the Indian political elites and strategic experts. The reference point for India in relation to its international posture is clearly the type of role assumed by great powers. India under such perception is to be viewed as a dominant country in the region just as the US, Russia and China in this respective areas."[২০]

শুধু তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেই নয়, বাস্তবেও যে ভারত বাংলাদেশের প্রতি 'বড় ভাই' সুলভ আচরণ করে থাকে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য অনেক বিশ্লেষকই বলে থাকেন, ভারত কখনোই সরাসরি বাংলাদেশ আক্রমণ করবে না বা আগ্রাসন চালাবার ইচ্ছেও ভারতের নেই। এ ব্যাপারে একজন ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষক বলেন যে, "অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল ও ধর্মীয় পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শের হওয়ায় বাংলাদেশে ভারত সামরিক আগ্রাসন পরিচালনায় উৎসাহ বোধ করবে না।"[২১] অপর একজন ভারতীয় বিশ্লেষকও বাংলাদেশকে ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যতো না সামরিক হুমকি বলে চিহ্নিত করেছেন তার চেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন ভিন্ন প্রসঙ্গে। ভারতীয় বিশ্লেষক প্রদ্যোৎ প্রধানের মতে,

"বাংলাদেশ অপরাপর দক্ষিণ এশীয় দেশের চেয়ে ভারতের জন্য ভিন্নরূপ মাথাব্যথার জন্ম দিয়েছে। কারণ, বাংলাদেশ ভারতের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটানোয় সহায়তা করতে পারে। যেহেতু বেশীর ভাগ বাংলাদেশী বাঙ্গালি মুসলিম যারা ভারতের হিন্দু বাঙ্গালিদের মতো একই ভাষায় কথা বলে ও অনেক ক্ষেত্রে এদের মাঝে রয়েছে একইরূপ সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক সমরূপতা, তাই ভারতের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন ছড়িয়ে দেয়া বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব।"[২২]

কিন্তু তাই বলে যে ভারতীয় নীতি-নির্ধারকগণ সব সময় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 'অহিংস' বা পরোক্ষ চাপ প্রয়োগের পথই বেছে নিয়েছেন তা নয়। বরং বেশ ক'বার ভারত বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ সামরিক আগ্রাসন চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলেও জানা যায়।

২০। *See Iftekharuzzaman, 'The India Doctrine : Relevance for Bangladesh'* in M. G. Kabir and Shaukat Hassan [eds], *'Issues and Challanges facing Bangladesh Foreign Policy'*, Bangladesh Society of International Studies, Dhaka, 1989

২১। পূর্বে উল্লেখিত ১৩ ক্রমিক দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৮৪

২২। পূর্বে উল্লেখিত ক্রমিক ৭ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৬৫৬

এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা গবেষক রবি রিখির একটি মন্তব্য। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পর ভারত যে বাংলাদেশে সৈন্য প্রেরণে প্রস্তুতি নিয়েছিল সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"শেখ মুজিবুর রহমান যখন নিহত হন, তখন ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে ঠিক করেছিলেন তিনি হস্তক্ষেপ করবেন। সেনাবাহিনীর তিনটি ডিভিশনকে সতর্কও করে দেয়া হলো।"[২৩]

এ পর্যায়ে ভারত সরকার, পরবর্তীতে কেন আর বাংলাদেশ আক্রমণ করলো না ও আগ্রাসন চালিয়ে আসলে কি করা উচিত ছিল তাও ভয়াবহভাবে উঠে এসেছে রবি রিখির কথায়। একই নিবন্ধে তিনি বলেছেন,

"কিন্তু শেষে সরকার গড়িমসি করলেন এবং সুযোগ পেরিয়ে গেল। ফলে, হল কী? না, বাংলাদেশকে আমাদের শিবিরে রাখার সুযোগ আমরা হাতছাড়া করলাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে যুক্তিতে পোল্যান্ড ও আফগানিস্তানে এবং আমেরিকা নিকারাগুয়া ও গ্রেনাডায় সেনা নামিয়েছিল, সেই যুক্তিতে ভারতও তখন বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করলে তা অসঙ্গত হত না।"[২৪]

এ ধরনের আগ্রাসী মনোভাব শুধু এক-দু'জন ভারতীয় বিশ্লেষকের অভিলাষ নয় বরং ভারতীয় নীতি-নির্ধারকদের মাঝেও এ জাতীয় সামরিক এ্যাডভেঞ্চার চালানোর উদগ্র বাসনা রয়ে গেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর নভেম্বর '৭৫ থেকে জুলাই '৭৬ পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সীমানায় সীমিত সীমান্ত সংঘর্ষ ছাড়াও প্রত্যক্ষ সামরিক আগ্রাসন চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সময় এমনও হয়েছে যে, ভারতীয় আক্রমণের সুনির্দিষ্ট সময় (H-Hour) গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পেরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেও যুদ্ধপ্রস্তুতি নিতে হয়েছে।[২৫]

কিন্তু যে কোন কারণেই হোক শেষ মুহূর্তে ভারত আক্রমণ পরিচালনা না করে পিছিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে ভারতীয় গবেষক শ্রীকান্ত মহাপাত্র জানান, ১৯৯০ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ভারতীয় একজন জেনারেল তাকে (বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী) বলেছিলেন, ১৯৭৫-'৭৬ সালে "Only God and Mrs. Indira Gandhi saved Bangladesh during that critical moment."[২৬] অর্থাৎ কেবলমাত্র ঈশ্বর ও মিসেস ইন্দিরা গান্ধী সে সময়ের জটিল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে রক্ষা করেন।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্বরূপ সন্ধানে

(ক) রণ-রাজনৈতিক দর্শন

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার মৌলিক দু'টি খাত অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পর্যায় পর্যালোচনা ও জাতীয় ক্ষমতা প্রতিফলনের উপাদানসমূহ বিবেচনা করে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকেও একটি কার্যকরী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যদিও

২৩। রবি রিখি *'যুদ্ধে ভারত কেন বার বার হেরেছে'* দৈনিক আনন্দবাজার, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮
২৪। প্রাগুক্ত
২৫। লেখকের সাথে মে. জে. আব্দুস সামাদ-এর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২০০০
২৬। পূর্বে উল্লেখিত ক্রমিক নং ১৩ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৬০০

"নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলাদেশের কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদ বা নীতিমালা নেই এবং কোন সরকার বা সংসদ কখনোই এ জাতীয় কোন নীতিমালা সম্পর্কে টু শব্দটিও করেনি।"২৭ এদিকে 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলেও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, প্রতিবেশী ভারত এদেশের প্রতি সব সময়ই বৈরী আচরণ প্রকাশ করে এসেছে। বিশেষ করে এদেশে একটি অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'এক্সটেনডেড ফ্রন্টিয়ার পলিসি'র সূত্রসমূহ বাস্তবায়নে ভারতীয় কৌশলবিদগণ বরাবরই তৎপর। বলতে গেলে, বাংলাদেশকে রাজনীতি ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মাধ্যমে কৌশলগত পর্যায়ে নিউট্রালাইজ করাই হলো ভারতের লক্ষ্য। বাংলাদেশে একটি ভারতপন্থী বিশাল রাজনৈতিক শক্তির উপস্থিতি ও ভারতের আদর্শের সাথে তাদের সমরূপতাই মূলত আমাদের বরাবর একটি সুনির্দিষ্ট রণনীতি ও প্রতিরক্ষা কাঠামো গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৬ সালের পর ভারতকে ট্রানজিট প্রদানে আওয়ামী লীগ সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টা, উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন ও আন্তঃসীমান্ত গেরিলা তৎপরতা দমনে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা আমাদের রণনীতিকে ভারতীয় রণনীতির পরিপূরক করে তুলেছে বলে প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণ উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও প্রতিরক্ষা অবকাঠামো তাই এতদঞ্চলে ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় নিবেদিত ছিল না, বরং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রলম্বিত ও সমান্তরাল অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এ কারণেই আ'লীগ সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষ করে কৌশলগত পর্যায়ে গৃহিত নীতিমালার আলোকে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের যতোদিন পর্যন্ত না জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি একক ও একমুখী রণনীতি প্রণীত হচ্ছে ততোদিন পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর বৃদ্ধি বা আধুনিকায়ন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন কার্যকরী মাত্রা যোগ করতে পারবে না। কারণ, বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে যেভাবে কূটনৈতিক ও রণনৈতিক পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তা আমাদের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ১৯৭৫-পূর্ববর্তী সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে '৭৫ হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সরকারসমূহের গৃহীত নীতিমালার সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেখানে ১৯৭৫-পূর্ববর্তী সরকারের সখ্যতা ছিল ভারত ও সোভিয়েত সাথে সেখানে '৭৫ থেকে '৯৬ পর্যন্ত সরকারসমূহের কৌশলগত নীতিমালা আবর্তিত হয়েছেন চীন ও উপমহাদেশের অপরাপর ভারতবিরোধী শক্তিকে কেন্দ্র করে। এ দু'টো অবস্থান সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। এখানে আমরা যদি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা বলতে বুঝে থাকি জাতীয় মৌল চেতনা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র রক্ষা করাকে তা হলে অবধারিতভাবেই বলতে হবে ভারতের মতো আগ্রাসী দেশের বিপরীত মেরুতেই অবস্থান নিতে হবে বাংলাদেশকে এবং এদেশকে, এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে বাংলাদেশকে ভারতীয় রণনীতির বিপক্ষে যে কোন অঙ্কে যোগ দিতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই, হবেও না।

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১

উপরোক্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এটুকু বলা অন্যায় হবে না যে, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আ'লীগ শাসনামলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও রণনীতি হচ্ছে ভারতীয় পররাষ্ট্র ও রণনীতির পরিপূরক। এ অবস্থায় তাই এদেশে যদি ৫০ লক্ষ সদস্য বিশিষ্ট সামরিক বাহিনী থাকে তা হলেও কোন লাভ নেই বাংলাদেশের; বরং এ লাভ হলো ভারতের। কারণ, বাংলাদেশের সমরশক্তি এক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থেই ব্যবহৃত হবে, যেমন হয়েছিল ১৯৭৫ পূর্ববর্তীকালে ও হয়েছে ১৯৯৬-এর ২৩শে জুন-পরবর্তী সরকারের শাসনামলে।

উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে ভারতের সাথে কথিত ২৫ বছর মেয়াদী 'মৈত্রী চুক্তি' সম্পাদনের পর চুক্তির ৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী 'উক্ত চুক্তি সেনাবাহিনীকে বাধ্য করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান গ্রহণ করে মিজো ও নাগা গেরিলাদের বিরুদ্ধে একশনে যেতে।'[২৮] বলাই বাহুল্য, ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের দমনে অর্থাৎ ভারতের অখন্ডতা রক্ষার্থে তখন এভাবেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আন্তঃসীমান্ত গেরিলা তৎপরতা দমনে যৌথ অভিযান পরিচালনায় সম্মতি দিয়ে সরকার মূলত বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীকে ভারতের অখন্ডতা রক্ষায় ব্যবহার করতে দিয়েছে।

তাই সর্বোতভাবে বলা যায় যে, আদর্শ বা রণরাজনৈতিক দর্শনটিই হচ্ছে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয়। আর দেশে বিশাল পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্ব নিয়ে কখনোই শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় যা আমাদের 'মৌলিক জাতীয় মূল্যবোধ' বা 'National Values'-কে রক্ষা করতে পারে। এদিকে ভারতমুখী রণরাজনৈতিক দর্শন যে কিভাবে আমাদের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে তার একটি উদাহরণ হতে পারেন শেখ হাসিনা স্বয়ং।

উল্লেখ্য, '৯১ সালে বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকার সময় শেখ হাসিনা ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জনৈকি গবেষকের কাছে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এ ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষক শ্রীকান্ত মহাপত্র ভারতীয় 'স্ট্র্যাটেজিক এ্যানালিসিস' পত্রিকায় আগস্ট '৯১ সংখ্যায় শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন যে, বাংলাদেশ চীন থেকে ৪০০ কোটি টাকা দিয়ে এক স্কোয়াড্রেন এফ-৭ জঙ্গী বিমান কিনেছে। তার মতে, এই তথ্য তাকে দেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা এও বলেন যে, উক্ত অর্থ গোপনে প্রদান করা হয়েছিল যার কোন হিসেবে নেই।[২৯] মূলত এ কারণেই আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় হবে রণ-রাজনৈতিক অবস্থান সুনির্দিষ্ট করা।

২৮। S.M. Ali, *'European Network of Bangladesh Studies : Civil-Military Relations in the Soft State : The case of Bangladesh.'* ENBS, EC Research Paper No. 1/6-94, p. 17

২৯। পূর্বে উল্লেখিত ক্রমিক নং ১৩ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৬০২

লক্ষণীয়, ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা'র মনোভাবে যথেষ্ট পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। সে সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি অত্যাধুনিক মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান সংগ্রহসহ শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলেন, "The need for Bangladesh armed forces to become a modern, well equipped and well-trained force cannot be overemphasised."

যদি বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের মধ্যে এমন ইতিবাচক মনোভাব ধীরে হলেও প্রকাশ পায় তা হলে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে রণনীতি প্রণয়ন অনেক সহজ হয়ে যাবে বলে নিশ্চিত বলা যায়।

(খ) নিরাপত্তানীতির লক্ষ্য

বাংলাদেশ কখনোই কোন আগ্রাসী দেশ নয়। চাইলেও তা হতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ বরাবরই শান্তিপ্রিয়। অধ্যাপক এমাজউদ্দিনের মতে, 'বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই শান্তির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ একান্তভাবে কাম্য।' কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশ যে সমরপ্রস্তুতিসহ জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অন্যান্য খাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে, তাও নয়। বরং বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ক্ষমতা-সম্ভাবনা, সম্ভাব্য শত্রুর মনোভাব এসব দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিতে হবে কার্যকরী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠনে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা রণনীতির লক্ষ্য হবে ঃ

প্রথমত; আগ্রাসী নয় আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা (Offensive Defence) ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

দ্বিতীয়ত; একটি প্রচলিত ফার্স্ট লাইন নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের পাশাপাশি সেকেন্ড লাইন ফোর্স গড়ে তোলা।

তৃতীয়ত; অত্র অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য বা Balance of power রক্ষায় আগ্রাসী শক্তির বিপরীত জোটে যোগদান ও বৈশ্বিক পরিমন্ডলে ব্যাপক সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে সচেষ্ট থাকা।

চতুর্থত; রণপরিকল্পনায় ব্যাপকভিত্তিতে জনসম্পৃক্তি নিশ্চিত করা। এবং

পঞ্চমত; সর্বোপরি জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে রণ-রাজনৈতিক দর্শন নির্দিষ্ট করা, যাতে সরকার পরিবর্তনের ফলে নীতিমালায় কোন পরিবর্তন না হয়। লক্ষ্যণীয়, এক্ষেত্রে আগ্রাসী শক্তির স্বার্থরক্ষাকারী কোন নীতিমালা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখে আমাদের রাজনীতিবিদ, রণকৌশলবিদ, অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত নিয়ে একটি সু-সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম গ্যারান্টি।

সশস্ত্র বাহিনীর রূপরেখা

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষানীতি কিরূপ হবে বা সশস্ত্র বাহিনীর রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন একটা আলোচনা হয়নি। যাও হয়েছে, তাতে পুরোপুরিভাবেই সশস্ত্র বাহিনী বিরোধিতাই কেবল প্রকাশ পায়নি, বরং যে কোন অবয়বে সশস্ত্র বাহিনী পোষাকে অপ্রয়োজনীয় বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এসবের মাঝেও দুটো গুরুত্বপূর্ণ বই বেরিয়েছে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার সম্ভাব্য রূপরেখা নিয়ে। এর একটি হলো নাজিম কামরান চৌধুরীর 'বাংলাদেশ ঃ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সশস্ত্র বাহিনী', অপরটি লিখেছেন মেজর রফিকুল ইসলাম, পি.এস.সি. যার শিরোনাম 'বাংলাদেশ ঃ প্রতিরোধের রূপরেখা ও রণনীতির সন্ধানে'।

উল্লেখ্য, এঁরা দু'জনই সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। নাজিম কামরান তার বইয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর রূপরেখা বর্ণনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণত অনিয়মিত, জনভিত্তিক বা গণবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন। এর সাথে তিনি এর বিস্তৃত অবয়ব ও পরিচালনার পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, মেজর রফিকুল ইসলাম ব্যাপকভাবে বিশ্বের যাবতীয় প্রতিরক্ষানীতি নিয়ে আলোকপাত করলেও বাংলাদেশের রণনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতই নাজিম কামরানের উপর নির্ভর করেছেন এবং স্বতন্ত্র কোন রণনীতির কথা তাঁর বইয়ে লিপিবদ্ধ করেননি।

মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষানীতি নির্ধারণে প্রায় সকলেই 'এস্টাবলিশমেন্ট' ধারাকে অস্বীকার করে গেছেন। এঁরা অনিয়মিত গণবাহিনী গঠনের পক্ষে যেসব যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১। নিয়মিত বাহিনী গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভবিষ্যতে আকার বাড়ানোয় প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, যা বাংলাদেশের নেই। এছাড়া তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ভারত আমাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ, তা হলে প্রচলিত যুদ্ধের নীতিমালা অনুযায়ী বিশাল ভারতীয় বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য মোটামুটি পর্যায়ের যে শক্তির প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেয়া সহজ কাজ নয়। অন্যদিকে সার্বক্ষণিকভাবে আমরা কেনই বা ভারতকে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের তালিকায় রাখবো? এ জন্য প্রতিনিয়ত প্রস্তুতি বা প্রশিক্ষণে যে ব্যাপক অংকের অর্থ ব্যয় করতে হবে, তা আমাদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে আর সম্ভব হলেও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তা ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

২। বাংলাদেশে পরিচালিত যে কোন ভারতীয় আক্রমণে হালকা অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী কতক্ষণ এবং কোন্ পর্যায়ে আক্রমণকারী বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? এ ব্যাপারে নামিজ কামরানের মত হচ্ছে, "…. যদি ধরে নেয়া হয় যে, ভারতীয় বাহিনী ১৯৭১ সালের মতো সফল হামলা পরিচালনা করবে, তা হলে সেনাবাহিনীর

করার কিছুই থাকবে না। এয়ার কভার এবং ভারী গোলন্দাজ বহর ছাড়া আমাদের পদাতিক বাহিনী কেবল সীমিত স্থানে আবদ্ধ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে এবং গোটা সীমান্ত থেকে যাবে অরক্ষিত। একটিমাত্র ব্যতিক্রম হবে এই যে, হামলাকারীদেরকে দেশের বিরোধী জনতার মুখোমুখি হতে হবে। এক্ষেত্রে কেবল জনবলের কথাই বলা হচ্ছে, যুদ্ধসামগ্রীর কথা নয়। এমনকি দশ দিনের একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলেও প্রয়োজন হবে কোটি কোটি টাকা।"[৩০]

৩। প্রচলিত নৌ বাহিনীর ক্ষেত্রে বলতে গিয়ে গণবাহিনীর সমর্থক লেখকেরা একই রকম হতাশা প্রকাশ করেন। তাদের মতে, আমাদের ফ্রিগেট ও মিসাইল বোটগুলো মিসাইল সজ্জিত হলেও ভারতীয় বিমানবাহী নৌ বহরের কাছে নিছক 'নস্যি'।

৪। এদিকে আধুনিক যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিমান বাহিনীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হতাশা পোষণ করে নাজিম কামরান বলেন, "এর (বিমান বাহিনী) প্রধান কাজ হলো অনুপ্রবেশকারী বিমানের হাত থেকে আমাদের আকাশসীমা রক্ষা করা, ভূমিতে যুদ্ধমান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা দেয়া এবং শত্রুর ওপর পাল্টা হামলা চালানো। আমাদের রয়েছে একটি দামী রাডার সিস্টেম ও কয়েক স্কোয়াড্রন যুদ্ধবিমান। এ নিয়ে বিমানবাহিনী কি করতে পারে? পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা তিনদিকে আমরা ভারতীয় বিমান ঘাঁটিগুলো দিয়ে পরিবেষ্টিত। ঢাকার বিমান ঘাঁটিটি সবচেয়ে নিরাপদ এবং সীমান্ত থেকে তাও পাঁচ 'জেট মিনিটের' আওতায়। আমাদের মূল্যবান রাডার সিস্টেম হয়তো যথাসময়ে সতর্ক সংকেত দেবে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে আমাদের করার কিছুই থাকবে না। এ সময়ে আমাদের বিমানগুলো কোন রকম উড্ডয়নে সক্ষম হলেও ভারতীয় বোমারু বিমানগুলো অভিযান শেষ করার পর সেগুলো আর ফিরে এসে নামতে পারবে না। বিমানবহর দ্বারা ভূমিতে যুদ্ধমান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা দেওয়ার প্রশ্ন তো অবান্তর।"[৩১]

এদিকে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান ২৩ মে '৯৫ সংখ্যা দৈনিক আজকের কাগজে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, '......যদি আমরা সত্যি ধরে নেই যে, ভারত আমাদের আক্রমণ করবে-তা হলে এই সামরিক বাহিনী দিয়ে কিছু হবে না। সিটিজেন আর্মি লাগবে।.....সিটিজন আর্মি করা গেলে সামরিক খাতে ব্যয় আরো কমে যাবে।'

অর্থাৎ নিয়মিত বাহিনীর বিপক্ষে মত পোষণকারীরা যা করতে চান, তাতে আমাদের মত দরিদ্র ও ছোট দেশে কখনোই বড় নিয়মিত বাহিনী গঠন ও লালন-পালন করা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

অন্যদিকে, অনিয়মিত বা গণবাহিনীর কথা যারা বলছেন, তারা বেশ কিছু ফর্মুলা দিচ্ছেন বটে, তবে এর সবগুলোই সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়ার ছোঁয়ায় অনেকটা কল্পনাবিলাসী

৩০। নাজিম কামরান চৌধুরী, '*বাংলাদেশ ঃ রাজনীতি, অর্থনীতি ও সশস্ত্র বাহিনী*', পৃ. ৪৭
৩১। প্রাগুক্ত পৃ. ৪৬-৪৭

পরিকল্পনা হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এরূপ পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা যেসব পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়া স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে তাদের প্ল্যানের মূল কথা হলো মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। (এখন এই প্রশিক্ষণ কি শুধু মাত্র হালকা অস্ত্রভিত্তিক হবে, নাকি তাতে ভারী সমরাস্ত্রও অর্ন্তভুক্ত থাকবে, তা এদের কেউ উল্লেখ করেননি)।

২। নাজিম কামরান সিটিজেন আর্মির যে থিওরী দিয়েছেন, তাতে সেই আর্মি থাকবে প্রতিটি থানায়, এরা প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকবে নানান উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে। (অর্থাৎ সিভিলিয়ান এ্যাকটিভিটির সাথে সামরিক সদস্যরা জড়িয়ে যাবেন, যা মার্শাল ল'-র সময় দেখা যায়)।

৩। সিটিজেন আর্মির খরচের জন্য অর্থ আসবে তাদের নিজেদের পরিচালিত খামার বা বিভিন্ন প্রকল্প থেকে।

৪। যেহেতু প্রতিটি সক্ষম নরনারীই হবেন সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তাই যুদ্ধাবস্থায় সীমান্ত এলাকা থেকে শুরু করে পুরো দেশেই তারা গড়ে তুলবেন প্রতিরক্ষা ব্যুহ। অবশ্য তাদের এই রণনীতি কি আত্মরক্ষামূলক হবে না আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণেও কিছুটা সহায়ক হবে, সে কথা কেউ উল্লেখ করেননি।

৫। এদিকে, গণবাহিনীতে নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী আদৌ থাকবে কিনা, থাকলেও সেসবের অবয়ব কেমন হবে, নৌ-জাহাজ, যুদ্ধবিমান তখন কারা চালাবেন, সে কথা গণবাহিনী পরিকল্পনায় নেই।

৬। গণবাহিনী বা সিটিজেন আর্মির পক্ষে যারা কলম ধরেছেন, তারা প্রায় সকলেই চীন, কিউবা, ইসরাইল, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতকং গেরিলারা যে দক্ষতার পরিচয় দেয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত একটি বিশাল সামরিক পরাশক্তিকে রুখে দেয়, তাতে নিঃসন্দেহে এ পক্ষের যুক্তি প্রদানকারীদের মতে, গণবাহিনীর পক্ষে এক হাজার একটি সাফাই গাওয়া যায়।

৭। সবচেয়ে বড় কথা, নিয়মিত বাহিনী গঠন ও এর লালন পালনের জন্য অব্যাহতভাবে অর্থ ব্যয় করতে হয়। বিশেষ করে, নিয়মিত বাহিনীর সদস্যদের রেশন, পোষাক, হাউজিং, ভারী সমরাস্ত্র ও এর গোলাবারুদ ক্রয়, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির পিছনে বিপুল অংকের অর্থ খরচ করতে হয়। অথচ, সিটিজেন আর্মি কনসেপ্টে প্রশিক্ষিত জনগণ একদিকে যেমন ডিসিপ্লিনড হিসেবে গড়ে উঠবে, তেমনি অন্যদিকে এরা সমষ্টিগতভাবে 'কমরেড'দের সাথে মিলে জড়িয়ে যাবে নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে। ফলে নিজেদের খরচ উঠে আসবে নিজেদের গৃহীত প্রকল্প থেকে। এছাড়া, সিটিজেন আর্মির সদস্যরা তো এমনিতেই বিভিন্ন পেশায় পূর্ব থেকেই যুক্ত ছিলেন। এদের কেউ ছিল ছাত্র, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ চাকুরীজীবী। অতএব, সশস্ত্র বাহিনীর জন্য আলাদা রেশন, পোষাক, বাসস্থানের 'ঝামেলা' থাকছে না।

৮। থানা পর্যায় থেকে ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায়ে গণবাহিনীর বিস্তৃতি থাকায় এলাকাভিত্তিক চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ ও যাবতীয় অপরাধের মাত্রা থাকবে না বললেই চলে। আবার এরূপ বাহিনী গড়ে তোলার ফলে দেশের বেকার সমস্যারও সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। কারণ, প্রতিটি সক্ষম নাগরিকই যখন বিশেষ প্রশিক্ষণ পাবেন, তখন প্রতিজনই নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে যেমন ধারণা করতে পারবেন, তেমনি প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারবেন।

৯। সবচেয়ে বড় কথা-দেশের প্রতিরক্ষা প্রতিটি নাগরিকের মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। একটি দেশের নিরাপত্তাবাহিনীর অন্যতম শক্তি হলো জনসম্পৃক্তি। অর্থাৎ, সশস্ত্র বাহিনীকে হতে হবে দেশীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ, এর সদস্যদের বুঝতে হবে দেশের সমস্যা, সাধারণ জনগণের অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়ার সাথে হতে হবে একাত্ম। মোটকথা জনগণের দেশপ্রেম, সচেতনতাকে জাগিয়ে তুলেই কেবল যুদ্ধযাত্রা সম্ভব।

এখানে 'সমাজের পৃথক এলিট' শ্রেণী হিসেবে প্রচলিত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কখনো সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যাওয়া সম্ভব নয়, যুদ্ধ তো পরের কথা। বৃটিশ ইউরোপীয় ধাঁচে গুটিকয়েক সেনা সদস্য কিভাবে 'অনার্য' পরিবেশে, ধুলো বালিতে মানুষ হওয়া 'সিভিলিয়ানদের' সাথে মিশে যাবেন, গড়ে তুলবেন কার্যকরী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা? কারণ 'দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা' কখনোই দরিদ্র বাংলাদেশের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

আসলে কি ব্যাপারটি তাই? গণবাহিনী কনসেপ্টই কি সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়?

নিয়মিত না অনিয়মিত গণবাহিনী গঠনের মাধ্যমে আমরা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারব, তা কখনোই সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কারণ, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও যুগ-চাহিদার উপর নির্ভর করে সশস্ত্র বাহিনীর প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়। যেমন, এক সময় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীনে পিপলস্ আর্মি কনসেপ্ট অনুসরণ করা হতো। তখন তাদের যুদ্ধকৌশলের অন্যতম কৌশল ছিল 'হিউম্যান ওয়েভ ট্যাকটিকস্', অর্থাৎ কেবলমাত্র সৈন্য সংখ্যার প্রাচুর্যেই তারা তাদের শত্রুকে মোকাবিলা করতো। এক্ষেত্রে সমরাস্ত্রের সংখ্যা বা গুণাগুণ কোন বিবেচ্য বিষয় বলে গণ্য হতো না।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ বা তারও আগের পঞ্চাশ দশকের কোরিয়া যুদ্ধের সময় চীন উপরোক্ত কৌশল অবলম্বন করে। এছাড়া কম্যুনিস্ট দেশগুলোও প্রায় একইরূপ কৌশল অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে আমরা ভিয়েতনামের কথা উল্লেখ করতে পারি। স্বাধীন ভিয়েতনামে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সে দেশের প্রায় সকল পূর্ণবয়স্ক নাগরিক একজন পূর্ণাঙ্গ যোদ্ধায় পরিণত হয়। মাত্র ২৪ ঘন্টার নোটিশে তারা যোদ্ধাবাহিনী মোতায়েনে সক্ষম ছিল। কিন্তু যুগের ধারা পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায়

চীন, ভিয়েতনামসহ সকল দেশই গণবাহিনী বা পিপলস্ আর্মির ধারণা প্রায় ত্যাগ করেছে বলা যায়। অবশ্য ওয়ারশ জোট টিকে থাকার সময় সোভিয়েত রাশিয়াসহ অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় কম্যুনিস্ট দেশে যে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী ছিলনা, তা নয়। কিন্তু চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়ার প্রসঙ্গটি অনেকটা ভিন্ন। মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণেই এ দেশগুলোয় ব্যাপকহারে গণবাহিনী কনসেপ্ট অবলম্বন করা হতো।

এদিকে, অনেকে হয়ত এ প্রসঙ্গে উন্নত বিশ্বের দেশ হিসেবে সুইজারল্যান্ড বা ইসরাইলের নাম উল্লেখ করতে পারেন, বলতে পারেন সে দেশেও তো এখনো ব্যাপক পরিসরে প্রতিটি সক্ষম নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। হ্যাঁ, একথা সত্য। তবে এ প্রসঙ্গ আলোচনায় কখনো বাংলাদেশকে একই মানদন্ডে পর্যালোচনা করা উচিত নয়।

এখানে আমাদের প্রথমেই যে বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন, তা হলো বাংলাদেশে গণবাহিনীর বিপরীতে নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে যদি যুক্তি দাঁড় করাতে যাই, তা হলে স্বভাবতই প্রতিরক্ষার প্রশ্নে একমাত্র গণবাহিনী কনসেপ্ট কেন গ্রহণযোগ্য নয় তা তলিয়ে দেখতে হয়। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে নজর দেয়া যেতে পারে ঃ

১। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিতিশীলতা ও দার্শনিক মতপার্থক্য এতটাই প্রকট যে, নৃতাত্ত্বিক এবং ভাষাগত দিক দিয়ে সমরূপতা লক্ষণীয় হলেও পারস্পরিক ভিন্নতা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু পর্যায়ে দৃশ্যমান। আমরা স্বীকার করি বা না করি, সংবিধানে থাকুক বা না থাকুক, স্বাধীনতার প্রায় তিন যুগ পরও আমরা আমাদের একক জাতীয় শ্লোগান পর্যন্ত নির্দিষ্ট করতে পারিনি। সংবিধান অনুযায়ী আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ মেনে নেয়া উচিৎ; উচিৎ 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' শ্লোগান দেয়া। কিন্তু আওয়ামী লীগসহ বাঙালী জাতীয়তাবাদ সমর্থক বেশ কিছু রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যেই সাংবিধানিক জাতীয়তাবাদকে বাদ দিয়ে 'জয় বাংলা' শ্লোগান তুলতে এতটুকু লজ্জাবোধ করে না। এমনকি কোন কোন সময় শুধুমাত্র এই শ্লোগানের দ্বিমুখীনতা হতেই সৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর সংকটজনক পরিস্থিতির। ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার 'জয় বাংলা' শ্লোগান তোলা নিয়ে এরশাদবিরোধী ঐক্যজোট ফাটল প্রায় নিশ্চিত অবস্থায় চলে এসেছিল। অর্থাৎ আমাদের দেশে এই রাজনৈতিক আদর্শগত মতপার্থক্য দেশীয় ঐক্যের বিশেষ করে জন-ঐক্যের প্রধান অন্তরায়। গণবাহিনী কনসেপ্টে জনগণই হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীর মূল অংশ ও চালিকাশক্তি, তাই দ্বিধাবিভক্ত, আদর্শিক ঐক্যহীন জনগণ নিয়ে জন বা গণবাহিনী গঠন বেশ রিস্কি।

এখানে বলা যায় যে, নিয়মিত বাহিনীতেও তো ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ হতে লোক নিয়োগ করা হয় এবং জাতীয় পর্যায়ে জন-ঐক্যই যদি নিশ্চিত করা না যায়, তা হলে দ্বিধাবিভক্ত

দেশে নিয়মিত বাহিনীও তো অনৈক্যের টানাপড়েনে নিপতিত হবে? এছাড়া রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ঐক্য ব্যতিরেকে যেহেতু শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ গঠন সম্ভব নয়, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা সুদূরপরাহত, তাই এরূপ পরিস্থিতিতে নিয়মিত বাহিনী গঠনও কাম্য হতে পারে না।

একথা মনে রাখতে হবে যে, অস্থিতিশীল জনমানুষের মাঝে সশস্ত্র বাহিনীর অবকাঠামো ছড়িয়ে দেয়ার চেয়ে একটি সীমিত গন্ডির মাঝে সশস্ত্র বাহিনী গঠন একদিকে যেমন তুলনামূলক কম ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি তা সশস্ত্র বাহিনীর অবকাঠামোগত বিভেদ রোধেও হতে পারে সক্ষম। আমরা এ পর্যন্ত কথিত গণবাহিনীর যে রূপরেখা পেয়েছি, তাতে দেখা যায় জনগণের সর্বস্তর হতে সক্ষম ব্যক্তিদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এরপর এরা কোন ক্যান্টনমেন্ট বা পৃথক আবদ্ধ স্থানে না থেকে সমাজের সকল পর্যায়ে মিশে যাবেন, ছড়িয়ে পড়বেন। এছাড়া এদের বেশীরভাগই নিয়োজিত হবেন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে, যার ধরন হবে সম্পূর্ণ বেসামরিক ধাঁচের ও অনেকটা কমিউন সিস্টেমের। এভাবে সশস্ত্র বাহিনীর কাঠামো পুরো সমাজে ছড়িয়ে দেয়া তখনি সম্ভব যখন পুরো রাষ্ট্র বা সমাজ কাঠামো হবে সমাজতান্ত্রিক মডেলের বা রেজিমেন্টেড, যেখানে রাজনৈতিক দর্শন হবে নিয়ন্ত্রিত ও সমাজব্যাপী এক ও অভিন্ন। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক, উন্মুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় কখনো কোন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ফলে আমাদের এখানে যেরূপ রাজনৈতিক আদর্শগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রণ না করা পর্যন্ত আমরা কিভাবে নিরাপত্তা বাহিনীকে সমগ্র সমাজের মাঝ ছড়িয়ে দেই? আর যদি দেইও তা হলে এখন যেমন কথায় কথায় তুচ্ছ মতভেদের জন্য পাড়ায় পাড়ায় সংঘাত-সংঘর্ষ, মারামারি, হানাহানি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন সেখানে ঐ একই পাড়ায়-মহল্লায় যদি সকল সক্ষম ব্যক্তি সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হয় তা হলে তাদের মারামারির 'স্ট্যান্ডার্ড' (!) কি আরো ভয়াবহ হবে না?

অনেকে বলতে পারেন, কেন এসব ব্যক্তির তো সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শৃংখলা সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ থাকবে? তা থাকবে বটে, কিন্তু সামরিক শৃংখলা, কখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অর্ধেক আর্মি অর্ধেক সিভিল অবস্থায় অর্জন করা যায় না। আর যেখানে যে জাতির মাঝে আবেগ বেশী, শিক্ষার হার কম, ঐতিহ্যগতভাবে যারা গুজবে তুলনামূলক বেশী বিশ্বাসী, সেখানে গণবাহিনীর নামে 'গণ' প্রতিষ্ঠান গঠন না করাই ভাল।

২। মনে রাখতে হবে, সশস্ত্র বাহিনীর মূল চালিকাশক্তি হলো শৃংখলা বা ডিসিপ্লিন। কঠোর নিয়মের মধ্যে থেকে, বিনা প্রশ্নে উপরওয়ালার আদেশ মানাই হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনীকে কার্যকরী হিসেবে পরিচালিত করার প্রধানতম শর্ত। একজন সিভিলিয়ান ও ইউনিফর্ম পার্সোনেলের মাঝে পার্থক্য হলো এই ডিসিপ্লিন। অথচ এ দু'পক্ষেরই মানবিক আবেগ-অনুভূতি, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদা একইরূপ। তার উপর একজন ইউনিফর্ম পার্সোনেল বা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য 'মিলিটারী ম্যান' হিসবে জন্ম নেন না, বরং তিনিও অন্য আর দশটি লোকের মত একজন সিভিলিয়ান হিসেবেই মুক্ত আলো-বাতাসে বেড়ে

ওঠেন। তার বাবা-মা, পরিবার-পরিজন সকলেই সিভিলিয়ান। কিন্তু এঁদের মাঝে পার্থক্য বা ভিন্নতা, কোমলতা বা কঠোরতা, আবেগপ্রবণতা বা নিস্পৃহতা তখনি জন্ম নেয়, যখন একজন কঠোর কঠিন প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে একটি শৃংখলিত জীবনে প্রবেশ করেন। এই জীবনে নিজের সত্তা বলে পৃথক কিছু নেই, সবটাই একটি সিস্টেমের মধ্যে আবর্তিত। তাই দেখা যায়, একজন সৈনিক সামনে শত্রুর গোলাগুলিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিনা শর্তে জীবন বিলিয়ে দেয় রণাঙ্গনের ভয়াবহতায়। সিস্টেমের প্রতি অবিচল থাকা একমাত্র ট্রেইনড্ পার্সোনেলের পক্ষেই এমনটি সম্ভব। কোন অর্ধ প্রশিক্ষিত, হাফ মিলিটারী, হাফ সিভিলিয়ানের দ্বারা আবেগমথিত সীমিত যুদ্ধ করা সম্ভব হতে পারে, স্যামনাসামনি যুদ্ধ করা নয়।

শৃংখলার সাথে নিয়মিত ও গণবাহিনীর সম্পৃক্ততা, এর যথোপযুক্ততা সম্পর্কে বলতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে, নিঃসন্দেহে নিয়মিত বাহিনীর শৃংখলার মান হবে উঁচু ও তাদের কাঠামো হবে যুথবদ্ধ। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় উন্নয়নমূলক বেসামরিক কার্যক্রমে জড়িত থাকবে বলে আমরা গণবাহিনীর যে রূপরেখা প্রণয়ন করছি, তাদের শৃংখলার মানে যে সঙ্গত কারণেই তারতম্য দেখা দেবে না-তার নিশ্চয়তা কোথায়?

একজন সশস্ত্র ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, তার দ্বারা কাজ আদায় করিয়ে নেয়ার চেয়েও বেশী ভাবনার ব্যাপার। প্রথমেই মনে রাখত হয় 'অ্যা ম্যান উইথ অ্যান আর্মস ইজ অ্যা ডেঞ্জারাস ওয়ান'। যদি এঁদের মাঝে কখনো কোন কারণে ন্যূনতম পর্যায়েও শৃংখলার মান কমে যায় বা ভেঙ্গে যায়, তা হলে তা ভয়ংঙ্কর অনাসৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ ব্যাপারে আমরা বেশকিছু উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারি। ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরে কিশোরী ইয়াসমিনকে ধর্ষণ ও হত্যা ইস্যুতে আমাদের পুলিশ বাহিনী যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে তা আধুনিক পৃথিবীর পুলিশ বাহিনীর ইতিহাসে অন্যতম কলঙ্কজনক অধ্যায়। এ ঘটনায় যত না দোষ দেয়া যায় 'ব্যক্তি পুলিশ' কে তার চেয়ে বেশী দোষ দেয়া উচিত পুলিশ বাহিনীর শৃংখলার মানকে। এখানে দিনাজপুর স্ক্যান্ডাল নিয়ে দৈনিক দেশজনতায় প্রকাশিত ২৯-৮-৯৫ তারিখে 'দিনাজপুর স্ক্যান্ডাল ও পুলিশ বাহিনীর শৃংখলার মান' শিরোনামের সম্পাদকীয় হতে কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ সম্পাদকীয়তে লেখা হয়-

> 'এদেশে আজ একথা কে না জানে মাত্র ক'হাজর টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়া যায় পুলিশে, হওয়া যায় সার্জেন্ট বা এস.আই। এখানে নেই কোন যোগ্যতার প্রশ্ন, নেই সচ্চরিত্র বাছাইয়ের চেষ্টা। বরং সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে আইন অমান্যকারীদের কাছ থেকে কোন উপায়ে কিভাবে অবৈধ অর্থ আদায় করা যায়- সে কাজেই পুলিশ ব্যস্ত। তাই সঙ্গত কারণেই পুলিশের ডিসিপ্লিনেরও ঘটেছে দারুণ অবনতি। রাস্তার পাশে, থানায়, ডিউটিরত পুলিশকে দেখা যায় নিশ্চিন্তে পান চিবোতে চিবোতে গল্পে মশগুল থাকতে। এদের কারো পায়ে হয়ত বুট নেই, নেই ড্রেস রেগুলেশন অনুযায়ী মোজা। অথচ ডিউটিরত অবস্থায়

ইউনিফর্ম পরে পান খাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এছাড়া সার্জেন্ট বা দারোগা নামের ভীতিকর পদাধিকারের যেসব পুলিশকে আমরা দেখি, তাদের প্রায় প্রত্যেকের স্বাস্থ্য এতটাই ভাল (!) যে, এরা যে কখনো ইউনিফর্ম সার্ভিসে থেকে ব্যায়াম চর্চা করেন, তা মনেই হয় না। পাশাপাশি এদের ভাবভঙ্গি, জামার হাতা গুটিয়ে, বুকের বোতাম খুলে যত্রতত্র পাড়ার মাস্তানের মত ঘুরে বেড়াতে দেখলে মনে হয়, এরা বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে না ঢুকে বোম্বের চিত্র পরিচালকদের সাথে যোগাযোগ করলেই ভাল করতেন।'

এবার দেখা যাক, আরেকটি ইউনিফর্ম সার্ভিস-আনসার-এর অবস্থা কিরূপ? বলতে গেলে এই আনসার ও ভিডিপি'র বিস্তৃতি পুরো সমাজব্যাপী। যা অনেকটা গণবাহিনীর ধারণার সাথে মিলে যায়। এর সদস্যরা গ্রামে-গঞ্জে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু এদের শৃংখলার মান বা একটি যুথবদ্ধ নিরাপত্তা বাহিনী হিসেবে কার্যক্রম কতটুকু তা আমরা দেখতে পাই প্রায়শই পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টালে। আনসারদের রাইফেল ছিনতাইয়ের মত সাধারণ ঘটনা থেকে শুরু করে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে দেশব্যাপী যে মিউটিনি বা বিদ্রোহের সূচনা হয়-তা এককথায় অকল্পনীয়। মূলত অস্ত্র যদি শৃংখলাহীন কোন লোকের হাতে পড়ে, তাহলে তা নিঃসন্দেহে নিরাপত্তা ভঙ্গ করবে।

শৃংখলার মান খারাপ হওয়ার জন্য শুধু আমাদের দেশের পুলিশ, আনসার বাহিনীর উদাহরণ টানা যথেষ্ট তা নয়, এক্ষেত্রে আমরা ভারতের বিএসএফ-এর কথাও উল্লেখ করতে পারি। কাশ্মীর ও অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত প্রদেশের বিএসএফ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থায় থাকতে হচ্ছে। সেখানে সেনা সদস্যরা ক্রমাগত চাপের মধ্যে থেকে পালিয়ে না গেলেও বিএসএফ সদস্যরা প্রতিদিনই ব্যাপকহারে পালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে শ্রীলংকার সেনাবাহিনীতেও একসময় এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। সেখানে তামিল গেরিলাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে, এ ভয়ে অফিসাররা পর্যন্ত সেনাবাহিনী হতে পালিয়ে গেছে বলে জানা যায়। এ জন্য ঐ পলায়নপর অফিসার বা জোয়ানদের দোষ দেয়া যায় না। বরং শ্রীলংকাতে যেভাবে হুড়োহুড়ি করে কোনমতে প্রশিক্ষণ দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করা হয়েছে, তাতে তাদের কঠোর শৃংখলার মান বজায় রাখা সম্ভব নয় এবং এ কারণেই ঘটেছে বিশৃংখলা।

অনেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ববর্তী বিশৃংখল ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন, বলতে পারেন আমাদের সশস্ত্র বাহিনীও মার্শাল ল' জারী করেছে; অনেক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। হ্যাঁ, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে কেউ যদি একটু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করেন তা হলে দেখবেন, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর যে বিপ্লবের সূচনা হয় তার উদ্যোক্তা ছিল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অফিসারবাহিনীর পিপলস্ আর্মি গঠন। এ উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়ে তারা খালেদ মোশাররফের প্রতিবিপ্লবী ক্যু'র পাল্টা ক্যু করলেন বটে, কিন্তু তারা যে হারে অফিসার হত্যা শুরু করেছিলেন তা কল্পনাতীত। এর ফলে পুরো সেনাবাহিনীর কমান্ড ভেঙ্গে পড়ে।

জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর ইস্পাতকঠিন মনোবল ও সুযোগ্য নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছিলেন ঠিকই কিন্তু একবার সৈনিকদের মনে বসে যাওয়া আবেগ ও গণবাহিনী চেতনা তাঁর (জিয়া) আমলেই অন্যূন ২১টি ক্যু'র জন্ম দিয়েছিল।

আজ অনেক কঠোর কঠিন সময় পেরিয়ে তবেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনী একটি সুশৃংখল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে, অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক সুনাম। এসবই সম্ভব হয়েছে নিয়মিত বাহিনীর গঠনশৈলীর স্বাতন্ত্র্যের জন্য। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশে যে কোন বিবেচনাতেই গণবাহিনী গঠনের চেয়ে নিয়মিত প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন অনেক শ্রেয় ও যুগোপযোগী। তবে আমাদের অর্থ-সম্পদ, রাজনৈতিক অবস্থা, দেশের আকার-আয়তন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হবে সশস্ত্র বাহিনীর আকার, সমরাস্ত্রের সংখ্যা ও প্রকৃতি এবং নিরাপত্তানীতি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোয় গণবাহিনী গঠন করা যুক্তিযুক্ত নয়। যদিও আর্থিক দিক দিয়ে ও বিপুল জনগোষ্ঠীর আলোকে আপাতঃ মনে হতে পারে আগ্রাসী শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রতিটি সক্ষম নাগরিককে হতে হবে সৈনিক; কিন্তু এ ধারণা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে প্রথমেই চাই জাতীয় ঐকমত্য ও একটি সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণত না হলেও আংশিক রেজিমেন্টেড। জেনারেল ওসমানীর ভাষায়, তাই প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন অতিসতর্ক মূল্যায়ন, সর্বোচ্চ জাতীয় রাজনৈতিক পর্যায়ে সমন্বয় বিধান ও পর্যালোচনা।

অথচ, আমাদের এখানে যারা গণবাহিনীর কথা বলেন, তারা সেই পঞ্চাশ-ষাট দশকে চীনের মাও সেতুং ও ভিয়েতনামের জেনারেল গিয়াপের ফর্মুলার বাইরে কিছু চিন্তা করতে পারেন না। কিন্তু আজ আর সেই যুগ নেই, নেই সমাজতান্ত্রিক সমাজকাঠামো প্রতিষ্ঠার সুযোগ। লাল ঝান্ডার ইউটোপিয়া গত হয়েছে বহুদিন।

এদিকে, গণবাহিনী তৈরী করার পর প্রতিরক্ষা খাতে খরচ বাড়বে না কমবে- সে বিষয়ে এ মতের সমর্থকরা একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে নাজিম কামরান চৌধুরী তার 'বাংলাদেশ ঃ রাজনীত, অর্থনীতি ও সশস্ত্র বাহিনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'গণবাহিনী গঠনের ফলে কি ব্যয় কমে যাবার বদলে উল্টো বেড়ে যাবে? প্রথমতঃ জনশক্তি ভিত্তিক করে তুলতে পারলে ব্যয় যথেষ্ট বেঁচে যাবে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে যুবশক্তি সংগঠন, স্বাস্থ্য, কৃষি ও অন্যান্য সামাজিক খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে যা থেকে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সেসব কর্মকান্ড আরো সমন্বিতভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে...' অর্থাৎ এখানে জনগণকে সামরিক অবকাঠামোয় এনে সেই তাদের দ্বারাই উৎপাদনশীল কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় নির্বাহ তো কমাবেই বরং এ সাথে অন্যান্য খাতেও সুফল পাওয়া যাবে। এখন এ ধরনের প্রতিরক্ষা কাঠামোকে কি আদৌ পূর্ণমাত্রার যুদ্ধকাঠামো বলা যাবে? না-কি

এরা অভিহিত হবে 'উৎপাদনশীল সেনাবাহিনী' হিসেবেঃ এ ধরনের উৎপাদনশীল সেনাবাহিনীর কথা বলেছিলেন সামরিক শাসক লে. জে. এরশাদ। ১৯৮২ সালে ক্ষমতা দখল করার আগে ১৯৮১ সালের ২৯ শে নভেম্বর সন্ধ্যায় সেনাভবনে জাতীয় দৈনিক ও সংবাদ সংস্থাসমূহের সম্পাদকদের সমাবেশে বিবৃতিদানকালে তিনি বলেছিলেন,

> 'আমাদের মতো একটি দরিদ্র দেশে এমন চমৎকার একটি বাহিনীর সম্ভাবনা ও ক্ষমতা, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় তার দায়িত্ব পালন ছাড়াও উৎপাদন ও দেশ গড়ার কাজে লাগানো যেতে পারে......'

এছাড়াও সম্পূর্ণরূপে গণবাহিনী গঠনের পক্ষে মত না দিলেও জে. এরশাদের তৎকালীন ভাষ্য ছিল,

> 'আমাদের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ সমরশক্তির স্থানে বিপুল জনশক্তিকে ফলপ্রসূ বিকল্পরূপে প্রতিস্থাপন করতে হবে। আমাদের সীমান্ত রক্ষায় সক্ষম শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের জন্য তাই আমাদের প্রয়োজন লাখ লাখ শিক্ষিত সৈনিক।'

জে. এরশাদ তার বিবৃতিতে জনভিত্তিক প্রতিরক্ষার কথা বলায় সে সময় অনেকেই এ মতবাদকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের মত বুর্জোয়া, গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে জনমানস অসচেতন, আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞ, সেখানে এরূপ জনভিত্তিক প্রতিরক্ষার প্রতিবাদ করে শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের তদানীন্তন সেক্রেটারী এক বিবৃতিতে বলেন,

> '....বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে একটি উৎপাদনশীল সেনাবাহিনী গড়ে তোলা অবাস্তব। দেশের সেনাবাহিনীকে গণবাহিনীতে পরিণত করতে হলে সামগ্রিক সমাজ কাঠামো পাল্টাতে হবে এবং শুধু সেনাবাহিনীর নয়, সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে।'

এই কাংখিত সমাজকাঠামো হতে হবে রেজিমেন্টেড, যা এদেশে কখনো অর্জন করা সম্ভব হয়নি এবং এখন তা মোটেও সম্ভব নয়। এমনকি লে. জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখলের পূর্বে গণবাহিনী ধারণার কথা বললেও তিনি তার সুদীর্ঘ নয় বছরের শাসনামলে একবারও গণবাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। কারণ, তিনি ভালোভাবেই জানতেন ও বুঝতেন যে, দেশের ১০০% লোক যেমন তার মতাদর্শের সাথে একমত হবেন না, তেমনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ত্যাগ না করলে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী মহলও তার সাথে দেশের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসবেন না। এছাড়া বিপুল জনগোষ্ঠীকে প্রতিরক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করলেও তা পুরো সমাজ কাঠামোয় উল্টো বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। তাই এরূপ বাহিনী গঠনের কখনো উন্মুক্ত করেননি জে. এরশাদ।

এদিকে প্রতিরক্ষা খাতে নিয়মতান্ত্রিক বাহিনী সম্পর্কে যে প্রশ্নটি সকলে করে থাকেন, তা হলো সশস্ত্র বাহিনীর পিছনে অর্থ ব্যয় করা সম্পূর্ণই অনুৎপাদনশীল খাতে অর্থব্যয়ের শামিল এবং যদি অর্থ ব্যয় করা হয়ও তা হলে কেন এমন কোন উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে না, যেখানে সশস্ত্র বাহিনী নিজের খরচ নিজেরা চালাতে পারবে। গণতান্ত্রিক দেশে

এ ধরনের আবেগমথিত কথাবার্তা হুজুগে ছাড়া কিছু না হলেও এ ব্যাপারে আমরা সম্যক আলোকপাত করতে পারি। এ পর্যন্ত বলে আসা হয়েছে যে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী শুধু ব্যয় করে, দেশকে কিছু দেয় না, কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করছি, আমাদের এই ছোট সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাই ১৯৯৪-'৯৫ অর্থ বছরে রেমিটেন্স হিসেবে বিদেশ থেকে দেশে পাঠিয়েছে প্রায় ৮শ' কোটি টাকা।[৩২]

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর বাংলাদেশী সদস্যরা এ অর্থ পাঠায়। এই ৮শ' কোটি টাকা সেই অর্থবছরে বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত ১৯৩৫ কোটি টাকার প্রায় অর্ধেকের মত। আমাদের বাহিনী সুদক্ষ, সুপ্রশিক্ষিত ছিল বলেই তারা বিদেশে যেতে পেরেছে এবং কর্মক্ষমতার প্রমাণ রেখে অর্থও উপার্জন করতে পেরেছে। আসলে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও যদি একটি সুদক্ষ নিয়মিত বাহিনী 'লালন-পালন' করা যায়, তা হলে তা প্রয়োজনে যেমন কাজে দেয়, তেমনি ইচ্ছে হলে, আর্থিক সংস্থান হলে তা আকারেও সহজে বাড়ানো যায়। যেমন- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী প্রচুর অর্থ আয় করায় এখন তাদের সমরাস্ত্র ও সার্বিক অবস্থান অনেক আধুনিক, চাকচিক্যময় এবং সরকারও দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে উন্নতির সাথে সঙ্গতি রেখে আধুনিক সমরাস্ত্র সংগ্রহে মনযোগ দিতে পারেন। আগে যে কম্প্যুটারাইজড ট্যাংক, মাইন স্যুইপার, মিসাইলবাহী ফ্রিগেটের চিন্তা করা যেতো না আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য, এখন সে সবই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এ উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে আরো জোরদার হবে। অর্থাৎ একসময় আমরা যে আমাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর আওতায় একটি আধুনিক ও মোটামুটি আকারের সশস্ত্র বাহিনী গঠন করতে পারব তা জোর দিয়ে বলা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলে নেয়া ভাল যে, একটি নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী তার আপন অবকাঠামো ও গন্ডির মধ্যে থেকে নিজ খরচ চালানোর মত সম্পূর্ণ অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম না হলেও একটি মোটা অংকের অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ টানতে পারি। ইন্দোনেশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী আসিয়ান দেশগুলোর মাঝে অন্যতম সুপ্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ সশস্ত্রবাহিনী। গণবাহিনী কনসেপ্টের দিকে ঝুঁকে না পড়লেও ইন্দোনেশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে ব্যাপক পরিসরে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। এর মাঝে যেমন রয়েছে সমরাস্ত্র উৎপাদন এবং রফতানী, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন খামার পরিচালনা। এগুলো তারা নিজেরাই চালায় ও এর লাভ শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর হিসেবে জমা হয়। ফলে ইন্দোনেশিয়ায় সশস্ত্র বাহিনীর ব্যয়নির্বাহের এক বিরাট অংশ আসে স্বয়ং সশস্ত্র বাহিনী থেকেই। কিন্তু এরূপ ব্যবসা করতে গিয়ে তারা কখনো নিজস্ব গন্ডি থেকে বের হয়ে আসে না, সমাজে মিশে যেতেও চায় না এবং সমাজও তাদের উপর হস্তক্ষেপ করে না।

মূলত সশস্ত্র বাহিনী গণতান্ত্রিক অবকাঠামোয় এমনি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যার গণতন্ত্রের স্বার্থে যেমন সিভিল সমাজ থেকে আলাদা থাকা প্রয়োজন, তেমনি পেশাগত উৎকর্ষতা

৩২। *দৈনিক দেশজনতা* ১১/৪/৯৬ সংখ্যা

বজায় রাখার জন্যও সেনা সদস্যদের ইউনিফর্ম পরে আর দশজন সাধারণ মানুষের মত পানের দোকানে বসে পান চিবানো সাজে না। বিচার বিভাগ ও বিচারকদের যেমন সুষ্ঠু, পক্ষপাতহীন, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উন্মুক্ত সমাজে মিশে যেতে দেয়া হয় না বরং বিশেষ গন্ডির মাঝে আবদ্ধ রাখা হয়, তেমনি সেনা সদস্যদেরও সমাজের যাবতীয় দুর্নীতি, ক্লেদ, অস্থিতিশীলতা থেকে দূরে রাখা বাঞ্ছনীয়।

একথা সত্য, দেশের আপামর জনগণ নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন না হলে সার্বিকভাবে আগ্রাসী শত্রুর যাবতীয় আগ্রাসন মোকাবিলা সক্ষম নয় এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন এবং এর কাজকর্ম সম্পর্কে ধারণা না থাকলে তারা প্রয়োজনের সময় যেমন সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করতে পারবে না, তেমনি স্বাভাবিক সময়েও তাদের ভুল বুঝবে। কিন্তু তাই বলে সকল সক্ষম নাগরিককে এখনি পরিপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার কোন প্রয়োজন বা সঙ্গতি বাংলাদেশের আছে বলে মনে হয় না। এতে যে বিপুল অংকের অর্থ প্রয়োজন, তা একটু হিসেব করলেই বোঝা যাবে। ধরা যাক, এক বছরে ৫ লাখ যুবককে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হলো। এ জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে নিম্নলিখিত সুবিধাদি ও সরঞ্জামের। এগুলো হচ্ছে ঃ

১। দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির ও বাসস্থান তৈরী করতে হবে এবং এই শিবিরগুলোকে হতে হবে অনেকটা স্থায়ী প্রকৃতির। কারণ, এখানে প্রতিবছরই সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন পড়বে। অথচ বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে ফাঁকা পর্যাপ্ত জায়গার অভাব। সে জন্য বর্তমান সশস্ত্র বাহিনীর মেশিনগান ফায়ার, ট্যাংক, রকেট ফায়ারের জন্য কেবলমাত্র চট্টগ্রাম হাটহাজারীতে ফায়ারিং রেঞ্জ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সুদূর রংপুর, যশোর, বগুড়া অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশ থেকে ট্রেনে করে সৈন্যদের এ জন্য হাটহাজারীতে যেতে হয় প্রচুর পয়সা খরচ করে। অথচ, এসব ফায়ারিং-এ অভিজ্ঞ হওয়া ছাড়া একজন সৈনিক হওয়া যায় না, আর মিসাইল ফায়ার তো দূরের কথা। এমতাবস্থায় ৫ লাখ, ১০ লাখ যুবকের প্রশিক্ষণের জন্য স্থান সংকুলান হবে কোথায়? আর হলেও এত পয়সা খরচ করে এত ফায়ারিং রেঞ্জ সরকার বানাবে কিভাবে? এমনকি শুধুমাত্র রাইফেল ফায়ারের জন্যও প্রয়োজন বিস্তর আয়োজন।

২। পাঁচ লাখ লোককে ন্যূনতম সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে প্রয়োজন হবে ন্যূনতম তিন মাস সময়ের। প্রশিক্ষণার্থীদের তিনবেলা খাওয়া প্রয়োজন। যদি প্রতিদিন খাওয়ার পিছনে আমরা ৫০ টাকা খরচও ধরি, তা হলে দিনপ্রতি টাকার প্রয়োজন দু'কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা। তিন মাসে অর্থাৎ ৯০ দিনে দরকার দু'শো পঁচিশ কোটি টাকার। এছাড়া অন্যান্য খরচাদি যেমন যাতায়াত, বাসস্থান, বিনোদন তো আছেই।

৩। এদিকে প্রশিক্ষণের জন্য মৌলিক প্রয়োজন পোশাক, অস্ত্র ও গোলাবারুদ। এখাতে পোশাক প্রয়োজন পাঁচ লাখ, যার প্রতিটির মূল্য কম করে হলেও পাঁচশত টাকা। সর্বমোট প্রয়োজন পঁচিশ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, রাইফেল প্রয়োজন হবে পাঁচ লাখ। অবশ্য যদি পাপেট আর্মি বানালেই চলে,

তা হলে রাইফেলের জায়গায় বাঁশের লাঠি হলেও ক্ষতি নেই! কিন্তু গণবাহিনীর উদ্যোক্তাদের কথা শুনে মনে হয় তারা একটা 'ডেডলি-ডেভিল' আর্মিই বানাতে চান। অতএব পাঁচ লাখ রাইফেল লাগবেই। এই পাঁচ লাখ রাইফেলের দাম প্রায় সাড়ে চার থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা।

এরপর আসে গোলাবারুদের প্রশ্ন। একজন সাধারণ সিভিলিয়ানকে রাইফেল চালনায় মোটামুটি পারদর্শী করার জন্য পাঁচশ' গুলী কমপক্ষে খরচ করতে হবে। একটি গুলীর বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় উৎপাদন মূল্য ২১ টাকা (১৯৮৮ সালের হিসাবে)। পাঁচ লাখ সৈনিকের জন্য প্রয়োজনীয় পঁচিশ কোটি গুলীর মূল্য দাঁড়ায় পাঁচশ' পঁচিশ কোটি টাকা।

এছাড়া এই পাঁচ লাখ যুবককে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য হাজার হাজার প্রশিক্ষিত সেনা কর্মকর্তা, সৈনিকেরও প্রয়োজন। যদিও আমাদের বর্তমান সশস্ত্র বাহিনী উপযুক্ত অর্থ পেলে পাঁচ লাখ লোককে অনায়াসেই প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

এভাবে প্রতিবছর যদি একবারও আমরা পাঁচ লাখ করে যুবককে প্রশিক্ষণ দেই তা হলে আমাদের হাজার হাজার কোটি টাকা তো খরচ হবেই, বরং প্রশিক্ষণের পর এসব যুবককে উপযুক্ত জায়গায় নিয়োজিত করতে হবে। তিনমাস প্রশিক্ষণের পর একবছরে সময় থাকছে নয় মাস। ধরা যাক তারা দু'বছর বাইরে উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত থাকলো, কিন্তু তারপর আবার তাদের রিফ্রেশার ক্যাডার বা পুনঃ কোর্সে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। না হলে আগে যা শিখেছিল তা তারা ভুলে যাবে।

মাত্র পাঁচ লাখের চিন্তায় মশগুল থাকলেই চলবে না। ইতোমধ্যে আরো অনেক 'পাঁচ লাখ'কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অর্থাৎ এই চক্র চলতেই থাকবে। এরকম অবস্থায় যদি পয়সার অভাবে বা অন্য কোন কারণে এই প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে ক্রমাগত অনুশীলনের মধ্যে রাখা না যায় তা হলে লাভ কি? আজ যুদ্ধকৌশল, অস্ত্রপাতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে।[৩৩] আসলে সেনা প্রশিক্ষণ এমনি একটি ব্যাপার যা প্রশিক্ষণ নিতে হবে ধারাবাহিকভাবে এবং এটি একটি ক্রমচলমান ধারা। এতে একবার 'ক্ষণিকের' জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে তা 'অফ' কর দিলে মোটেও কোন ফল লাভে সমর্থ হবে না।

এদিকে পিপল্‌স আর্মি নয়, নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী চাই। উপরোক্ত কথায় অনেকেই হয়

৩৩। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলা যায়। লেখক দীর্ঘমেয়াদী বা লং কোর্সের অফিসার ক্যাডেট হিসেবে দু'বছর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমীতে। পরপর দু'টার্ম এ্যাপয়েন্টমেন্টসহ ক্রসবেল্ট নিয়ে কমিশন পান প্রথম দশজনের একজন হয়ে। এরপর সিগন্যাল কোরে এক বছর টেলিকমিউনিকেশনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন যশোরের সিগন্যাল স্কুলে। সেখানেও যথেষ্ট ভাল রেজাল্ট করার পর ইন্সট্রাক্টর হিসেবে রিকমেন্ড করা হয় কোর্স রিপোর্টে। তারপর সিলেটের ইনফ্যান্ট্রি স্কুলে স্মল আর্মস কোর্সেও মার্কসম্যান হিসেবে নাম উঠে আসে। অথচ, আজ অবসর নেয়ার মাত্র চৌদ্দ বছরের মাথায় অস্ত্রপাতির ধরন-ধারণ, টেকনিক্যাল ব্যাপার প্রায় ভুলে গেছেন, সব ভাসা ভাসা মনে আসে। এমনকি সিগন্যাল কোরের অফিসার থাকার পরও ওয়্যারলেস কম্যুনিকেশনের বেশিরভাগ তত্ত্বই এখন মনে নেই। এখন যেসব অস্ত্র, রেডিও কম্যুনিকেশন যন্ত্রপাতি বাংলাদেশ আর্মিতে এসেছে তা এই সেদিনও লেখক কল্পনা করতে পারতেন না।

তো দ্বিমত পোষণ করবেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সাম্প্রতিক বিশ্বে কোথাও পিপল্‌স আর্মি কনসেপ্ট কার্যকরী নেই। রাষ্ট্রের সকল সক্ষম নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার অর্থই কেবল পিপল্‌স আর্মি'র প্রতি নির্ভরতা বোঝায় না। পিপল্‌স আর্মি প্রসঙ্গে ইসরাইল, ভিয়েতনামসহ অন্যান্য যে দেশের উদাহরণ দেয়া যায় সে দেশে কিন্তু (এখন) কখনোই পুরোপুরিভাবে কেবলমাত্র পিপল্‌স আর্মি'র উপর নির্ভর করা হয় না বরং এসব দেশে নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মূলত একটি শক্তিশালী স্ট্যান্ডিং আর্মির উপর নির্ভর করা হয় যেখানে খুব বেশী প্রয়োজন না হলে সিভিলিয়ানদের এ্যাকটিভ সার্ভিসে ডাকা হয় না। এছাড়া গণবাহিনী তৈরীতে বিপুল অংকের যে হিসেব পূর্বে দেয়া হয়েছে ইসরাইল, ভিয়েতনামে সে খরচ এসেছে বাইরের শক্তি বা বন্ধুর কাছ থেকে যা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে ইসরাইল, ভিয়েতনামে একটি শক্তিশালী প্রচলিত সশস্ত্র বাহিনী থাকার পরই কেবল ভিন্ন কিছু চিন্তা করা হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি পিপল্‌স আর্মি কনসেপ্ট মানতেই হয় তাহলেও কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে অনুরূপ একটি কনভেনশনাল সশস্ত্র বাহিনীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাবে না।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো বাংলাদেশের জাতীয় ক্ষমতা প্রতিফলনের প্রকরণগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যে খুব একটা বিশাল বাহিনী পুষতে হবে তাও নয়। বরং বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় একটি 'সহনীয় মাত্রার' সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও লালন-পালনের উদ্দেশ্য হবে মূলত এ উপমহাদেশে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা ও এর মাধ্যমে যে কোন সম্ভাব্য আগ্রাসনকে নিরুৎসাহিত করা।

আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকা বা অবস্থান আপাতদৃষ্টিতে হয় তো অনেককেই অবাক করে দেবে- এতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বর্তমান অবস্থান যে কিভাবে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষায় মোটামুটি উল্লেখযোগ্য-তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় স্বয়ং একজন ভারতীয় জেনারেলের ভাষ্য হতে। ভারতীয় লে. জে. এ. এম. ভোহরা'র মতে,

> "বাংলাদেশ যদিও প্রত্যক্ষভাবে ভারতের প্রতি কোন হুমকি প্রদর্শনে সক্ষম নয়, কিন্তু ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশ যেভাবে চীন ও পাকিস্তানের সাথে সামরিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে তাতে ভারতীয় প্রতিরক্ষাবিদগণের দৃঢ়বিশ্বাস যে, চীন বা পাকিস্তানের সাথে ভারতের যে কোন সম্ভাব্য যুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তার বর্তমান শক্তি নিয়ে খুব সহজেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক বিশাল অংশকে নিষ্ক্রিয় করে তুলবে" [৩৪]

সুতরাং একথা বলা মোটেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বাংলাদেশে একটি প্রচলিত প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে এবং এর বর্তমান শক্তি সময়ানুযায়ী বৃদ্ধি করাই হবে যুক্তিসঙ্গত।

৩৪। Lt. Cen A.A. Vohra, *'The military threat in the 1980s'* USI Seminar, No. 8, held on January 30, 1981, p. 23

নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী'র অবকাঠামো

বাংলাদেশে একটি কার্যকরী সশস্ত্র বাহিনী সংগঠন নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে রণনীতি প্রণয়নে বাংলাদেশের কতিপয় 'দুর্বলতা'র প্রতি। এগুলো হচ্ছে ঃ

১। বাংলাদেশের সীমান্তের প্রায় তিনদিক ঘিরে রয়েছে ভারত। যেখানে ৯২.৫ ভাগ সীমান্ত হচ্ছে সেদেশের সাথে।

২। এদেশের কৌশলগত গভীরতা বা Strategic Depth নেই বললেই চলে।

৩। নদ-নদী যেমন প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনায় সহায়তা করেছে, তেমনি সরবরাহ ব্যবস্থাকেও করে তুলেছে দুরূহ। এর ফলে সমন্বিত কমান্ড চ্যানেলও ভেঙ্গে পড়তে পারে তাসের ঘরের মতো।

৪। ঘনবসতির কারণে যে কোন ব্যাপক সংঘর্ষ বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৫। সমরাস্ত্র উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা অপ্রতুল।

এই দুর্বলতাগুলো ছাড়াও বাংলাদেশের আরো অগণিত দুর্বলতা রয়েছে যা যে কোন মানদন্ডেই একটি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। এসব দুর্বলতাকে সামনে রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তবে সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরীতে লিপ্ত একটি বিশেষ মহল।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর রূপরেখা কেমন হবে, সে প্রসঙ্গে ক'জন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা ও প্রতিরক্ষা গবেষকের সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো ঃ

সেনাবাাহিনী (Army)

এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই আলোকপাত করতে পারি সেনাবাহিনী বা Army প্রসঙ্গে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে ৭টি সেনা ডিভিশন, যেগুলোর অবস্থান হলো সাভার, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রংপুর ও যশোরে। এসব ডিভিশনের ৫টিতে এখন রয়েছে একটি করে ট্যাংক রেজিমেন্ট বা আর্মার্ড ব্রিগেড ও দু'টিতে স্কোয়াড্রন। এদিকে ৭টি ডিভিশন ছাড়াও সেনা কমান্ডের আওতায় বেশক'টি স্বতন্ত্র ব্রিগেডও রয়েছে। ট্যাংক ও আর্টিলারী শক্তির বিবেচনায় বলা যায়, বর্তমানে যে সংখ্যক ট্যাংক আমাদের রয়েছে তার অনেকগুলো কম্পিউটারাইজড, যদিও এ সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। তবে বাংলাদেশের ভূমি বিবেচনায় খুব একটা যে কম আছে তাও বলা যাবে না। ট্যাংকের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে এতে কোন সন্দেহ না থাকলেও এ সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এমন অতিরিক্ত সংখ্যক ট্যাংক আনার প্রয়োজন

নেই, যে ট্যাংকগুলো চালাবার বা মোতায়েন করার জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, অনেক সিনিয়র প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকের মতে, বাংলাদেশের নরোম ভূমিতে ট্যাংকেবল টেরেইন খুব একটা নেই। যদি ভবিষ্যতে ডিভিশনের সংখ্যা বাড়ানো হয় তা হলে বিশেষজ্ঞদের মতে, সর্বমোট প্রায় পাঁচশ'র মতো ট্যাংক থাকাই বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। এতে ক'টি ডিভিশনে বর্তমানের চেয়ে অতিরিক্ত একটি আর্মার্ড ব্রিগেড গঠন করা যেতে পারে। বিশেষ করে যশোর, কুমিল্লা ও ভবিষ্যত সম্ভাব্য ডিভিশন দর্শনা, ঠাকুরগাঁও এলাকায় নতুন ট্যাংক রেজিমেন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে ৭টি ডিভিশন রয়েছে এই ৭টি ডিভিশন অনেকের মতে 'যথেষ্ট' হলেও অন্তত ১০টি ডিভিশন আমাদের প্রয়োজন। এই অতিরিক্ত ৩টি ডিভিশনের সম্ভাব্য অবস্থান হতে পারে কুষ্টিয়া এলাকার দর্শনাকে সামনে রেখে, তেতুলিয়াকে লক্ষ্য করে ঠাকুরগাঁও এলাকায়, অপরটি সিলেটে।

স্মর্তব্য, বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, দিগন্ত বিস্তৃত গাছ-পালা, নদ-নদী, নালা-ডোবা লক্ষ্য করে প্রতিটি ডিভিশনে বিশেষ অপারেশন চালানোর জন্য অন্তত একটি করে কমান্ডো রেজিমেন্ট সংযুক্ত করা আবশ্যক বলেও বিশ্লেষকদের অভিমত।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যে দিকে আজো খুব একটা নজর দেয়া হয়নি তা হচ্ছে আর্টিলারী ও সিগ্‌ন্যালস্-এর ক্ষেত্রে। বিশেষ করে আমাদের এয়ার ডিফেন্স ব্যবস্থা অপ্রতুল আর ইলেকট্রনিক যুদ্ধ সম্পর্কেও আমাদের মাঝে এখনো কোন আগ্রহ জাগেনি। এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিটি ডিভিশনে পর্যাপ্ত বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা থাকার পাশাপাশি সিগন্যাল ইউনিটগুলোর ইলেকট্রনিক যুদ্ধ সরঞ্জামও মওজুদ করতে হবে।

সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কোর কিভাবে সু-সজ্জিত করা যেতে পারে, সে প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ না করেও আমরা অন্তত এটুকু বুঝতে পারছি যে, যদি কখনো ভারত তার সর্বশক্তি নিয়ে বাংলাদেশে আগ্রাসন পরিচালনা করেই বসে তা হলে ভারত হয় তো ১২ কোটি জনতার বাংলাদেশকে সার্বিকভাবে পদানত করতে পারবে না ঠিকই কিন্তু কারো সক্রিয় সহায়তা বা জোটবদ্ধতার সুযোগ ছাড়া একা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে সে আক্রমণ সীমানার ওপারেই পুরোপুরি ঠেকিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। বরং এক্ষেত্রে কনভেনশনাল পদ্ধতির মারপ্যাঁচে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সরবরাহ ও কৌশলগত গভীরতার অভাবহেতু সীমানাব্যাপী কিছুটা বিশৃংখল পরিস্থিতির শিকার হতে বাধ্য। এ পর্যায়ে একেকটি ডিভিশন ঢাকাস্থ সেনা কমান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এর ফলে তারা সীমান্তে পুরোপুরি প্রচলিত যুদ্ধরীতি অনুসরণ করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না। এমন পরিস্থিতিতে কি করা যেতে পারে? উত্তরে বলা যায়, আমাদের সেনাবাহিনীর অবয়ব স্ট্যান্ডিং আর্মির মতো থাকবে ঠিকই কিন্তু বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বিবেচনায় প্রতিটি ডিভিশন, প্রয়োজনে প্রতিটি ব্রিগেডের কমান্ড নেটওয়ার্ক, সরবরাহ ব্যবস্থা, অস্ত্র,

গোলাবারুদ ও মওজুদের ব্যবস্থা হতে হবে স্বতন্ত্র ও পর্যাপ্ত। এক্ষেত্রে সাবেক সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম বিশেষ ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন বলে জানা যায়, সে তত্ত্ব মতে,

প্রথমত; বাংলাদেশকে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন খন্ডাংশে ভাগ করা হবে।

দ্বিতীয়ত; যুদ্ধাবস্থায় ব্যবহারের জন্য এলাকাসমূহের বিশেষ স্থানে (গোপনীয়) পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ মওজুদ রাখতে হবে যার অবস্থান মুষ্টিমেয় কিছু উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা জানবেন।

তৃতীয়ত; যুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে আঞ্চলিক ডিভিশন বা ব্রিগেডের একাংশ সম্মুখবর্তী এলাকায় শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবে এবং ঐ সময়টুকুতে উপরোক্ত গোপন স্থান থেকে বাদবাকী সৈন্যরা অস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহ করে স্বতন্ত্রভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

চতুর্থত; সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য দেশব্যাপী সেকেন্ড লাইন ফোর্স হিসেবে আনসার, ভিডিপি, পুলিশ ও বিডিআর সদস্যদেরও গোপন অস্ত্রভান্ডার থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্র সজ্জিত করা হবে।

উল্লেখ্য, জে. জিয়াউর রহমান প্রায় ৭ লাখ সদস্যের আনসার, ভিডিপি বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন যাদের অন্তত বেসিক সেনা প্রশিক্ষণ থাকবে এবং যারা প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর পদাতিক রেজিমেন্টের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে অনায়াসে। এক্ষেত্রে এদের স্বাভাবিক সময়ে কিন্তু অস্ত্রসজ্জিত করার কথা বলা হয়নি।

পঞ্চমত; আঞ্চলিক ও বিশ্ব পরিমন্ডলে এমন দেশের সাথে জোটবদ্ধ হতে হবে বা মিত্রতা গড়ে তুলতে হবে-যে বা যারা যে কোন আগ্রাসনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে যেমন সামরিক সাহায্যে এগিয়ে আসবে, তেমনি বিশ্ব জনমতকেও করবে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল।[৩৫]

এদিকে লে. জে. মীর শওকত আলী, বীর উত্তম বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট জিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে যে ধারণা উপস্থাপন করেছেন, সে ব্যাপারে অপরাপর বিশ্লেষকেরও অনেকটা একইরূপ ধারণা পোষণ করতে দেখা যায়। বিশেষ করে একটি কার্যকরী স্ট্যান্ডিং আর্মির পাশাপাশি ব্যাপকমাত্রায় পিপলস্ আর্মি কনসেপ্ট কাজে না লাগিয়েও জে. জিয়া যেভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতি বা জাতীয় নিরাপত্তা চেতনার সাথে সীমিত পরিসরে হলেও জন সম্পৃক্তি গড়ে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন, বস্তুতপক্ষে তা-ই হতে পারে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশ "সশস্ত্র বাহিনীকে মূলত রক্ষণাত্মক যুদ্ধকৌশলের উপযোগী করেই সংগঠিত, প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত করা হয়েছে"।[৩৬]

৩৫। লেখকের সাথে লে. জে. মীর শওকত আলী, বীর উত্তম-এর সাক্ষাৎকার

৩৬। Major M.R. Chowdhury, *'The military and political power projections'*, Bangladesh Army Journal, Vol. 11, December 1987, p. 66

পাশাপাশি প্রকৃতিগতভাবেই বাংলাদেশের নিরাপত্তা রক্ষায় বা যে কোন যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবে। যেগুলো হলো ঃ

১। বাংলাদেশের কোন কৌশলগত পশ্চাদভূমি বা Strategical Depth নেই। দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তের দূরত্ব বা গভীরতা খুবই কম যা যে কোন কনভেনশনাল বা প্রচলিত যুদ্ধে এদেশের নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যাপক অসুবিধায় ফেলে দেবে। আবার তিন দিক বেষ্টন করে 'সম্ভাব্য শত্রু'র সীমান্ত থাকায় ঐ ২৪০০ মাইলব্যাপী সীমান্ত এলাকায় শত্রু আক্রমণ ঠেকিয়ে দেয়ার মতো লোকবল, সমরাস্ত্র, যোগাযোগ ব্যবস্থাও বাংলাদেশের পক্ষে গড়ে নেয়া সম্ভব নয়।

২। ভারী সমরাস্ত্র বিশেষ করে ট্যাংক, কামান মোতায়েন ও পরিচালনার মত ভূমির অভাব বড় মাপের প্রচলিত যুদ্ধের ক্ষমতা সীমিত করে তুলতে পারে।

৩। ভূমি অনুপাতে জনসংখ্যার ঘনত্বও এদেশে দীর্ঘায়িত প্রচলিত যুদ্ধের অনুকূল নয়।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাই সমরবিদগণ এ ধারণাই দেন যে,

> "It is the stated national policy of Bangladesh that it has no offensive designs. The operational offensive is to be undertaken without loss of much territory while seeking an international political negotiation, which if it fails, calls for an all out unconventional counter-offensive." ৩৭

সহজ ভাষায়, বাংলাদেশের কোন আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা নেই। তবে যুদ্ধকৌশলে আক্রমণাত্মক পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে যাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে (রাজনৈতিক) সমঝোতা প্রক্রিয়া শুরু হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে আমাদের খুব বেশী ভূমি শত্রু দখল করে নিতে না পারে। তবে যদি সমঝোতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় তা হলে আমরা সকল পর্যায়ে সর্বব্যাপী অপ্রচলিত যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করে পাল্টা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

এখানে বলে নেয়া যায় যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমঝোতা বা বন্ধুপ্রতিম দেশের কাছ থেকে সহায়তা লাভের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন সে পর্যন্ত বিশাল শত্রুবাহিনীকে যতটুকু পারা যায় ঠেকিয়ে রাখার জন্যই কিন্তু সাধ্যমত একটি স্ট্যান্ডিং আর্মির প্রয়োজন। এখানে এর সংখ্যা কত হবে ও আমাদের শত্রু কে হতে পারে তা বিতর্কের বিষয় হলেও সাবেক সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্ট লে. জে. এইচ, এম, এরশাদ এনডিসি, পিএসসি এ ব্যাপারে ১৯৯০ সালে বলেন,

> "India is our only adversary and possible source of threat. We need basically 7 Divisions to defend ourselves. Right now, we have 6 Divisions and we feel we can hold our own for 21 days. As you can see, with its hervest network of rivers and natural

৩৭। Mojor A.T.M. Hamidul Hossain, *'Why to be so defensive about our defence'*, Bangladesh Army Journal, Vol. 10, December 1986, p.12

obstacles, Bangladesh is very defensible and certainly not easily accessible to an invading Army. However, we intend to raise one more Division which wil complete our minimum defence requirements."[৩৮]

জে. এরশাদের মতে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৬ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে (১৯৯০ সালের হিসেব) ভারতকে ২১ দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে এবং আরো এক ডিভিশন বেশী হলে চাহিদা মোটামুটি মিটে যায়। তবে ৭ ডিভিশন তত্ত্ব'ই শেষ কথা নয়। বরং একজন মেজর জেনারেল-এর মতে,

"এতদঞ্চলে সামরিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এমন শক্তি সঞ্চয় করতে হবে যাতে ভারতের মত সম্ভাব্য শত্রু এদেশে কখনোই হামলা চালানোর মত সৈন্য সমাবেশ করতে না পারে এবং সে জন্য কমপক্ষে ১০ থেকে ১১ ডিভিশন সৈন্য আমাদের থাকতে হবে।"[৩৯]

তবে সকল প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকই স্বীকার করেছেন যে, ভারত যদি আদৌ কখনো [৪০] ব্যাপক মাত্রায় সামরিক আগ্রাসন পরিচালনা করে তা হলে সম্ভাব্য কৌশল হবে, ".....to mobilise the people and the troops. Bangladesh would engage itself in a kind of 'Vietanm style warfare." [৪১]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এরূপ 'Total National Defence' ধারণার রূপকার ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, যেখানে তাঁর গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী "the Armed Forces would act as the nucleus of people's defence force." [৪২]

এরূপ জনসম্পৃক্ত বা জন কেন্দ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সেনাবাহিনীর 'চীফ অফ স্টাফ ট্রেনিং ডিরেক্টিভ ১/৮২' তে বলা হয়েছে ঃ

"...at a certiain stage we will have to cater for utilising every able bodied person... In the integration and mobilisation of the population and material resources of our country. Our Army.... will form the nucleus for nationwide people oriented resistance."[৪৩]

মোটকথা, জে. জিয়া প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তার হুমকির উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছে ভারতকে এবং ভারতের সাথে যে কোন সংঘর্ষে এর যুদ্ধকৌশল হলো যতটুকু সম্ভব সর্বোচ্চ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ভারতীয় বিশ্লেষকদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই কৌশল সম্পর্কে মত হচ্ছে, "The persent military

৩৮। পূর্বে উল্লেখিত ক্রমিক নং ১৮ দ্রষ্টব্য

৩৯। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা, যিনি লেখকের কাছে সাক্ষাৎকার প্রদানে রাজি না হলেও বলেন, জে. জিয়া এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তার দেয়া তথ্য মতে, চীন ও মুসলিম দেশগুলোর সহায়তায় সে পরিকল্পনা জে. জিয়া বেঁচে থাকলে হয়তো সম্ভব হয়ে উঠতো। সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অপর একজন সিনিয়র ব্রিগেডিয়ারও লেখককে একই ধারণা দিয়েছেন।

৪০। পাকিস্তান বা চীন সীমান্ত থেকে প্রয়োজনীয় সৈন্য না সরিয়ে ভারতের পক্ষে কখনোই বাংলাদেশে আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় ২১ ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশ সীমান্তে সমাবেশ করা হয় তো সহজ ব্যাপার হয়ে উঠবে না। আবার ১০/১২ ডিভিশন সৈন্য নিয়েও বাংলাদেশ আক্রমণ করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়।

৪১। Srikant Mohapatra, *'National security and Armed Forces in Bangladesh.'* Interview with Tobarak Hassain at Dhaka in April 1990, Stategic Analysis, August, 1990, p. 592

৪২। প্রাগুক্ত

৪৩। পূর্বে উল্লেখিত ক্রমিক নং ৩৬ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৬৮

thinking is that they want to make any external intervention very expernsive." [৪৪]

এছাড়া ভারতীয় বিশ্লেষকগণ এও বলেছেন যে, "In case of a conflict with India, its (Bangladesh) armed forces would attempt to harass and delay the Indian troops long enough for international pressure to be brought into play."[৪৫]

অর্থাৎ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাদেশে একটি স্ট্যান্ডিং আর্মি রাখতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। কারণ যদি ৭ থেকে ১০ ডিভিমন সৈন্যের একটি সুসজ্জিত, সুপ্রশিক্ষিত স্ট্যান্ডিং আর্মি থাকে ও সামরিক পর্যায়ে কোন উল্লেখযোগ্য শক্তি যেমন চীন-পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখা যায় তা হলে 'সম্ভাব্য শত্রু' ভারত কখনোই বাংলাদেশে সামরিক এ্যাডভেঞ্চার-এর স্বপ্ন দেখবে না। বলা চলে, স্ট্যান্ডিং আর্মি শত্রু আক্রমণ নিরুৎসাহিত করায় একটি নিবারক শক্তি হিসেবেই বিবেচিত হবে। এর শক্তি-সামর্থ্য বা ব্যাপ্তি খুব যে বড় হতে হবে বা ২০/২২ ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশের থাকতে হবে তা কিন্তু নয়। বরং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি সহনীয় মাত্রার সেনাবাহিনী যেমন ব্যালান্স অফ পাওয়ার রক্ষা করবে, তেমনি প্রয়োজনে জনপ্রতিরোধ-এর নিউক্লিয়াস হিসেবেও কাজে লাগবে। ১৯৭১ সালে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর ৫টি রেজিমেন্ট ২৫ মার্চের পর স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল বলেই তাদের কেন্দ্র করে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছিল। একথাটি নৌ, বিমান বাহিনীর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

এদিকে সমরাস্ত্র খাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

১। চট্টগ্রামস্থ ২৪ পদাতিক ডিভিশন ও রংপুরের ৬৬ পদাতিক ডিভিশন ছাড়া বাকী ৫টি ডিভিশনের প্রতিটিতেই রয়েছে একটি করে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট। এগুলো হলো-সাভারস্থ ৯ পদাতিক ডিভিশন, বগুড়াস্থ ১১ পদাতিক ডিভিশন, যশোরস্থ ৫৫ পদাতিক ডিভিশন, কুমিল্লাস্থ ৩৩ পদাতিক ডিভিশন ও ময়মনসিংহের ১৯ পদাতিক ডিভিশন। বাকী দু'টোয় রয়েছে স্কোয়াড্রন+ট্যাঙ্ক। এসব ট্যাঙ্কের প্রায় সবগুলোই চীনের তৈরী টি-৫৯, টি-৬২ ও টি-৬৯ মডেলের ট্যাঙ্ক। এর মাঝে টি-৬৯ হলো কম্প্যুটারাইজড। বাকী দুটো মডেলের ট্যাঙ্ক অনেকটা পুরনো। এ বিবেচনায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, সেনাবাহিনীর আর্মার্ড রেজিমেন্টের জন্য টি-৫৯ মডেলের ট্যাঙ্কের পরিবর্তে অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক প্রয়োজন এবং যে দুটো পদাতিক ডিভিশনে পূর্ণমাত্রায় রেজিমেন্ট নেই, সেগুলোয় তো বটেই ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে অন্তত যশোর, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের ডিভিশনে অতিরিক্ত একটি সাঁজোয়া রেজিমেন্ট গঠন করা প্রয়োজন।

২। অনেক বিশ্লেষক আবার অতিরিক্ত ট্যাঙ্ক সংগ্রহ না করে সে অর্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ

৪৪। Srikant Mohapatra, *'National security and Armed Forces in Bangladesh.'* Interview with Indian Diplomats at Dhaka in March-April, 1990, Strategic Analysis, August 1991, p-593

৪৫। প্রাগুক্ত

ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী গাইডেড মিসাইল ও অন্যান্য ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী অস্ত্র সংগ্রহের কথা বলেছেন। এঁদের মতে, যেহেতু আমরা আত্মরক্ষামূলক নীতিমালা অনুসরণ করবো তাই শত্রুর ট্যাঙ্ক যাতে বাংলাদেশে সুবিধা করতে না পারে, সে জন্য প্রতিটি সম্ভাব্য 'এ্যাপ্রোচে' যাতে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী পর্যাপ্ত অস্ত্র মওজুদ করা যায়, সেদিকে নজর দিতে হবে।

৩। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সবচেয়ে দুর্বলতম অংশ হচ্ছে আর্টিলারী। বিশেষ করে, বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একেবারে অপ্রতুল বললেই চলে। তাই বেশীর ভাগ প্রতিরক্ষা গবেষকের মতে, সম্প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে বিমান প্রতিরক্ষায়। কারণ, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহকে যেমন অরক্ষিত রাখা যায় না, তেমনি বিমান বাহিনীর বিমান ক্ষেত্রগুলাকেও রাখতে হবে যে কোন শত্রু বিমান আক্রমণ থেকে নিরাপদ। অথচ বর্তমানে মুষ্টিমেয় কিছু বিমান বিধ্বংসী মিসাইল ও সেকেলে কিছু কামান ছাড়া আর্টিলারীর হাতে তেমন কোন অস্ত্র নেই। আধুনিক যুদ্ধে এসব অস্ত্র দিয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামের সীমিত কিছু এলাকা ছাড়া অন্য কিছু রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। এছাড়া আর্টিলারীতে ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য (Surface to Surface) কোন ক্ষেপণাস্ত্র এখনো সংযুক্ত করা হয়নি। সমরবিদদের মতে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ব্যালিস্টিক মিসাইল সংগ্রহ না করেও স্বল্প পাল্লার ট্যাকটিক্যাল মিসাইল সংগ্রহ করতে পারে।

৪। উন্নত কম্যুনিকেশন যন্ত্রপাতি বিশেষ করে ইলেকট্রনিক যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ যাবত বিশেষ কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে ধরে নেয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মূলত এ সম্পর্কে ধারণার অভাবই সেনাবাহিনীর নীতি-নির্ধারক মহলকে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহ জোগাত পারেনি। অথচ আধুনিক যুদ্ধ মানেই ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার। ইরাক-কুয়েত সংক্রান্ত 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মে' ইলেকট্রনিক যুদ্ধের মাধ্যমেই মিত্রবাহিনী ইরাকী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে তছনছ করে দেয়।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ইলেকট্রনিক যুদ্ধ (EW) বিশেষজ্ঞ কম নেই। তবে সমন্বিত পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাবে সেনা কমান্ড কখনোই এদিকে দৃষ্টি দেয়নি। তাই অভিজ্ঞ সিগন্যাল অফিসারদের মতামত নিয়ে EW-এর সরঞ্জাম সংগ্রহই হবে অন্যতম লক্ষ্য।

নৌ বাহিনী (Navy)

এবারে আসা যাক নৌ বাহিনী প্রসঙ্গে। একটি প্রচলিত শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তারপরও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে আমাদের দক্ষিণে বঙ্গপোসাগরের বিশাল এলাকা রক্ষায় নৌ-বাহিনীকে অবশ্যই শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া চট্টগ্রামের ঠিক দক্ষিণে মালাক্কা প্রণালীতে প্রবেশের মুখে ভারতের যে আন্দামান নৌ-বিমানঘাঁটি রয়েছে তা যে কোন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন করে তুলতে পারে। অপরদিকে পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারের মোকাবিলায়ও নৌ-বাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৯১ সালে যখন

মায়ানমারের সাথে আমাদের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল তখন মায়ানমারের চেয়ে অনেকগুণ শক্তিশালী নৌ-বাহিনী থাকায় বাংলাদেশ অনেক শক্তিশালী অবস্থানে ছিল বলে প্রতিরক্ষা গবেষকগণ উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের দেয়া ছোট ও প্রায় মান্ধাতা আমলের কয়েকটি পেট্রোল বোট নিয়ে ১৯৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর জে. জিয়া সর্বপ্রথম শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি মাত্র ৪ বছরের মধ্যে আমাদের নৌ-বাহিনীতে ৩টি ফ্রিগেট ও বেশকিছু সংখ্যক মিসাইল বোট, গান বোট, টর্পেডো বোট সংযুক্ত করতে সক্ষম হন। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে আরো একটি মিসাইল সজ্জিত ফ্রিগেট ও মিসাইল বোটসহ অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজ নৌ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে বেগম জিয়ার শাসনামলে নৌবাহিনীতে সংযুক্ত হয় অত্যাধুনিক মাইন স্যুইপার, সার্ভে জাহাজ, আ'লীগ শাসনামলে অপর একটি সর্বাধুনিক মিসাইল সজ্জিত ফ্রিগেটও নৌ-বাহিনীতে অর্ন্তভুক্ত হয়।

এদিকে নাজিম কামরান চৌধুরীসহ অনেকেই ব্যয়বহুল ও দামী ফ্রিগেট পোষার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন করে থাকেন। একথা সত্য, আমাদের নৌ-বাহিনী কখনোই বড় কনভেনশনাল যুদ্ধ জাহাজের ক্ষেত্রে ভারতের সাথে পাল্লা দিতে পারবে না। কিন্তু একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নৌ-বাহিনীর ক্ষেত্রেও ক্ষমতার ভারসাম্য থিয়োরী প্রযোজ্য। কারণ, ভারত কখনোই তার পূর্ণ নৌ-শক্তি নিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পারবে না অথচ বাংলাদেশ কিন্তু তার সর্বশক্তি নিয়ে আগ্রাসন মোকাবিলা করবে। এ জন্যই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "এ অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই আমাদের নৌ শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে।"

যাহোক, নৌ-বাহিনী প্রসঙ্গে বলতে হয়, অত্যাধুনিক কনভেনশনাল যুদ্ধ জাহাজ যেমন ফ্রিগেট, ডেস্ট্রয়ার সংগ্রহ অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। তবে সবচেয়ে বেশী নজর দিতে হবে ছোট ছোট যুদ্ধ জাহাজ যেমন মিসাইল বোট, গান বোট ইত্যাদির দিকে। কারণ, এগুলো সংগ্রহ করা যেমন সহজ, তেমনি এসবের গতিবেগ ও মোতায়েন যোগ্যতাও অনেক বেশী। যেহেতু আমাদের পক্ষে ভারতের বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ ও অগণিত ফ্রিগেট মোকাবিলা করা দুরূহ তাই ছোট ছোট দ্রুতগতিসম্পন্ন মিসাইলবাহী যুদ্ধ জাহাজের দিকে মনোযোগ দেয়াই উত্তম। জে. জিয়া সম্ভবত এ দিকেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন।[৪৬]

এদিকে মিসাইল বোট জাতীয় যুদ্ধ জাহাজের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ আমরা ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরানী নৌ-বাহিনীর গৃহীত কৌশলের উল্লেখ করতে পারি। উক্ত যুদ্ধে ইরানের বিশেষ কোন বড় যুদ্ধ জাহাজ অপারেশনাল না থাকলেও তারা ছোট ছোট জাহাজ এমনকি একটু বড় আকারের স্পীডবোটে অস্ত্র সংযুক্ত করে ইরাকী নৌ-বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছিল।

সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, কনভেনশনাল নৌ-বাহিনী গঠনের পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব নৌ-যুদ্ধ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে এবং সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে যেমন প্রচলিত-অপ্রচলিত যুদ্ধ কৌশলের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে, তেমনি নৌ-বাহিনীর ক্ষেত্রেও দুটো পদ্ধতির সমন্বয় সাধন অত্যাবশ্যক।

৪৬। পূর্বে উল্লেখিত ক্রমিক ৩৫ দ্রষ্টব্য

বিমান বাহিনী (Air Force)

অনেকের মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে যে প্রচলিত বিমান অবকাঠামো রয়েছে তা ভারতের যে কোন আক্রমণের মুখে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। কারণ, প্রথমত; আমাদের দেশ ছোট, বিমান-বন্দরের সংখ্যাও সীমিত; আবার সকল বিমান বন্দরে যুদ্ধ বিমান উড্ডয়ন, অবতরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সরবরাহ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত সুবিধাদি নেই।

দ্বিতীয়ত; অত্যাধুনিক রাডার ব্যবস্থা থাকলেও বিমানবন্দরসমূহ রক্ষায় কার্যকরী কোন বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। তাই হয় তো দেখা যাবে, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে একবার আমাদের বিমানগুলো আকাশে ওড়ার সুযোগ পেলেও ততক্ষণে ভারতীয় বিমানের হামলায় রানওয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে আকাশে ওড়ার পর যুদ্ধ বিমান আর মাটিতে নামতে পারবে না। এছাড়া সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রসঙ্গ তো রয়েছেই।

উপরোক্ত যুক্তি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। কিন্তু এ পর্যায়েও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ভারত ছাড়া মায়ানমারও তো আমাদের শত্রু হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান বিমান অবকাঠামোর যৌক্তিকতাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে সার্বিক বিবেচনায় আমাদের যেমন বিমান বাহিনীর প্রচলিত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়া যাবে না, তেমনি বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বিবেচনায় ভিন্ন কৌশলও গ্রহণ করতে হবে।

প্রচলিত অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই নজর দিতে হবে উন্নততর যুদ্ধ বিমান ও সরঞ্জাম সংগ্রহের দিকে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব পুরনো বা পরিত্যক্ত বিমান বন্দর বা রানওয়ে রয়েছে, সে সবের সংস্কার করে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দিয়ে সজ্জিত করতে হবে। এদিকে বরিশালে যেরূপ অত্যাধুনিক আন্ডারগ্রাউন্ড বিমান ঘাঁটি তৈরী করার প্রক্রিয়া এগিয়ে গিয়েছিল বেগম জিয়ার বিগত শাসনামলে (যদিও এখন পর্যন্ত অপারেশনাল নয়), তেমনি আরো কিছু বিমান ঘাঁটি তৈরী করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে।

এদিকে, বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী হ্যারিয়ার জাম্প জেট বা VTOL, Vertical Take off and landing বিমান সংগ্রহই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকরী বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কারণ, এসব বিমান উঠানামার জন্য কোন রানওয়ের প্রয়োজন নেই। যে কোন স্থান থেকে এগুলো হেলিকপ্টারের মতো উঠতে ও নামতে সক্ষম। আবার ঝোঁপ ঝাড় ও যে কোন এলাকায় গ্রামে-গঞ্জে এগুলোকে লুকিয়ে রাখা যাবে, যাতে শত্রু পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় এ বিমানগুলো ঠিক কোন্ জায়গায় রয়েছে তা ধরা পড়বে না। বিভিন্ন এলাকায় গোপন সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলে অবস্থাভেদে গ্রামে-গঞ্জের ঝোঁপ জঙ্গলে যে কোন স্থানে (সরবরাহ কেন্দ্রের গন্ডির মধ্যে) আমরা হ্যারিয়ার জাম্প জেট লুকিয়ে রাখতে পারবো। এই বিশেষ বিমানের জন্য কমান্ড চ্যানেল কিরূপ হবে বা এগুলোকে পৃথক বিমান বাহিনী অবকাঠামোর বাইরে সেনাবাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রাখা হবে কি-না, সে প্রসঙ্গে নীতি-নির্ধারণ করবেন উচ্চ পর্যায়ের কৌশলবিদগণ।[৪৭]

৪৭। লেখকের সাথে লে. জে. মীর শওকত আলী ও এভিএম আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২০০০

বিদেশী সহায়তা প্রসঙ্গ এবং কিভাবে, কোথা থেকে অর্থ জোগান আসবে

নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। দেশের ক্রমিক অর্থনৈতিক ও শিল্প অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা হয়। তবে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে তার পক্ষে তড়িৎগতিতে কোন শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ নয়। তাই এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বিদেশী সহায়তা ও জোটবদ্ধতার দিকে নজর দিতে হবে। প্রতিরক্ষা খাতে কোন বৃহৎ শক্তিকে নিজ ভূমি বা অবকাঠামো ব্যবহার করতে দেয়া অনেকের দৃষ্টিতে হয় তো সার্বভৌমত্বের লংঘন কিন্তু একটু নজর দিলেই আমরা এর ভাল দিকটিও উপলব্ধি করতে পারবো। এক্ষেত্রে ২য় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে জাপান, ফিলিপাইন ও কোরিয়ায় মার্কিন উপস্থিতি ও সম্প্রতি মায়ানমারে চীনের সহায়তা প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, জাপান, ফিলিপাইন ও কোরিয়ার নিরাপত্তা প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পৃক্ত হওয়ায় সেসব দেশে যেমন শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবকাঠামো গড়ে উঠেছে, তেমনি প্রতিরক্ষা খাতে যে বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয় সে অর্থ ব্যয় থেকেও উক্ত দেশগুলো রেহাই পেয়েছে এবং সেই অর্থ তারা উন্নয়নের পিছনে ব্যয় করার সুযোগ পেয়েছে।

এদিকে সম্প্রতি চীন মায়ানমারকে তড়িৎ অস্ত্র সজ্জিত করায় শুধু সহায়তাই করেনি বরং এর সমুদ্র উপকূলবর্তী বেশ ক'টি দ্বীপাঞ্চলে যৌথ উদ্যোগে নৌ-বিমান ঘাঁটি গড়ে তোলায় বঙ্গপোসাগর ও মালাক্কা প্রণালী এলাকায় ভারতীয় ও মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের একক প্রচেষ্টাও অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, চীন মাত্র ৫ বছরের ব্যবধানে ১৯৯১-থেকে '৯৬ পর্যন্ত সময়কালে মায়ানমারের সৈন্য সংখ্যা ১,৭০,০০০ থেকে ৩,২১,০০০ হাজারে উন্নীত করায় সহায়তা করেছে। এছাড়া সমুদ্র উপকূলে 'হাইনগি দ্বীপ', 'মেরগুই' ও 'গ্রেট কো-কো দ্বীপে' নতুন অত্যাধুনিক নৌ ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। অথচ, এই সহায়তা বাংলাদেশ পেতে পারতো। ১৯৭৫-পরবর্তীকালে চীন বাংলাদেশকে যেভাবে সহায়তা করেছে, তাতে এতোদিনে চীনের পূর্ণ সাহায্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা গেলে মায়ানমার নয় বাংলাদেশে সৈন্য সংখ্যা আজ ৪ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারতো। কারণ, ১৯৮৫ সালে যেখানে মায়ানমারে কোন চীনা সহায়তার ছিটেফোঁটাও লক্ষ্য করা যায়নি এবং এর সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫,০০০ সেখানে সে সময় বাংলাদেশের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০,০০০। অথচ দীর্ঘ প্রায় একযুগে আমাদের সৈন্য সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ২৭,০০০। অন্যদিকে বারবার জোটবদ্ধতার মৌলিক নীতিমালা থেকে সরে আসায় বাংলাদেশের সাথে চীনের সামরিক সহযোগিতায় ভাটা পড়েছে অবিশ্বাস্যভাবে।

পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জন

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জন প্রশ্নে অনেকেই হয় তো অবাক হবেন। কিন্তু একথা না বললেই নয় যে, ভূ-রাজনৈতিক বা প্রকৃতিগত দুর্বলতা ও শক্তিশালী প্রচলিত সশস্ত্র বাহিনী গঠনে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব পূরণ করার ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি অর্জন হতে পারে অন্যতম কৌশল। এ ব্যাপারে যে চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি, তাও নয়। ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে ভারতের সানডে পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়,

> "সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমীরাত, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশের সাথে এককভাবে পাকিস্তানের সরাসরি সামরিক সম্পর্ক রয়েছে। সময় ও সুযোগ মতো পাকিস্তান এদের অথবা অন্য কোন দেশকে পারমাণবিক ছত্রছায়া দিতে পারবে।"[৪৮]

এরও পূর্বে নব্বই দশকের শুরুতে বাংলাদেশে 'উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা গতিধারা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেন যে,

> "বাংলাদেশ ছোট দেশগুলোর আস্থা অর্জন করেছে। সতর্ক ও পরিকল্পিত পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাহায্য-সহায়তায় ১৯৯৫-র মধ্যে পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে।"[৪৯]

পারমাণবিক ক্ষমতার্জনের এই যে প্রয়াস এটি কিন্তু খুব একটা ব্যয়বহুল নয়, বরং পারমাণবিক ক্ষমতা লাভ করলে প্রচলিত সশস্ত্র বাহিনী গঠনের বিপুল অংকের ব্যয় হ্রাস পায়। এছাড়া পারমাণবিক ক্ষমতা যুদ্ধ নিরুৎসাহিত করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সহায়তা করে থাকে। কারণ, ব্যাপক ধ্বংসের আশঙ্কায় একে-অন্যকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে।

পুরোপুরি গণবাহিনী ধারণা নয়, বিস্তৃত প্রচলিত অবকাঠমোয় অপ্রচলিত কৌশল গ্রহণ

গণবাহিনী নাকি কনভেনশনাল ধাচের সশস্ত্র বাহিনী-এই বিতর্ক বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে শেষ হবার নয়। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থান যেরূপ এক্ষেত্রে উপেক্ষিত হতে পারে না তেমনি ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতাও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া

৪৮। পাকিস্তানের কাহুতা পারমাণবিক কারখানা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, *দৈনিক ইনকিলাব*, ০১/৫/৯৩ সংখ্যা

৪৯। মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, *'বাংলাদেশঃ প্রতিরোধের রূপরেখা ও রণনীতির সন্ধানে'*, পৃ. ২৫

যায় না। এ পর্যায়ে অনেক বিশ্লেষক ও প্রতিরক্ষা কৌশলবিদ একটি সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বেশ ক'জন অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তার মতামত নিয়ে দেখা যায় তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোয় প্রচলিত বা কনভেনশনাল ধাচের সশস্ত্রবাহিনীর গঠনের কথা বলেছেন। তবে তাদের মতে অবকাঠামো কনভেনশনাল হলেও কৌশল হতে হবে আনকনভেনশনাল। এক্ষেত্রে প্রচলিত বাহিনী গঠনের যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ কিন্তু পাঁচ বা দশ লাখ ভারী সমরাস্ত্র সজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী নয়। বরং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বাহিনী গঠন করা। এখানে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বর্তমান আকার আরেকটু বৃদ্ধি করে আধুনিক সমরাস্ত্র দ্বারা একটি সুপ্রশিক্ষিত ফাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স গড়ে তোলার পক্ষেই বিশ্লেষকগণ অভিমত দিয়েছেন। একইসাথে বিডিআর, আনসার, ভিডিপি ও বিএনসিসি'র সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের প্রয়োজনীয় হালকা অস্ত্রসজ্জিত করার কথাও বলা হয়েছে। এতে এদিকে যেমন পুরোপুরি গণবাহিনী গঠনের ফলে যেসব প্রতিকূলতার আশঙ্কা করা হয়েছে সেসবের ভয় থাকবে না তেমনি একটি কমান্ড চ্যানেলে থাকায় বিডিআর, আনসার বা বিএনসিসি সদস্যদের মাঝে বিশৃংখলার ব্যাপ্তিও থাকবে কম। এরা যেহেতু ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও ডিসিপ্লিনড্ পরিবেশের মধ্যে থাকবে তাই এদের যুদ্ধক্ষমতাও হবে আশানুরূপ। সবচেয়ে বড় কথা এই পদ্ধতিতে আমরা গণবাহিনী কনসেপ্টে না গিয়েও অস্ত্র সজ্জিত বিশাল প্রশিক্ষিত বাহিনী গড়ে তুলতে পারি যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকায়। এবং প্রয়োজনে এই বাহিনী সদস্যরাই সাধারণ জনগণকে মবিলাইজ করা ও সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স গড়ে তোলায় পালন করবে সক্রিয় ভূমিকা।

এদিকে বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষুদ্র কিন্তু সুসজ্জিত ও সুপ্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী ও বিডিআর, আনসার, ভিডিপি এবং বিএনসিসি'র কৌশল হবে অপ্রচলিত ধারার। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি, অর্থনীতি, জনমনত্ব বিবেচনায় যে কোন যুদ্ধে ভারী অস্ত্র দ্বারা পুরোপুরি প্রচলিত কায়দায় বেশীদিন যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই সশস্ত্র বাহিনী ও প্যারামিলিশিয়াকে নিউক্লিয়াস ধরে অপ্রচলিত পদ্ধতির যুদ্ধের দিকেই আমাদের এগুতে হবে। এখানে এ জাতীয় যুদ্ধকৌশল কিরূপ হবে তা নির্ধারণ করবেন সমরবিদগণ। বিশেষ করে অপ্রচলিত ধারার যুদ্ধে কমান্ড চ্যানেল, গোলাবারুদ সরবরাহসহ অন্যান্য কৌশল পূর্ব থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে। এটা অসম্ভবও কিছু নয়। অবশ্য এর কার্যকর প্রয়োগের জন্য ব্যাপকভিত্তিতে মহড়া পরিচালনা করা প্রয়োজন। এতে আবার সাধারণ সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগণ কে কোথায় কিভাবে

নিয়োজিত হবে বা কার কি ভূমিকা থাকবে তাও অনুশীলনের মাধ্যমে রপ্ত করতে হবে। এছাড়া অনেকেই সকল নাগরিককে যদি সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত এসএসসি পর্যন্ত কারিকুলামে সামরিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তের প্রসংগ উত্থাপন করেছেন।৫০

অধ্যায় -৪

সমরবিশারদদের সাক্ষাৎকার

নিরাপত্তার প্রশ্নে স্থায়ী শত্রু-মিত্র বলে কোন কথা নেই

যে কোন দিক থেকে আক্রমণের কথা হিসাবে রেখেই দেশের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা প্রয়োজন

লে. জে. (অব.) আতিকুর রহমান, জি+
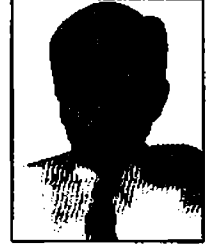
বর্তমান যুগে একটি দেশ যে কেবলমাত্র প্রতিবেশীর পক্ষ থেকেই আগ্রাসনের শিকার হবে তা নয়, বরং এখন আক্রমণ হতে পারে থ্রি ডাইমেনশনাল। ছোট দেশ মালদ্বীপ কোন প্রতিবেশীর দ্বারা আক্রান্ত হয়নি, হয়েছে ভারতীয় হস্তক্ষেপের শিকার। তাই প্রতিবেশীকে কেউ বন্ধু হিসাবে চিহ্নিত করলেও একটি দেশ যে কোন দেশ দ্বারা যে কোন দিক থেকে আক্রান্ত হতে পারে এবং এ আশংকার কথা হিসাবে রেখেই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সাধ্যমত শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মত একটি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশে সেনাবাহিনী থাকা নিতান্তই অপব্যয়-কতিপয় বুদ্ধিজীবীর এ মতের আলোকে মন্তব্য করতে বলা হলে প্রাক্তন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল এম আতিকুর রহমান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে দৈনিক ইনকিলাবকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী থাকবে কি থাকবে না তা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার বটে, তবে ছোট হোক, বড় হোক, ধনী হোক, দরিদ্র হোক স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতিটি জাতিই চাইবে তাদের একটি দক্ষ সশস্ত্র বাহিনী থাক। আমাদেরও অবশ্যই একটি সুপ্রশিক্ষিত, ওয়েল ডিসিপ্লিনড্ সশস্ত্র বাহিনী থাকতে হবে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি অনুযায়ী কোন সুনির্দিষ্ট শত্রু না থাকলেও বা আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলে দাবী করলেও সামর্থ্য অনুযায়ী একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলবো- এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কারণ আজ হয় তো কেউ শত্রু নয়, কিন্তু কাল তো হতে পারে। এছাড়া আভ্যন্তরীণ গোলযোগ যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনেরও আমরা মুখোমুখি হতে পারি। তখন যদি একটি সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনী না থাকে তা হলে সার্বিকভাবে দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। এমনকি কাউন্টেবল সশস্ত্রবাহিনী না থাকার সুযোগে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দেশের যে কোন অঞ্চলকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি মুক্ত এলাকায় পরিণত করতে পারে। যেমন হয়েছে শ্রীলংকায়। এ ব্যাপারে লে. জে. আতিক বলেন, এক সময় শ্রীলংকায় কোন মানসম্পন্ন বা দক্ষ সশস্ত্র বাহিনী ছিল না। ছিল একটি ছোট বাহিনী, যাকে পাপেট আর্মিও বলা যায়। তাই ঐ সুযোগে এলটিটিই'র গেরিলারা যখন বিভিন্ন পর্যায়ে আক্রমণ শুরু করে

তখন এমনও হয়েছে যে, ভাল প্রশিক্ষণ না থাকায় আর্মির সোলজাররা যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে গেছে। এরই এক পর্যায়ে এলটিটিই বাইরের সহায়তায় শ্রীলংকার জাফনায় একটি মুক্তাঞ্চল গঠনে সক্ষম হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে মার খেয়ে আজ শ্রীলংকা সরকার একটি প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী গঠন করলেও সেই হারানো এলাকা এখনো পুরোপুরি দখলে আনতে পারেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তিনি বলেন, আমাদের একটি সুসংগঠিত ট্রাডিশনাল আর্মি থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শত চেষ্টা করেও শান্তিবাহিনী এক ইঞ্চি ভূমিকেও মুক্তাঞ্চলে পরিণত করতে পারেনি। বরং সামরিক বাহিনীর কাছে ক্রমাগত রেজিস্টেন্সের সম্মুখীন হয়ে তারা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়েছে।

এভাবে সশস্ত্র বাহিনী থাকার পক্ষে মত প্রকাশের এক পর্যায়ে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি, বিশেষ করে 'কারো সাথে শত্রুতা নয়' অর্থাৎ নিরপেক্ষ থাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি বলেন, অনেকেই বলে থাকেন বাংলাদেশকে হতে হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড। আবার অনেকে সিঙ্গাপুর, জাপানের উদাহরণও দেন। একথা ঠিক, সুইজারল্যান্ড ন্যাটোর সদস্য নয় বা সিঙ্গাপুর, জাপানেরও কোন চিহ্নিত শত্রু নেই। কিন্তু তার মতে, যারা এসব বলেন, তারা কি এটা জানেন যে, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুরের একটি দক্ষ প্রশিক্ষিত ওয়েল ইকুইপড স্ট্যান্ডিং আর্মি আছে? এমনকি সুইজারল্যান্ডের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকই সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ তথ্যের উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, জাপানে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সেলফ ডিফেন্স ফোর্স বলা হলেও তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটেরও বহুগুণ বেশী। অস্ট্রেলিয়াতেও তাই। এদেশটির আশে পাশে কোন শত্রু নেই। কিন্তু তারপরও অস্ট্রেলিয়া প্রথম থেকেই একটি শক্তিশালী স্ট্যান্ডিং আর্মি লালন-পালন করে আসছে। তাই তার মতে, এসব ঠুনকো যুক্তি দিয়ে বলা যাবে না বাংলাদেশে কোন সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই। যারা একথা বলেন, তাদের উদ্দেশ্যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি জানান যে, রাজা লক্ষণ সেনের শাসনামলে নিরাপত্তা রক্ষায় কোন কার্যকর ব্যবস্থা ছিল না বলেই ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজী মাত্র সতেরজন সৈনিক নিয়ে একটি দেশ দখল করতে পেরেছিলেন। কিন্তু লক্ষণ সেনের যদি একটি দক্ষ সেনাবাহিনী থাকত, তা হলে হয় তো সতেরজন কেন সতের হাজার সৈনিকও তার দেশ দখল করতে পারত না। লে. জে. আতিক তাই মনে করেন স্বাধীন বাংলাদেশ রাজা লক্ষণ সেনের পলিসি অনুসরণ করতে পারে না।

কিন্তু শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠন ও আধুনিক সমরাস্ত্র ক্রয়ের এত অর্থ আসবে কোথেকে? এছাড়া ভারত যেখানে ২৮% প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েছে, সেখানে আমরা সমতা বজায় রাখবো কিভাবে? এ প্রশ্ন করা হলে সাবেক সেনাপ্রধান জানান, ভারতকে সরাসরি শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। বরং ভারতের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে স্থায়ী শত্রু-মিত্র বলে কোন কথা নেই। এদিকে ভারত ২৮% ভাগ সামরিক বাজেট বাড়িয়েছে বলে

যে আমাদের তা করতে হবে-এটি মোটেই যুক্তিযুক্ত বিষয় হতে পারে না। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর আকার বাড়ানো উচিত। বাজেট বৃদ্ধিও প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান তা পারমিট করে না। এটা হয় তো এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। আর প্যারিটি বা সমতার কথা মায়ানমারের ক্ষেত্রে চিন্তা করা গেলেও ভারতের সাথে আক্ষরিক অর্থে চিন্তা করা ঠিক হবে না। তিনি বলেন, সবদিক বিবেচনা করে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, নিরাপত্তা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কৌশল অবলম্বন করা হবে কি-না। এখানে তার মত হচ্ছে, শুধুমাত্র বাজেট বৃদ্ধি বা ভাল সমরাস্ত্র ক্রয়ই একমাত্র সমাধান হতে পারে না। কারণ আমেরিকান এম-১এ ১ আব্রাহম ব্যাটল ট্যাঙ্ক বা বড় দূর-পাল্লার কামান সংগ্রহ করলেও দেখা যাবে এগুলো বাংলাদেশের নরম মাটিতে বা নদীনালা, খালবিল অধ্যুষিত ভূমিতে ঠিকমত চালানো যাচ্ছে না বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার সময় দেবে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি আছে খুচরা যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন। তাই তার মতে, বেশী পয়সা দিয়ে সমরাস্ত্র কিনলেই হবে না। বরং এমন অস্ত্র এমন একটি দেশ থেকে আনতে হবে, যা আমাদের ভূপ্রকৃতিতে মানানসই, আমাদের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যার সরবরাহ হবে নির্বিঘ্ন। তার বিবেচনায় আমাদের যা সামর্থ আছে, তার সর্বোচ্চ ব্যবহারের সাথে সাথে প্রতিরক্ষার বাকীটা কৌশলে ম্যানেজ করতে হবে। এ ধরনের কৌশলের কথা বলতে গিয়ে লে. জে. আতিকুর রহমান জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল স্ট্যান্ডিং আর্মি তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কৌশল হিসেবে নাগরিক বাহিনী গঠন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি সেনাপ্রধান থাকাকালীন তার উত্থাপিত প্রস্তাবের উল্লেখ করে বলেন, সকল সক্ষম নাগরিককে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় বিকল্প হিসেবে সেনাপ্রধান থাকার সময় তিনি প্রতিটি উপজেলায় একটি করে নাগরিক ব্যাটালিয়ন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তার প্রস্তাব ছিল সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স ফোর্স হিসেবে আনসার, ভিডিপি'র পাশাপাশি প্রতিটি উপজেলায় একটি নাগরিক ব্যাটালিয়ন গঠন করতে হবে যাদের অস্ত্র থাকবে রাইফেল, লাইট মেশিনগান (এলএমজি), মেশিনগান ইত্যাদি এবং এদের প্রশিক্ষণ দেবেন রেগুলার সেনা সদস্যরা। তাই প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ভিন্ন কোন অবকাঠামো গঠনেরও প্রয়োজন হবে না। এতে তার বিশ্লেষণ মতে, লাভ হচ্ছে দু'টি। প্রথমত, বড় আর্মি গঠন সম্ভব না হওয়ায় নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নে যে দুর্বলতা রয়েছে তা গ্রাসরুট লেবেলে দেশের আনাচে-কানাচে নাগরিক ব্যাটলিয়ান গঠনের মাধ্যমে দূর করা যাবে। দ্বিতীয়ত, সম্ভাব্য শত্রু আক্রমণের ক্ষেত্রে বা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শত্রুর হেলি ল্যান্ডিং ও প্যারাস্যুট দিয়ে সেনা নামানোর সময় যেখানে আর্মি মুভ করতে সময়ের প্রয়োজন সেখানে স্থানীয় নাগরিক ব্যাটালিয়নের সদস্যরাই তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। এখন বাংলাদেশে যে সৈন্য আছে, তা দিয়ে যেহেতু সার্বিক নিরাপত্তা রক্ষা সম্ভব নয়, তাই এ ধরনের ভিন্ন ধারা তৈরি করেই বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে

বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তার মতে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এভাবে কনভেনশনাল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাশাপাশি মুক্তিবাহিনীর সদস্যরাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং এই বাহিনী না থাকলে ভারতের পক্ষেও এত তাড়াতাড়ি পাক বাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। এদিকে বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নে এ যাবত কোন সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নেয়া হয়নি কেন জানতে চাইলে লে. জে. আতিক আমাদের সংবিধানে সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে, পররাষ্ট্রনীতি হল প্রতিরক্ষানীতির পরিপূরক। যেমন- আমাদের নীতি হল, কাউকে আক্রমণ করব না, কিন্তু আক্রান্ত হলে অবশ্যই আত্মরক্ষা করব। তাই প্রতিরক্ষা নীতি যে নেই, তা তিনি মানতে রাজি নন। এ ব্যাপারে তার মত হচ্ছে এতদিন একটা আনডারস্ট্যান্ডিং-এর ভিত্তিতেই নীতি নির্ধারিত হয়ে এসেছে। এখন প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে যে সব কথাবার্তা বলা হচ্ছে, তা আলাপ-আলোচনার বিষয় বলে তিনি মনে করলেও প্ল্যানিং বা কৌশল গোপন থাকবে। এ ব্যাপারে তার মতামত খুব স্পষ্ট। (ইনকিলাব, ২৪.০৪.২০০০)

আমাদের সশস্ত্রবাহিনী, সীমান্তের ব্যাপ্তি ও অনুপ্রবেশের পথ বিবেচনায় ভারতের পক্ষে কখনও পূর্ণ শক্তি নিয়ে বাংলাদেশে আগ্রাসন চালানো সম্ভব নয়

আগ্রাসন শুধু সামরিক খাতে নয় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রেই হতে পারে

লে. জে. (অব.) মীর শওকত আলী, বীর উত্তম, পিএসসি

যে-কোন স্বাধীন রাষ্ট্র তা যত ছোটই হোক তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। এ জন্য একটি কার্যকর প্রতিরক্ষা মতবাদ সবদেশেই প্রণয়ন করা হয়। তবে আগ্রাসন প্রতিহত করা, যাকে প্রতিরক্ষাও বলা যায় তার অর্থ কিন্তু শুধুমাত্র এই নয় যে, এক দেশের আর্মি অন্য দেশ আক্রমণ করবে এবং আক্রান্ত দেশ তার সশস্ত্রবাহিনী দিয়ে সেটা প্রতিরোধ করবে। বরং আগ্রাসন শুধু সামরিক খাতে নয় হতে পারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তাই প্রতিরক্ষা বা ডিফেন্স কেবলমাত্র আর্মি দিয়েই হবে না। এ জন্য রাষ্ট্রের, সমাজের সকল পর্যায়েই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ভাবনা নিয়ে আলোচনার শুরুতেই এ কথাগুলো বললেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর শওকত আলী, বীর উত্তম পিএসসি (অব.)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার লে. জে. মীর শওকত এখন অনেকটা নিভৃতে স্মৃতিচারণমূলক বই লেখায় ব্যস্ত। অথচ এক সময় তিনি ২৫ মার্চ '৭১ তারিখে তদানীন্তন মেজর জিয়ার সাথে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ২৬ মার্চ '৭১-এ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার সময় ছিলেন তার (জিয়া) পাশে সহযোদ্ধা হিসেবে। সম্প্রতি সামরিক ট্যাকটিকসের তুখোড় বিশ্লেষক জে. শওকতের সাথে তাঁর গুলশানস্থ বাসার স্টাডি রুমে

আলাপকালে তিনি দৈনিক ইনকিলাবকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এখানে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ তুলে ধরা হল ঃ

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ কি রকম হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

লে. জে. মীর (অব.) শওকত আলী ঃ প্রতিরক্ষা মতবাদ সাধারণত জাতীয় লক্ষ্যকে ভিত্তি করে প্রণীত হয়ে থাকে, যেখানে প্রতিরক্ষা কৌশল বা ডিফেন্স প্ল্যানের অপর উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় লক্ষ্যকে নিরাপদ রাখা। ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাই প্রতিরক্ষা কৌশল সম্ভাব্য সকল জাতীয় সম্পদ সমন্বয়ে এমনভাবে তৈরী করতে হয়, যাতে প্রাপ্ত সবকিছুকে দেশের নিরাপত্তা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় সহায়তা, শিল্প সেক্টরসহ অপরাপর খাতের সমন্বয়ে একটি কো-অর্ডিনেটেড ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই কেবল জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা যায়। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অনেকে-সাধারণভাবে মনে করেন যে, অন্য দেশের আর্মি আক্রমণ করবে আর আমাদের আর্মি আমাদের বাঁচাবে। অথচ একটি দেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ শুধু এটুকুতে সীমাবদ্ধ থেকে প্রণীত হতে পারে না। প্রতিরক্ষা অর্থ আগ্রাসন প্রতিহত করা। এটা হতে পারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি আভ্যন্তরীণ পর্যায় থেকে। এক্ষেত্রে ভিনদেশী সশস্ত্র বাহিনী যদি সীমান্ত অতিক্রম করে, তবে তা হবে ফিজিক্যাল বা প্রত্যক্ষ আগ্রাসন। এসব বিবেচনায় বলতে হয়, প্রতিরক্ষা মতবাদ কিন্তু হুমকি বা আগ্রাসন আসতে পারে- এমন সবকিছুকে লক্ষ্য করেই প্রণয়ন করতে হবে। আবার এ অঞ্চল অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশে প্রতিরক্ষা নীতি বা মতবাদ প্রণয়ন করতে হলে তা এককভাবে করা সম্ভব নয়। কারণ এ অঞ্চলে একটা সাব সিস্টেম রয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ-এদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক অবস্থান অনেকটা একইরূপ। এসব সিস্টেমের বাইরে যারা আছে যেমন শ্রীলংকা, নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপও এই সাব সিস্টেম বলয়ের প্রভাব অস্বীকার করতে পারে না। সে জন্য আমাদের মত ছোট ছোট দেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ সেটা শুধু প্রত্যক্ষ সামরিক আগ্রাসন থেকে প্রতিরক্ষার জন্য নয় বরং তার পররাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যও প্রণয়ন করতে হবে এবং এখানে সকল পর্যায়ের সম্পদ ও সামর্থ্যকে ম্যানুভার করার বিষয়টিই হবে অগ্রগণ্য। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও সমন্বিতভাবে কোন প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়নি। এখন দেখা যায়- আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্যারামিলিটারী ফোর্স বিভিন্ন সময়ে সামরিক মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এতে কিন্তু দেশের সার্বিক প্রতিরক্ষা নিশ্চিত হতে পারে না বা শুধু এ ধরনের মহড়া দিয়েই প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা যায় না।

প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করতে হলে প্রথমে জাতীয় লক্ষ্য ঠিক করতে হবে, যার দায়িত্ব আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের। তারপর ডিফেন্স স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে, সেখানে

রয়েছে কয়েকটি ধাপ। যেমন- সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প-এসব মিলে স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন করতে হবে এ কারণে যে, জাতীয় লক্ষ্য যদি হয় স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, তা হলে এক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় সকল প্রাপ্য সম্পদের সমন্বয়েই তা করতে হবে। কারণ, দেশ না থাকলে কোন কিছুই থাকবে না। যখন এই স্ট্র্যাটেজিকে কার্যকর করার প্রশ্ন উঠবে তখন দেখা যাবে, এটা প্রতিরক্ষা নীতিকে রক্ষা করছে আবার প্রতিরক্ষা নীতি স্ট্র্যাটেজিকে রক্ষা করছে। এভাবে জাতীয় নেতৃত্ব তৈরী করবে পলিসি। তিন বাহিনী প্রধান, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয় মিলে তৈরী করবে স্ট্র্যাটেজি এবং এসবের আলোকে সামরিক কর্মকর্তারা প্রণয়ন করবেন ট্যাকটিকস বা যুদ্ধ কৌশল।

প্রশ্নঃ একটি দেশে লিখিত কোন প্রতিরক্ষা নীতি থাকার দরকার আছে কি-না? যদি থাকে তা হলে বাংলাদেশে তা এতদিন হয়নি কেন?

লে. জে. (অব.) মীর শওকত আলী ঃ প্রতিরক্ষা নীতি লিখিত থাকবে না অলিখিত থাকবে- সেটা বড় ব্যাপার নয়। আবার প্রতিরক্ষা নীতি সময় সময় পরিবর্তিত হতে পারে। সময়, পরিবর্তনশীল পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের উন্নয়ন ও বন্ধুপ্রতিম বৈদেশিক সহায়তার উপর ভিত্তি করে প্রতিরক্ষা নীতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে হয়। এটি মূলত একটি সতত পরিবর্তনশীল ও উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা। এদিকে বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা নীতি আছে কি নেই তা বলা যাবে না। তবে লিখিত নেই এটা ঠিক।

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি আমাদের প্রতিবেশী ভারত তার সামরিক বাজেট শতকরা ২৮ ভাগ বাড়িয়েছে। এ আলোকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে কি-না?

লে. জে. (অব.) মীর শওকত আলী ঃ কেউ বাজেট বাড়াল কি কমাল, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। বরং আমাদের দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ন্যূনতম যতটুকু সশস্ত্র বাহিনী প্রয়োজন তা আমাদের তৈরী করতেই হবে এবং এর যাবতীয় খরচও প্ল্যান অনুযায়ী বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে তাই সম্ভাব্য শত্রুর বাজেট যদি কখনও কমে যায়, তা হলেও হয় তো আমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে বাজেট বাড়াতে হতে পারে। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী যদি রাখতে হয় ও এ দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার প্রসঙ্গ আসে তা হলে যতটুকু প্রয়োজন তা বরাদ্দ করার প্রশ্নে কোন বিকল্প নেই। এখন এ অর্থ কোথা থেকে আসবে তা যারা দেশ পরিচালনা করেন তারাও যেমন ঠিক করবেন, তেমনি জনগণেরও এ ব্যাপারে আগ্রহ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, আগে তো দেশ। দেশ না থাকলে কারও অস্তিত্বই থাকবে না। তাই খেয়ে হোক, না খেয়ে হোক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আমাদের বরাদ্দ করতেই হবে।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলেন, আমরা বিশাল ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভারতের রয়েছে চতুর্থ বৃহৎ সেনাবাহিনী। সুতরাং ভারতের সাথে যুদ্ধের প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমাদের একটি ছোট সশস্ত্রবাহিনী থাকতে হবে, যে বাহিনী মূলত জাতীয় দুর্যোগকালীন সময়ে ভূমিকা পালন করবে। এমনকি কেউ কেউ এমনও বলে থাকেন যে, আমাদের মত দেশে সেনাবাহিনী থাকারই দরকার নেই। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

লে. জে. (অব.) মীর শওকত আলী ঃ অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, বাংলাদেশ যেহেতু কারও সাথে যুদ্ধ করবে না, তাই এর কোন সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই। এমনও অনেকে বলেন যে, আমরা কারও বিরুদ্ধে যাব না, অন্য কোন দেশও তাই বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করবে না। এ ধরনের চিন্তা কিন্তু বাস্তবসম্মত নয়। বরং এসব চিন্তা যারা করেন তারা আকাশে মেঘের রাজ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন বলেই আমার ধারণা। কারণ, প্রতিবেশী দেশের সাথে সীমান্ত না থাকলেও যে কোন দিক থেকে একটি দেশ আক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রীলংকার কথা ধরা যাক। এক সময় তারা আর্মিকে পুলিশের মতো গণ্য করত। তার ফল কি হয়েছে তা প্রতিটি শ্রীলংকাবাসীই জানে। তাই আমাদের এমন একটা শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী থাকতে হবে যা আমাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারবে। তবে আমাদের সাধ্যের মধ্যেই এটা করতে হবে।

এদিকে অনেকের মধ্যে একটা ভীতি আছে বিশাল প্রতিবেশীকে নিয়ে। ভারত একটা বিশাল দেশ। তার বিশাল সশস্ত্র বাহিনী। এ নিয়ে ছোট দেশগুলোর মাঝে একটা আশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক। তাই অনেকে ভাবেন ছোট দেশ, ক্ষুদ্র আর্মি নিয়ে প্রতিরোধ করবে কিভাবে? এর উত্তরে বলা যায়, বড় দেশ হলেই যে তাকে প্রতিরোধ করা যাবে না বা ছোট দেশ হলে যে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হবে না, তা কিন্তু নয়। ইসরাইল, সুইজারল্যান্ড ছোট দেশ। কিন্তু প্রতিরক্ষা চেতনায় অত্যন্ত অগ্রসর। অপরদিকে বড়, শক্তিশালী দেশ আমেরিকা ভিয়েতনামে পরাজিত হয়েছে; রাশিয়াকে মার খেতে হয়েছে আফগানিস্তানে। এমনকি সম্প্রতি চেচনিয়া কারও সহায়তা ছাড়াই রাশিয়াকে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে শুধুমাত্র চেচেন জনগোষ্ঠীর দৃপ্ত মনোবল ও কার্যকর যুদ্ধকৌশলের মাধ্যমে। আসলে যে কোন দেশ তা যত ছোটই হোক না কেন সবসময় নিজেকে রক্ষায় জনগণের ইস্পাত কঠিন মনোবল বা ইচ্ছা থাকে। যে কোন বৈরী দেশের ক্ষেত্রেই আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ একথা তো ঠিক যে, ভূ-প্রকৃতিগত ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্বলতা রয়েছে। ডিফেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় ডেপথ বা পশ্চাদভূমি আমাদের নেই। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য আগ্রাসন প্রতিরোধ করা কিভাবে সম্ভব?

লে. জে. (অব.) মীর শওকত আলী ঃ হ্যাঁ, আমরা প্রতিবেশী দ্বারা পরিবেষ্টিত, যাকে 'India Locked' পরিস্থিতিও বলা যায়। তবে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত কারণে ভারতের সাথে আমাদের ভাল সম্পর্ক রাখা দরকার। কিন্তু একই সাথে জাতীয় ইতিহাস,

ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি পর্যায়ে ভারতের সাথে আমাদের ভিন্নতাও বজায় রাখতে হবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য। একথা ঠিক, নিরাপত্তা প্রশ্নে আমাদের দেশের বেশকিছু দুর্বলতা রয়েছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ প্রথমত, আমাদের দেশ আয়তনে ছোট তাই সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিরক্ষার জন্য যে ডেপথ (Depth) প্রয়োজন, তা আমাদের নেই। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ হওয়ায় এর পক্ষে একটি বড় কনভেনশনাল সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাইরের কোন বন্ধুপ্রতিম দেশের সহায়তা (হয় তো) পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। চতুর্থত, বিশাল সশস্ত্রবাহিনীর অধিকারী হওয়ায় যুদ্ধে আমরা কখনও ভারতকে পুরোপুরি পর্যুদস্ত করা বা দিল্লী দখলের স্বপ্ন দেখতে পারি না। পঞ্চমত, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে মতাদর্শগত ভিন্নতা অত্যন্ত প্রকট। ষষ্ঠত, যুদ্ধে একপক্ষীয়ভাবে আমাদের ভূমি দখলের সম্ভাবনা আছে। সপ্তমত, কার্যকর প্রতিরক্ষা নীতি না থাকায় আমাদের বেসরকারি প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট শিল্প-কারখানা, প্যারা মিলিটারী ফোর্স ও সাধারণ জনগণ এখনও পুরোপুরিভাবে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিমূলক কোন সমন্বিত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। অষ্টমত, নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব (নেপোলিয়ান বলেছিলেন, 'একজন গুপ্তচরকে যদি সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় কাজে লাগানো যায় তা হলে তা বিশ হাজার সৈন্যের ভূমিকার চেয়েও কার্যকর হতে পারে)।

তবে এসব অসুবিধা থাকলেও আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছি। এগুলো হল, প্রথমত, ছোট হলেও আমাদের দেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য একে Defenders Paradise-এ পরিণত করেছে। অসংখ্য খাল, নদী, বিল, সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গল যে কোন আক্রমণকারীর কাছে 'রাত্রিকালীন দুঃস্বপ্ন' (Attackers Nightmare) বৈ কিছুই নয়। দ্বিতীয়ত, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জনগণের দুর্বার ইচ্ছে। এদেশের জনগণ স্বাধীনতার জন্য সবকিছুই বিলিয়ে দিতে পারে, যেমন দিয়েছে-১৯৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯, '৭০ ও '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে। তৃতীয়ত, এদেশের জনগণের এক বিশাল অংশ '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। চতুর্থত, আমাদের রয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতির অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ একটি সশস্ত্র বাহিনী। পঞ্চমত, ঢাকা ও এর নদীবেষ্টিত আশপাশ যাকে 'Dhaka Bowl' বলা হয়, তা অনির্দিষ্টকালের জন্য রক্ষা করা সম্ভব এবং ষষ্ঠত, যদি প্রয়োজনীয় সম্পদ ও পূর্বে প্রস্তুতকৃত প্ল্যান অনুযায়ী এগুনো যায়, তা হলে একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ চালানো যেমন সম্ভব, তেমনি কৌশলগত বিজয় অর্জনও কঠিন কোন ব্যাপার নয়।

এগুলোর পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে, হাজারও সম্পদ, অর্থ থাকলেও যেমন বাংলাদেশে একশত ডিভিশন সৈন্য রাখার প্রয়োজন নেই, তেমনি আমাদের সীমান্তের ব্যাপ্তি ও অনুপ্রবেশের রাস্তা অর্থাৎ এ্যাপ্রোচ বিবেচনায় কারও পক্ষে তার সশস্ত্র বাহিনীর

পুরোটা নিয়ে বাংলাদেশে আগ্রাসন চালানোও অসম্ভব। ধরুন, আমাদের এখন যে সৈন্য আছে এদের আক্রমণ করতে হলে তিনগুণ বেশী সৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু এত সৈন্য প্রবেশের মত জায়গা আমাদের দেশে নেই। তাই কারও বিশাল সৈন্য বাহিনী থাকলেও এটা ভাবা বাস্তবসম্মত নয় যে, সে সবকিছু নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারবে। এ জন্য ভীত না হয়ে আমাদের ডিফেন্সের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তা করলেই আমারা নিরাপদ থাকতে পারব।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কি কনভেনশনাল না সিটিজেন আর্মি হওয়া উচিত?

লে. জে. (অব.) মীর শওকত আলী ঃ একটা প্রয়োজনীয় কনভেনশনাল আর্মি তো থাকতেই হবে। পাশাপাশি প্যারা-মিলিটারী, যেমন ঃ বিডিআর, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি-এদেরও ডিফেন্সের উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমি আগেই বলেছি, জনগণের মনোবল হচ্ছে যুদ্ধের একটা মূল উপাদান। তাই প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনগণকেও প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। এদের সামরিক কৌশল সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল আমাদের দেশের প্রকৃতি, পরিস্থিতি বিবেচনা করে এমন একটি কৌশল প্রণয়ন করা, যাতে কনভেনশনাল আর্মি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনগণ সমন্বিতভাবে লড়তে পারে। যেমন ধরুন, সীমান্ত রক্ষায় সম্পূর্ণ কনভেনশনাল আর্মি নিয়োজিত থাকতে পারে। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। এখানে আবার সামরিক কৌশলের কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন- যশোর দিয়ে যদি শত্রুর কোন বাহিনী ঢাকার দিকে এগিয়ে আসে তা হলে প্রাথমিক প্রতিরোধের পর হয়ত তারা ফরিদপুর পর্যন্ত এল। কিন্তু শত্রুর সে বাহিনীর পশ্চাদভাগ বড় জোড় ৯/১০ মাইলব্যাপী বিস্তৃত হতে পারে। তখন আমাদের যে বাহিনী প্রাথমিক প্রতিরোধ করে গ্রামাঞ্চলে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে সরে গিয়েছিল তারা এসে পেছন থেকে আক্রমণ করবে শত্রুকে। ফলে শত্রু মাঝখানে পড়ে যাবে এবং পশ্চাদভাগে একটি অঞ্চল মুক্ত হয়ে যাবে। একে আর্টিফিশিয়াল ডেপথ তৈরী করা বলা যায়। এ পর্যায়ে ঐ অঞ্চলের জনগণও এগিয়ে আসবে। শত্রু হবে অবরুদ্ধ। অর্থাৎ আমি এটাই বলতে চাই যে, জনগণকে প্রশিক্ষিত করলে তারাও কনভেনশনাল আর্মির সাথে নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে দেশরক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে।

এছাড়া আনসার, ভিডিপির যে কথা বললাম, সেখানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া গৃহীত পদক্ষেপের কথা বলা যায়। তিনি প্রায় দু'কোটি আনসার, ভিডিপি তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল যদি আমাদের দু'কোটি সমর কৌশল প্রশিক্ষিত জনতা থাকে তা হলে যে কেউ আমাদের আক্রমণ করতে দশবার না হোক, পাঁচবার অন্তত ভেবে দেখবে।

(দৈনিক ইনকিলাব, ২৮-০৪-২০০০)

যারা সশস্ত্র বাহিনী ও প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কথা বলেন তারা আধিপত্যবাদের 'মাউথপিস'

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, এনডিইউ, পিএসসি

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে শ্রীলংকা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যেটুকু সৈন্য না রাখলেই নয়, কেবলমাত্র ততটুকুই রাখতে হবে। কিন্তু আজ তামিল গেরিলাদের আক্রমণে তারা এমনি দিশেহারা যে, নয়টি দেশের কাছে জরুরী ভিত্তিতে সমরাস্ত্র সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। এছাড়া সেনা সদস্যদের প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা না থাকায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শ্রীলংকান সৈন্যরা পালিয়ে গেছে- এমন ঘটনাও ঘটেছে বহুবার। অথচ প্রথম থেকে যদি শ্রীলংকা উন্নয়ন কার্যক্রমের দোহাই দিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে অবহেলা না করত তা হলে তাদের অবস্থা এতটা শোচনীয় হত না। তাই যারা বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই বা থাকলেও ছোট দেশে ছোট আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স রাখলেই চলে তারা আসলে নিরাপত্তা-সিকিউরিটি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশ বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে দ্বিধাহীন কণ্ঠে এ কথাগুলো জানালেন সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, এনডিইউ, পিএসসি। ১ মে ২০০০ তারিখে তার গুলশানস্থ বাসভবনে আলাপকালে এ ব্যাপারে ভারতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি আরো বললেন, বিশাল ভারত দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর চেষ্টা করেও উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য ও কাশ্মীরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। অথচ বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা হল এসব এলাকায়। ভারত যেখানে নিজের দেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে সেখানে কিভাবে কতিপয় বুদ্ধিজীবী ভাবতে পারেন যে, যুদ্ধে ভারত সহজেই বাংলাদেশকে পরাজিত করবে? সাবেক বিমান বাহিনী প্রধানের ভাষ্য মতে, যে জাতি ১৯৭১ সালে সুদক্ষ, সুপ্রশিক্ষিত বিশ্বের অন্যতম সেরা পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত করেছে তাদের কিভাবে যুদ্ধে পরাজিত করা সম্ভব? বরং আমাদের শত্রু-মিত্র সকলেরই এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা আক্রান্ত হলে রুখে দাঁড়াব। সমগ্র জাতি ঝাঁপিয়ে পড়বে পবিত্র মাতৃভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষার জন্য।

প্রায় দুই হাজার ঘন্টার অধিক ফ্লাইং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বৈমানিক এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী, এনডিইউ পিএসসি (অব.) ১৯৬২ সালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে যোগ দেন। একজন ফাইটার পাইলট হিসেবে তিনি বিশটির অধিক মডেলের জঙ্গী, প্রশিক্ষণ ও পরিবহণ বিমান এ পর্যন্ত চালিয়েছেন। এছাড়া চাকরি জীবনে ঢাকাস্থ বেস বাশার, যশোরের মতিউর রহমান ঘাঁটির এয়ার অফিসার কমান্ডিং হিসাবে দায়িত্ব

পালনের পাশাপাশি ১৯৭৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে, ১৯৭৬ সালে গণচীনে ফ্লাইং ট্রেনিং-এ যোগ দেন এবং ১৯৮৬-'৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এনডিইউ ফেলোশীপ অর্জন করেন। এরপর ১৯৮৮ থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত মস্কোয় বাংলাদেশ দূতাবাসের ডিফেন্স অ্যাটাশে হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৯১ সাল থেকে '৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধানরূপে দায়িত্ব পালন করেন। সম্প্রতি তার নির্বাচনী এলাকা পটুয়াখালী সফরের সময় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলেও তিনি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে দৈনিক ইনকিলাবকে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধ করেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে? কিন্তু নেতিবাচক প্রচারণার মাধ্যমে এদেশের জনগণের মাঝ হীনমন্যতার বীজ ঢুকিয়া দিচ্ছে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ কি রকম হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ ঃ প্রতিরক্ষা মতবাদ নিয়ে কিছু বলার পূর্বে আমাদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধাপ। এর প্রথম ধাপ হল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। সে বছর ২৬ মার্চ তদানিন্তন মেজর জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে যখন যুদ্ধের ডাক দেন তখন পাকবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকসহ পুরো দেশের জনগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে রেগুলার আর্মির জোয়ানরা যেমন অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে, মুক্তিবাহিনী যেমন পাকবাহিনীকে মোকাবিলা করেছে, তেমনি সাধারণ মানুষও নিজ নিজ অবস্থান থেকে অংশগ্রহণ করায় পিছু পা হয়নি। এভাবে একটি জাতি আত্মরক্ষায় যুথবদ্ধ ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় ধাপ কিন্তু গৌরবজনক কিছু ছিল না। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত সময়কাল ছিল এদেশের সশস্ত্রবাহিনী ও প্রতিরক্ষা চেতনার ক্রান্তিকাল। তদানীন্তন সরকার আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্সের বাজেট কমিয়ে এদের সদস্যদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র, ইউনিফর্ম না দিয়ে রক্ষিবাহিনী ইত্যাদি নানা জাতীয় বাহিনীর সৃষ্টি করে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, রক্ষিবাহিনীর জন্য সরকার বরাদ্দ করেছিল প্রচুর অর্থ, অস্ত্র। এভাবেই একটি অবিস্মরণীয় যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা একটি জাতির মধ্যে হীনমন্যতার বীজ রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুপ্রবেশ করানো হয়। এরপর আসে জিয়াউর রহমানের শাসনকাল। বলা চলে, তাঁর সময়ই এ দেশ ভারতীয় বলয়ের বাইরে এসে একটি স্বতন্ত্র পথে চালিত হয়। এ সময় জে. জিয়া পররাষ্ট্রনীতিকে সচল করে একটি কার্যকর প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন। তাঁর সময়ানুগ উদ্যোগের ফলে একদিকে যেমন সশস্ত্র বাহিনীতে অর্থ বরাদ্দ, রিক্রুটমেন্ট বৃদ্ধি পায় তেমনি চীনসহ বেশ ক'টি আরব দেশের সহায়তায় প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র সংগ্রহও অব্যাহত থাকে। এ সময়কে অপর কথায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর স্বর্ণযুগও বলা হয়। পরবর্তীতে জে. এরশাদ সরকারও এ ধারা অক্ষুণ্ন রাখেন। এভাবে আমাদের জনগণ হীনমন্যতা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে সক্ষম হয়। মূলত জে. জিয়ার অনুসৃত নীতি থেকেই আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করতে পারি।

এখানে উল্লেখ করতে হয়, আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে যেখানে সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয় কথাটি লিপিবদ্ধ আছে, সেখানে এ নীতিকে অনুসরণ করেই আমাদের প্রতিরক্ষা মতবাদ তৈরি করতে হবে। আমরা কাউকে আক্রমণ করব না। সে দুরাশাও আমাদের নেই। কিন্তু আক্রান্ত হলে অবশ্যই '৭১-এর মত যুথবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াব। এক্ষেত্রে আমাদের নীতি হবে আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা এবং সব সময় আমাদের এমনভাবে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে যে কোন পর্যায়ের আগ্রাসনকে ঠেকিয়ে দেয়া সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে আপোষ করার কোন সুযোগ নেই। চার্চিলের কথায় বলতে হয়, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকাই হচ্ছে শান্তিতে বসবাসের অন্যতম গ্যারান্টি। আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি, তাই স্বভাবতই চার্চিলের কথা আমাদের ভুললে চলবে না।

প্রশ্ন ঃ একটি দেশে লিখিত কোন প্রতিরক্ষা মতবাদ থাকার দরকার আছে কি-না? যদি সে দরকার থাকে তা হলে বাংলাদেশে তা এতদিন হয়নি কেন?

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ ঃ নীতি যদি সুনির্দিষ্ট থাকে তা হলে ভাল হয়। কারণ সেক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ সাধারণ জনগণও পূর্ব থেকে জানতে পারে জরুরী অবস্থায় কার কি ভূমিকা হবে। '৭১-এ আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাকবাহিনী আক্রমণ করলে আমাদের করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা যদি দিয়ে রাখতেন তা হলে ২৫ মার্চ এত সেনা সদস্য ও জনতা নিহত হতেন না। উল্টো আমরা প্রথম ধাক্কাতেই পাকবাহিনীকে প্রি-প্ল্যানড অ্যাকশনে কাবু করে ফেলতে পারতাম। তাই একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের কোন প্রত্যক্ষ পলিসি স্বাধীনতার পর প্রণয়ন করা হয়নি। এর কারণ হল সে সময় ভারতের সাথে তদানীন্তন সরকার কথিত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন। এর একটি হল ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি এবং অপরটি হল মুক্তিযুদ্ধকালীন গোপন সাত দফা চুক্তি। উল্লেখ্য, প্রবাসী স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ভারতের সাথে গোপনে এই চুক্তি প্রণয়ন করেন যাতে স্বাক্ষর দিয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম অজ্ঞান হয়ে যান। এই চুক্তির ধারায় বলা ছিল যে, বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না। মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে, যারা আভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষা করবে এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে চলবে। স্বভাবতই এ ধরনের অধীনতামূলক চুক্তি সম্পাদনের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ণ করতে পারেনি। তবে জে. জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর সক্রিয় উদ্যোগকেই ওয়ার বুকসহ Draft Defence of Bangladesh Ordinance, Draft Defence of Bangladesh Rules, Role & Task of each Military Organisation তৈরী করা হয়। এগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে যুদ্ধে বা যুদ্ধের পূর্বে সশস্ত্রবাহিনীর কার কি ভূমিকা হবে, প্যারামিলিটারী বাহিনীকে কিভাবে মবিলাইজ করা হবে ইত্যাদি। এটাকেই আমরা প্রতিরক্ষা নীতি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। উল্লেখ করতে হয়, জে.

জিয়ার প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ীই সশস্ত্রবাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য এর সমরাস্ত্র সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যতটুকু সম্ভব প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়। পাশাপাশি তাঁর বৈদেশিক নীতি এত সচল বা ডাইনামিক ছিল যে, তিনি আমাদের সম্ভাব্য শত্রুকে নিউট্রালাইজ করার জন্য চীনসহ মুসলিম দেশগুলোর কূটনৈতিক ছত্রছায়া লাভে সক্ষম হন। ফলে একটি শক্তিশালী জাতীয় ভাবমূর্তি গড়ে উঠে। এসব পদক্ষেপ ছাড়াও তিনি সশস্ত্রবাহিনীর অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসবের মধ্যে ছিল সমরাস্ত্র কারখানায় অস্ত্র, গোলাবারুদ তৈরির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ, মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরীতে স্পেয়ার পার্টস তৈরী, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের ইউনিফর্ম বাংলাদেশে তৈরীর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সম্প্রতিও আমাদের এ পলিসি অনুসরণ করা উচিৎ এবং এ জন্য জাতি হিসেবে যা যা করা দরকার, সেক্ষেত্রে কষ্ট হলেও আমাদের তা-ই করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রতিবেশী ভারত বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হওয়ার পরও সম্প্রতি প্রতিরক্ষা বাজেট শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি করেছে। এই আলোকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো উচিৎ কি-না? এবং যদি বরাদ্দ বাড়াতে হয় তা হলে অর্থ আসবে কোত্থেকে?

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ ঃ একথা ঠিক যে, ভারতে নিরাপত্তা খাতে হুমকির মাত্রা অনেক বেশী। তাকে উত্তরে পূর্বাঞ্চলের 'সাতকন্যা' অর্থাৎ আসাম, মিজোরাম, অরুণাচল, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, তেমনি চীন ও পাকিস্তানের মত দেশকেও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। রয়েছে পাঞ্জাব সমস্যা। এছাড়া আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গপোসাগরেও রয়েছে ভারতীয় স্বার্থের থাবা। তাই আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ভারত হুমকি বেড়ে যাওয়ায় নিতান্ত বাধ্য হয়েই প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েছে। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে যেখানে প্রতিরক্ষা বাজেট হ্রাস করার প্রবণতা লক্ষণীয় সেখানে এভাবে নিউক্লিয়ার পাওয়ার হওয়ার উদগ্রবাসনা এবং হঠাৎ ২৮% বাজেট বৃদ্ধি প্রকারান্তরে ভারতের আক্রমণাত্মক অভিলাষেরই প্রকাশ ঘটায়। বিশেষ করে, এ বছর জাতিসংঘ খাদ্য সংস্থার রিপোর্টে যখন বলা হয়েছে যে, বিশ্বের অভুক্ত মানুষের অর্ধেকেরই বসবাস ভারতে তখন ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধিকে মিরাকলই বলা যায়। এছাড়া এখানে আরেকটি ব্যাপারে লক্ষণীয়। সেটা হল বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে এখন বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যা আলাপ-আলোচনা করে সমাধানের পক্ষেই জোর দেয়া হচ্ছে। অথচ, ভারত এখনও গায়ের জোরে স্বাধীনতাকামীদের দমন করতে চায়। ভারতের এই যে এগ্রেসিভনেস এটা বাংলাদেশের প্রতিও রয়েছে। তাই ভারত প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ালে আমাদেরও চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে আমাদেরও প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হবে। এমনিতেও এ সরকারের আমলে প্রায় তেরবার টাকার অবমূল্যায়ন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো উচিৎ। পাশাপাশি উন্নত সমরাস্ত্র সংগ্রহের জন্যও বাজেট বাড়াতে হবে। তবে তা কতটুকু বাড়ানো দরকার ও

বরাদ্দ কিভাবে দেয়া হবে তা অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে ঠিক করবে। এদিকে বাজেট বাড়ানো হলে অতিরিক্ত অর্থ আমরা কোথা থেকে সংস্থান করব, এটা বিরাট সমস্যা বটে। তবে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। প্রথমত, বিভিন্ন সেক্টরে এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে সশস্ত্রবাহিনীতে অপরিকল্পিত ব্যয় বন্ধসহ উদ্দেশ প্রণোদিত ক্রয় হ্রাস করে অর্থ সংস্থান করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আমরা উদাহরণ হিসেবে বিমান বাহিনীতে মিগ-২৯ ক্রয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারি। বিপুল অর্থ দিয়ে এগুলো ক্রয় করা হয়েছে সত্য কিন্তু এই বিমানগুলোর অপারেশনাল ক্ষমতা কতটুকু তা প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ বিগ-২৯ এসেছে ৮টি। এটা জানা কথা যে, বেশীর ভাগ সময় প্রায় ৪০%-৫০% বিমান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রাউন্ডেড থাকে। তাই প্রয়োজনে মাত্র ৪/৫টি মিগ-২৯ আকাশে উড়তে পারবে। এর উপর আছে স্পেয়ার পার্টস সংক্রান্ত সমস্যা। স্বাধীনতার পর যেসব মিগ-২১ আনা হয় সেই বিমানগুলোকে গ্রাউন্ডেড করতে হয়। কারণ আশির দশকে রাশিয়া মিগ-২১-এর পার্টস সরবরাহে অপারগতা জানায়। বলে যদি আদৌ পার্টস-এর প্রয়োজন হয় তা হলে বাংলাদেশ যেন ভারত থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে। ফলে মিগ-২১ বাদ পড়ে এ্যাকটিভ সার্ভিস থেকে। এবার যে মিগ-২৯ এর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাই এ ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ক্রয় বাদ দিয়ে যদি ঐ অর্থে বেশী সংখ্যক যেমন ৩০/৩৫টা এফ-৭ জাতীয় বিমান সংগ্রহ করা যেতো তা হলে অন্তত ৪টা মিগ-২৯ এর জায়গায় ১৫-২০টি জঙ্গী বিমান উড্ডয়নক্ষম পাওয়া যেতো। ইনডাকশন ট্রেনিং-এর বিপুল পরিমাণ অর্থও সাশ্রয় হতো। দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রতিবছর বাংলাদেশের সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে। আমার প্রশ্ন, ডিফেন্স বাজেটের প্রায় চার গুণ অর্থ এভাবে লোপাট হলেও কারো মাথাব্যথা নেই কেন? এসব দুর্নীতি কমিয়েও তো প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো যায়।

তৃতীয়ত, আমরা আমাদের অর্থজনিত দুর্বলতা করতে পারি বন্ধুপ্রতিম দেশ থেকে সহজ শর্তে, কিস্তিতে সমরাস্ত্র সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়ে।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলেন, আমরা বিশ্বের চতুর্থ সশস্ত্রবাহিনীর অধিকারী বিশাল ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রশ্নই উঠে না। তাই আমাদের মত দেশে সশস্ত্রবাহিনী থাকারই প্রয়োজন নেই। যদি সশস্ত্রবাহিনী রাখতে হয় তা হলে তা হবে ছোট্ট যা মূলত জাতীয় দুর্যোগকালীন সময়ে ভূমিকা পালন করবে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ ঃ এ ধরনের কথা যারা বলেন, তাদের আমি প্রশ্ন করতে চাই যে, পৃথিবীতে এমন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ কি আছে যার সশস্ত্রবাহিনী নেই। ইতিহাস, ভূগোলের ছাত্র এসব কথিত বুদ্ধিজীবী আজ যা বলছেন আমার ধারণা তারা সামরিক ইতিহাস ও প্রতিরক্ষা খাত নিয়ে আদৌ কিছু জানেন না। আবার জানলেও হয় তো বিশেষ কোন আধিপত্যবাদী দেশের মাউথপিস হিসেবে ইচ্ছা করেই এসব বুঝতে চান না। বুঝলেও জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলেন ভিন্ন কথা।

অথচ, এদেশের সচেতন প্রতিটি মানুষেরই এটা জানা আছে যে, বিশাল পরাশক্তি রাশিয়ার পাশে এস্তোনিয়া, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া যেমন টিকে আছে, তেমনি চেচনিয়ার রাজধানী গ্রোজনীর ৯০% রাশিয়ার বোমাবর্ষণে ধ্বংস হয়ে গেলেও রাশিয়া চেচনিয়াকে কব্জা করতে পারেনি। এমনি উদাহরণ দেয়া যায় ভিয়েতনাম, আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে। আবার মহাচীনের পাশেও তাইওয়ান, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া টিকে আছে। অন্যদিকে আয়ারল্যান্ডে বছরের পর বছর চেষ্টা করেও ইংল্যান্ড সফলকাম হতে পারেনি। ল্যাটিন আমেরিকাতে ব্রাজিলের পাশে ছোট দেশ প্যারাগুয়ের যেমন সশস্ত্রবাহিনী রয়েছে, তেমনি আর্জেন্টিনার পাশে উরুগুয়েরও রয়েছে স্বাধীনসত্তা। তাই ছোট দেশ হলেই যে সশস্ত্রবাহিনী রেখে লাভ নেই, এ মতের পক্ষে যুক্তি দেয়া যাবে না বরং ছোট হলেও যে কেউ রুখে দাঁড়ায় এবং বিড়ালের এই রুখে দাঁড়ানো বা সেলফ ডিফেন্সের ভঙ্গি খুবই ভয়াবহ। বাংলাদেশও তাই আক্রান্ত হলে রুখে দাঁড়াতে পারবে এতে কোন সন্দেহ নেই। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এতদঞ্চলে ক্ষমতার যে ভারসাম্য, তাতে ভারত কখনোই চীন, পাকিস্তান, সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে বাংলাদেশে আগ্রাসন চালানোর মত প্রয়োজনীয় সৈন্য সমাবেশ করতে পারবে না। অথচ আমাদের যদি একটি প্রচলিত সশস্ত্রবাহিনী না থাকতো তা হলে কিন্তু ভারত সহজেই আগ্রাসন চালানোর অবস্থানে চলে যেতে পারতো। এদিকে এখনকার যুগে হায়দ্রাবাদ, মনভাদর, জুনাগড়, গোয়া বা সিকিম দখলে ভারত যে স্ট্রাটেজি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল তা হয় তো সম্ভব নাও হতে পারে যদি আমাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবকাঠামো বজায় রাখা হয়।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী কি কনভেনশনাল না সিটিজেন আর্মি হওয়া উচিত?

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ ঃ এতে কোন দ্বিমত নেই যে, আমাদের একটি শক্তিশালী কনভেনশনাল সশস্ত্রবাহিনী থাকতেই হবে, যারা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষায় Core বা Nucleus হিসেবে কাজ করবে। এদের হতে হবে সুপ্রশিক্ষিত, দক্ষ ও আধুনিক সমর বিদ্যায় পারদর্শী, যাতে যে কোন আগ্রাসন তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধ করা যায়। এদের পাশাপাশি বিডিআর, আনসার, ভিডিপি, কোস্টগার্ড থাকবে সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স হিসেবে। তারপর আসবে জনগণের প্রশ্ন। আমাদের লক্ষ্য হবে দেশের সকল সক্ষম নাগরিককে সীমিত প্রশিক্ষণ দেয়া, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা দেয়া, যাতে এরাও সশস্ত্রবাহিনীর সাথে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এছাড়া সশস্ত্রবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণকারী সকল সদস্যকে আমরা রিজার্ভ লিস্টে রেখে রিজার্ভবাহিনী গড়ে তুলতে পারি। এরা যেমন প্রয়োজনে যুদ্ধে যোগ দিতে পারবে, তেমনি জনগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সংগঠিতও করতে পারবে। একইভাবে মহিলা যারা দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগ তাদেরকে দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বাইরে রাখা যাবে না। বরং প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গার্লস গাইড, বিএনসিসি ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত করে এদের গড়ে তুলতে হবে। তবে যে দিকটিতে বেশী নজর দিতে হবে তা হলো প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা বা প্ল্যান অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ঠিক করে দিতে হবে যাতে যুদ্ধ শুরু হলে '৭১-এর ২৫ মার্চের মতো বিশৃংখলার সৃষ্টি না হয়।

প্রশ্ন ঃ একজন সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান হিসেবে বাংলাদেশে বিমানবাহিনীর দুর্বলতাগুলো দূর করার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি?

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ ঃ এয়ার ফোর্স হচ্ছে Armed Hightech Service of the Armed forces. এ বাহিনী শুধু এয়ার ফোর্সের নিজের প্রয়োজনেই যুদ্ধ করে না বরং সেনা, নৌ-বাহিনীর সহায়তায়ও এগিয়ে যেতে পারে। সঙ্গত কারণেই বিমানবাহিনীর প্রতিটি উপকরণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু একথাও সত্য, একটা বিমান অনেক ক্ষেত্রে একটা ডিভিশনকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারে। একটি বিমান বা একজন বৈমানিক তাই One man Army in the Air. অথচ আমাদের দেশের অনেকেরই ধারণা আছে যে, ভারতের বিশাল বিমানবাহিনীর বিপরীতে কনভেনশনাল এয়ার ফোর্স কোন ভূমিক রাখতে পারবে না। এটা কিন্তু ভুল ধারণা। কারণ, প্রথমত আমরা যদি এয়ার ডিফেন্স রাডার সিস্টেম আধুনিকায়ন করতে পারি তা হলে ভারতের কোন ঘাঁটি থেকে বিমান উড্ডয়নের সাথে সাথে জানতে পারব। এতে রি এ্যাকশন টাইম পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের উন্নত রানওয়ে বা বিমান ক্ষেত্র থাকার পাশাপাশি ডিসপ্যারসাল এরিয়া আরও উন্নত করতে পারলে বিমানের নিরাপত্তা রক্ষা করা সহজ হবে। তৃতীয়ত, যেসব বিমান বন্দর এখন আছে, এগুলোর অতিরিক্ত হিসেবে স্যাটেলাইট বিমান ক্ষেত্র তৈরি রাখতে হবে। বরিশাল, আড়াই হাজার, কক্সবাজার, ইত্যাদি এয়ারফিল্ড সংস্কার করে যে কোন জরুরী মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত রাখা সম্ভব হলে আমাদের সামর্থ্য অনেক বেড়ে যাবে। চতুর্থত, বড় বড় রাস্তা বা হাইওয়ে বানানোর সময় এর কিছু অংশ সম্ভাব্য রানওয়ে হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে। কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড, চীনে এভাবে প্রচুর বিকল্প রানওয়ে তৈরি করা হয়েছে। পঞ্চমত, প্রশিক্ষণের উঁচু মান বজায় রেখে সীমিত সম্পদের দুর্বলতা কমানো যেতে পারে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, বিমান বাহিনীর প্রাণ হচ্ছে ফাইটার এয়ারক্রাফট। তাই পৃথিবীর সবদেশে বিমানবাহিনী একাডেমীতে প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র ফাইটার পাইলট তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে যারা ফাইটার বিমান চালাতে ব্যর্থ হন তাদেরকে পরবর্তীতে হেলিকপ্টার/পরিবহণ বিমান চালনা বা গ্রাউন্ড ব্রাঞ্চে বদলীর সুযোগ প্রদান করা হয়। তাই প্রতিবেশী দেশ ভারত ও প্যাকিস্তানসহ পৃথিবীর উন্নত/অনুন্নত সব দেশেই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে একজন অপারেশনাল ফাইটার পাইলটকে বিমানবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে একজন ফাইটার পাইলটের পক্ষেই সঠিক যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে কয়েকবার এর ব্যতিক্রম ঘটার কারণে বিমানবাহিনীর অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। যত শীঘ্র সরকার এদিকে দৃষ্টি দেবেন- ততই মঙ্গল।

(দৈনিক ইনকিলাব, ১০-০৫-২০০০)

আমাদের কোন শত্রু নেই-একথা ভেবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না

হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি অপচয় কমিয়ে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো উচিত

লে. জে. (অব.) মাহবুবুর রহমান, পিএসসি
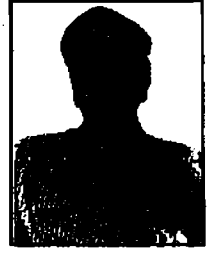
সম্পদে, সম্ভাবনায় বাংলাদেশ এক সময় অনুল্লেখ্য হলেও এখন এটি একটি সম্ভাব্য প্রাচুর্যময় দেশ। অফুরান গ্যাস, তেল, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলায় সমৃদ্ধ এ দেশটি তাই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাশ্চাত্যসহ সমগ্র পৃথিবীর কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে সাম্প্রতিক সময়েই। বিশাল প্রতিবেশীও সে জন্য বাংলাদেশকে এখন আর লায়াবিলিটি হিসেবে না দেখে অ্যাসেট হিসেবে দেখে প্রভাব বিস্তারের চিন্তা-ভাবনা করবে-এটাই স্বাভাবিক। সোজা কথায় বলা যায়, আমরা এখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে স্বভাবতই আত্মরক্ষা বা নিরাপত্তার বিষয়টিও এখন পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশী করে ভাবতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপই নিতে হবে। এখানে আমাদের কোন শত্রু নেই, একথা ভেবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ, সশস্ত্রবাহিনীর অবয়ব ও এর বাজেট নিয়ে দৈনিক ইনকিলাবকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ মতামত প্রকাশ করেছেন সাবেক সেনাপ্রধান লে. জে. (অব.) মাহবুবুর রহমান। সেনাবাহিনীতে দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করার পর তিনি ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর যোগ দেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে। বর্তমানে তিনি বিএনপি চেয়ারপার্সনের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা।

সম্প্রতি লে. জে. (অব.) মাহবুবুর রহমানের পুরাতন ডিওএইচএস-এর বাসায় আলাপকালে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ কি রকম হওয়া উচিত-এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জাতীয় চেতনা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে যে, কোন্ কোন্ খাত বা দিক থেকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি আসতে পারে। এ ব্যাপারে তার মত হচ্ছে, প্রথমে সুনির্দিষ্টভাবে Threat Perception করতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে, এ উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা এমন একটি অবস্থানে রয়েছি, যার পাশে রয়েছে দু'টি নিউক্লিয়ার পাওয়ার এবং যাদের মাঝে যে কোন সময় যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ নিউক্লিয়ার ফলআউটের শিকার হতে পারে এমন আশংকাও প্রকাশ করেছেন। তার মতে সবদিক বিবেচনা করে আমাদের আত্মরক্ষার যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। গড়ে তুলতে হবে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী। তবে যেহেতু আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে বলা আছে 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' তাই আমরা কোন আগ্রাসী মনোভাব

নিয়ে সশস্ত্র বাহিনী গঠন করব না। কিন্তু আক্রান্ত হলে নিজেদের রক্ষার জন্য একটি কার্যকর শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী অবশ্যই গড়ে তুলব। এ নিয়ে তার মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংশয় নেই। এছাড়া তিনি এও জানান যে, আমরা রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিলেও আমাদের প্রতিরক্ষা হবে সক্রিয় 'অফেনসিভ ডিফেন্স।'

অবশ্য সার্বিকভাবে তিনি মনে করেন যে, বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও পররাষ্ট্র নীতি হবে প্রাথমিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ বা ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স ও সশস্ত্র বাহিনী হবে সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স।

এছাড়া এতদঞ্চলের কৌশলগত পরিস্থিতি ও ব্যালান্স অফ পাওয়ার বিবেচনায় সম্ভাব্য শত্রুকে মোকাবিলার ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ শক্তির বন্ধুত্ব সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে লে. জে. মাহবুবের অভিমত। তার মতে, এ বন্ধুত্ব আমাদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী শক্তি বা শক্তিসমূহের জন্য detterent হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এ যাবত বাংলাদেশের শত্রু-মিত্র নির্ধারণ, হুমকির খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ, সামরিক জোট গঠন বা কোন বড় দেশের বন্ধুত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা-যাকে প্রতিরক্ষা নীতিও বলা যায়, তা কেন প্রণয়ন করা হয়নি- এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের যে প্রতিরক্ষা নীতি নেই-তা বলা যাবে না। লিখিত না হলেও সংবিধান ও পররাষ্ট্রনীতির আলোকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বরাবর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তার মতে, এটা তো কোনভাবেই হতে পারে না যে, আমাদের কেউ আক্রমণ করলে আমরা চুপচাপ বসে থাকব। বরং এটাই আমাদের নীতি যে, আক্রান্ত হলে আমরা প্রতিরোধ করব সর্বশক্তি দিয়ে এবং এর পাশাপাশি শক্তি বৃদ্ধির জন্য সামরিক বাজেট বাড়ানোর পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি বলেন, পূর্বে হয় তো আমরা আর্থিকভাবে একটি দরিদ্র দেশ ছিলাম। কিন্তু খনিজসম্পদ আবিষ্কৃত হওয়ার প্রেক্ষিতে যখন আমাদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ আসবে, তখন অবশ্যই প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হবে।

এমনকি তিনি মনে করেন, সাম্প্রতিক সময়েও সামরিক বাজেট বাড়ানো সম্ভব। এ ব্যাপারে তার সাজেশন হল, প্রতিবছর বিপুল দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপচয়ের ফলে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট হচ্ছে। এগুলো শক্ত হাতে বন্ধ করে খুব সহজেই সামরিক খাতসহ অপরাপর উন্নয়নমূলক খাতে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদেরও সহযোগিতা তিনি কামনা করেছেন। কারণ তার মতে, সামরিক বাজেট কমানোর কথা না বলে বুদ্ধিজীবীদের উচিত দুর্নীতি অপচয় বন্ধে সোচ্চার হওয়া। অবশ্য এখনও যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তারও সঠিক সদ্ব্যবহার হচ্ছে না বা অনেকাংশেই অপচয় হচ্ছে বলে জে. মাহবুব আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। জরুরী বা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যা প্রয়োজন তা না করে ভিন্ন খাতে অর্থ অপচয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে প্রথমে সংগ্রহ করতে হবে প্রয়োজনীয় উন্নত সমরাস্ত্র, দিতে হবে আধুনিক প্রশিক্ষণ, তারপর আসবে অন্যান্য প্রসঙ্গ। অথচ এখন তা হচ্ছে না। তাই বরাদ্দকৃত বাজেটকে কৌশলে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে প্রতিরক্ষা কাঠামোকে শক্তিশালী করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন সাবেক সেনাপ্রধান।

এদিকে বাংলাদেশের মত দেশে সশস্ত্র বাহিনী একটি অনুৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান, যার আদৌ প্রয়োজন নেই, এ কথা যারা বলেন, তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে জে. মাহবুব বলেন, এ ধরনের কথা কেবল অর্বাচীনরাই বলতে পারেন। সশস্ত্র বাহিনী হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার মূল প্রকরণ। এখানে উৎপাদনশীলতা বা অনুৎপাদনশীলতার কোন প্রসঙ্গ উঠতে পারে না। আর যদি উঠেও তা হলে বলতে হয়, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দক্ষ ও পেশাদার একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্তমান বিশ্বে শান্তিরক্ষা মিশনে সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউটার, যাদের 'এক্সপোর্টার অফ পিস'ও বলা যায়। এরা প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাও রেমিটেন্স হিসেবে প্রদান করে আসছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে বাঁচিয়ে দিচ্ছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অনেক স্থানে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ নির্মাণ করেও সশস্ত্র বাহিনী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে। তাই তার মতে, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কখনই দেশের জন্য কোন বোঝা নয়। বরং শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সাম্যাবস্থা যাতে বজায় থাকে এবং নিরাপত্তা প্রশ্নে বাংলাদেশ স্বনির্ভর হতে পারে- সে জন্যও একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী থাকা প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই সশস্ত্র বাহিনী কি কনভেনশনাল না সিটিজেন আর্মি হবে-এ নিয়েও সুচিন্তিত মতামত রয়েছে তার। এ ব্যাপারে তিনি জানান, আমাদের আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের আলোকে একমাত্র স্ট্যান্ডিং বা কনভেনশনাল বাহিনীই যথেষ্ট নয়; বরং এর পাশাপাশি একটি সেকেন্ড লাইন ফোর্সও তৈরি করতে হবে, যাদের মাধ্যমে জনগণকে প্রয়োজনে সংগঠিত ও প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হবে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়ে প্রায় এক কোটি জনবল সমৃদ্ধ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের স্মৃতিচারণ করে তিনি জানান, প্রচলিত বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রাখার জন্য আবার এই আনসার, ভিডিপি সদস্যদের সে সময় সেনাবাহিনীর সথে যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়াতেও নিয়োজিত করা হত। 'অপারেশন আয়রন শিল্ড' ছদ্মনামে এ ধরনের একটি মহড়ার কথাও জানান জে. মাহবুব।

পরবর্তীতে তিনি যখন আনসার ভিডিপি'র মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন তখনও সেই প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল বলে তিনি জানান। তবে এ ধরনের দ্বিতীয় সারির নিরাপত্তা বাহিনী গড়ে তোলা হলেও একটি আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত স্ট্যান্ডিং আর্মি থাকতেই হবে-এ মন্তব্য করে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ অনেক পথ পেরিয়ে প্রশিক্ষণে, অস্ত্রে ও আধুনিকায়নে, শৃংখলার মানদন্ডে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এ ধরনের একটি দেশপ্রেমিক, দক্ষ সেনাবাহিনীকে কমান্ড করার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ সেনাবাহিনী যুদ্ধে, শান্তিতে তাদের পেশাগত দক্ষতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সততা ও নেতৃত্বের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটাবে। হবে নিবেদিতপ্রাণ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশকে রক্ষা করবে। জাতীয় সেনাবাহিনী হিসেবে তারা কোন রাজনৈতিক বিতর্কে জড়াবে না। কোন কুচক্রী মহল বা উচ্চাভিলাষী জেনারেলের ষড়যন্ত্রের দাবার

ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। কারণ তার মতে, বাংলাদেশের সব কিছুর শেষ ভরসা হচ্ছে এই সশস্ত্র বাহিনী। তাই একে সবদিক থেকে হেফাজতে, বিতর্কের উর্ধ্বে রাখা প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকেরই পবিত্র কতর্ব্য।

(দৈনিক ইনকিলাব, ২৫/০৪/২০০০)

ভিয়েতনাম আফগানিস্তানে কোন আগ্রাসী শক্তি বিজয়ী হতে পারেনি, এ দেশেও পারবে না

ছোট হোক বড় হোক একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী আমাদের থাকতেই হবে, এর বিকল্প নেই

মে. জে. (অব.) জেড এ খান, পিএসসি

মে. জে. (অব.) জেড এ খান, পিএসসি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ সালে BIISS অর্থাৎ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজের মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োজিত থাকার সময় সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্ট্র্যাটেজিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা তাঁর কলামগুলো ইতোমধ্যেই আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা নীতি ও মতবাদ নিয়ে তাঁর রয়েছে সুচিন্তিত বক্তব্য।

তাঁর মতে, প্রতিরক্ষা মতবাদ নির্ধারিত হতে হবে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান, নাগরিক দায়িত্ববোধ ও বুদ্ধিজীবীদের সচেতনতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর উপর বর্তালেই চলবে না। পাশাপাশি তিনি এটাও সুস্পষ্ট করে বলেছেন, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ আগ্রাসনের পক্ষে না থাকলেও রণকৌশল ও দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার প্রশ্নে আক্রান্ত হলে আমাদেরও পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে। আর যারা মনে করেন প্রতিরক্ষা বাজেট কমিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে তিনি বলেন, যদি সশস্ত্রবাহিনী রাখতে হয় তা হলে এর সদস্যদের মনোবল ঠিক রাখার জন্য অবশ্যই উন্নত অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনে বাজেটও বাড়াতে হবে।

এখানে মে. জে. (অব.) জেড এ খানের সাথে সাক্ষাৎকারের পূর্ণবিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি কি রকম হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

মে. জে. (অব.) জেড. এ. খান ঃ এক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয়, আমাদের প্রতিরক্ষা মতবাদ হবে দেশকেন্দ্রিক। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থাৎ দেশের প্রতিটি

খাতকে হিসেবে রেখেই প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করতে হবে, সেখানে সশস্ত্রবাহিনীই কেবলমাত্র একক অনুষঙ্গ নয়। এভাবে সকল দিকে খেয়াল রেখে যে মতবাদ প্রণীত হবে, তা আমার মতে হওয়া উচিত রক্ষণাত্মক। যেহেতু আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে বলা আছে যে, আমরা প্রথমে কাউকে আক্রমণ করবো না, তাই সামগ্রিকভাবে আমাদের প্রতিরক্ষা মতবাদ হবে 'ডিফেনসিভ ইন নেচার' অর্থাৎ রক্ষণাত্মক প্রকৃতির। তবে এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, রণকৌশলের প্রয়োজনে যুদ্ধাবস্থায় সাফল্য লাভের জন্য শত্রু একদিকে আক্রমণ করলে আমাদের ভিন্ন ফ্রন্ট খুলতে হবে। একথা সত্য, আমরা প্রথমে কাউকে আক্রমণ করবো না। কিন্তু আক্রান্ত হলে আমাদের পাল্টা আক্রমণ চালানোর প্রস্তুতি থাকা অন্যায় কিছু হবে না বলে আমি মনে করি। কারণ, আত্মরক্ষা করতে হলে বা ডিফেন্স ঠিক রাখার জন্য ছোটখাট আক্রমণ করতে হয়। একে অফেন্সিভ ডিফেন্সও বলা যায়।

প্রশ্ন ঃ একটি দেশে লিখিত কোন প্রতিরক্ষা মতবাদ থাকার প্রয়োজন আছে কি-না? যদি থাকে তা হলে বাংলাদেশে তা এতদিন হয়নি কেন?

মে. জে. (অব.) জেড. এ. খান ঃ স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে অবশ্যই লিখিত প্রতিরক্ষা মতবাদ থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এতদিন এটা লিখিত আকারে প্রণয়ন করা যায়নি মূলত গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা না থাকার জন্য। অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক দুর্বলতা সামাল দেওয়ার জন্য সব সরকারকেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ফলে প্রতিরক্ষা নিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কেউ চিন্তা করার অবকাশ পায়নি। তবে সে সময় যে বাংলাদেশে আদৌ কোন পলিসি ছিল না তা নয়। তখন সশস্ত্রবাহিনীতে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কৌশল নির্ধারিত ছিল। যুদ্ধে কিভাবে শত্রুকে প্রতিহত করব-এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে বহুবার। এখনো এ ধরনের কৌশল রয়েছে সশস্ত্রবাহিনীর কাছে। কিন্তু সেগুলো যথেষ্ট নয়। তাই এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদিকে নজর দেয়া দরকার। এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে আমাদের প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রটেকটিভ, ডিফেনসিভ না-কি এগ্রেসিভ হবে। সার্বিকভাবে লক্ষ্য রেখে রাজনীতিবিদরা মূলত ঠিক করবেন স্ট্র্যাটেজি এবং সশস্ত্রবাহিনীর কাজ হলো সে নীতি বাস্তবায়ন করা। তবে মনে রাখতে হবে, রাজনীতিবিদদের প্রণীত নীতির আলোকে রণকৌশল নির্ধারণ করবে সশস্ত্রবাহিনী। অর্থাৎ কমান্ড, কন্ট্রোল, কমিউনিকেশন ও ইন্টেলিজেন্স প্রক্রিয়া কি হবে তা প্রণয়ন ও সামগ্রিক যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণের ভার থাকবে সশস্ত্রবাহিনীর কাঁধে। এখানে তাই বলা যায়, প্রতিরক্ষা নীতির মূল অংশ অর্থাৎ স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব এবং এর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে সশস্ত্রবাহিনীর কর্তব্য। অবশ্য স্ট্র্যাটেজি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার বা রাজনীতিকগণ তিন বাহিনীপ্রধানদের মতামতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেবেন এটাই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত তার প্রতিরক্ষা বাজেট শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি করেছে। এই আলোকে বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা বাজেট কি বাড়ানো বা কমানো উচিত?

মে. জে. (অব.) জেড. এ. খান ঃ একথা সত্য যে, আমাদের নিরাপত্তার প্রতি শুধু ভারতের পক্ষ থেকেই মূল বা সরাসরি আক্রমণ আসতে পারে। এক্ষেত্রে মায়ানমারের প্রসঙ্গও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় আমরা তো প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের সমান বাজেট প্রণয়ন করতে পারি না। এটা সম্ভবও নয়। কিন্তু অবশ্যই ব্যালান্স রক্ষা করার জন্য আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। টাকার মান অবমূল্যায়ন বা ইনফ্লেশন হওয়ায় যেমন এমনিতেই বাজেট বাড়ানো দরকার, তেমনি যদি সার্বভৌমত্ব রক্ষার লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনী রাখতে হয়, তা হলেও এর সৈনিকদের মনোবল ঠিক রাখার জন্য সাধ্যমত অর্থ বরাদ্দ করার কোন বিকল্প নেই। তবে এটা যেন মাত্রাহীন না হয়, যাতে অপরাপর উন্নয়নমূলক খাতে এর ব্যাপক বিরূপ প্রভাব না পড়ে। মূলতঃ আমাদের আর্থিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে প্রশিক্ষণ, উন্নত অস্ত্র সংগ্রহে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিভিন্নমুখী প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে। একে আমরা মাল্টিপ্লায়ার ব্যবহার করাও বলতে পারি। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সেই বিখ্যাত উক্তি 'উই উইল ইট গ্রাস ফর থাউজেন্ড ইয়ারস...,' এ জাতীয় অবাস্তব চিন্তা না করে আমাদের ঘাটতি পুরণ করতে হবে দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে। সশস্ত্রবাহিনীর আকার হয় তো আমরা আপাতত খুব একটা বাড়াতে পারব না। তাই উন্নতমানের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, দেশপ্রেম, মনোবল দিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করে নেব। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ে আমাদের জরুরী ভিত্তিতে নজর দিতে হবে। সেটা হল, সমর সরঞ্জাম উৎপাদনে যতটুকু সম্ভব স্বাবলম্বী হতে হবে এবং বিদেশ থেকে আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহ করলে এমন কোন স্থান থেকে সমরাস্ত্র কেনা ঠিক হবে না, যেখান থেকে আমরা প্রয়োজনে বা জরুরী অবস্থায় খুচরা যন্ত্রাংশ ও যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাৎক্ষণিক ঘাটতি পূরণে মূল অস্ত্র সরবরাহ (Replenishment) পাবো না। আশঙ্কার কথা, এখন এ ধরনের কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এখন অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে ঠিকই, আধুনিক অস্ত্রের কথাও বলা হচ্ছে, অথচ মূল লক্ষ্য থাকছে উপেক্ষিত। এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। তাই অর্থ সঠিক খাতে, সঠিকভাবে বিবেচনা করে কাজে লাগানোর চিন্তা করাও বরাদ্দকৃত সামরিক বাজেটের সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলে থাকেন, আমরা বিশাল ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভারতের রয়েছে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সেনাবাহিনী। সুতরাং ভারতের সাথে আমাদের যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমাদের একটা ছোট সেনাবাহিনী থাকতে হবে, যে বাহিনী মূলতঃ জাতীয় দুর্যোগকালীন সময়ে ভূমিকা পালন করবে। এমনকি কেউ কেউ এমনও বলে থাকেন যে, আমাদের মত দেশে সেনাবাহিনী থাকারই দরকার নেই- এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

মে. জে. (অব.) জেড. এ. খান ঃ যারা বলেন সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজন নেই, তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই পৃথিবীতে এমন একটি স্বাধীন দেশ কি আছে, যার সশস্ত্র বাহিনী নেই। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্ন থাকলে সশস্ত্রবাহিনীও থাকতে হবে। এটা

সার্বভৌমত্বের প্রতীকও বটে। অনেকে সুইজারল্যান্ডের প্রসঙ্গ তোলেন। তাদেরও জানা দরকার, সে দেশে অনেক শক্তিশালী সুসংগঠিত সশস্ত্রবাহিনী রয়েছে, যা অত্যাধুনিক সব সমরাস্ত্রে সজ্জিত। এর পাশাপাশি সুইজারল্যাণ্ডের সকল সক্ষম নাগরিককেই প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশাল সেকেন্ড লাইন ফোর্স গঠন করা হয়েছে। তাই আমি নিরপেক্ষ থাকলাম কি থাকলাম না তা সশস্ত্রবাহিনী রাখা না রাখার প্রসঙ্গের সাথে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়। আসলে যারা বাংলাদেশে ভারতকে মহাশক্তিশালী বা বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করে সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজন নেই-একথা বলেন, তারা আসলে জুজুর ভয় দেখিয়ে, প্রপাগান্ডা করে জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলতে চায়। খোঁজ নিলেই দেখা যাবে স্বার্থান্বেষী এই মহলটিকে কেউ একথা বলার জন্য বলেছে, শিখিয়ে দিয়েছে। যারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় এটা তাদেরই চক্রান্ত, যাতে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জনগণ বিভ্রান্ত হয়। এটা তো আমাদের জানা আছে যে, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী শৃংখলাবদ্ধ ও কমান্ড চ্যানেলে বিশ্বাসী সংগঠন বলতে একমাত্র সশস্ত্রবাহিনীই রয়েছে। সুতরাং যে কোন বিপক্ষশক্তি শান্তিকালীন সময়ে চেষ্টা করবে এই বাহিনীর আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানতে এবং এমন প্রপাগান্ডা করবে দেশবাসী যাতে এদের (সশস্ত্রবাহিনী) দক্ষতা ও প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠায়। ছোট হোক, বড় হোক সাধ্যমত একটা শক্তিশালী প্রতিরক্ষাবাহিনী আমাদের থাকতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। সবচেয়ে বড় কথা, যুদ্ধে যে কেবল বড় দেশ বা বৃহৎ সেনাবাহিনীই জিতবে তা নয়। ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান এমনকি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আগ্রাসী শক্তি বিজয়ী হতে পারেনি। ছোট দেশ কিউবাও তাই মাথা উঁচু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর স্যাটেলাইটের এ যুগে কারো পক্ষে আক্রমণ চালিয়ে কোন দেশ দখল করা সম্ভব নয়। একটা দেশ দখল করা খুব কঠিন। কারণ যে কোন আগ্রাসনের খবর স্যাটেলাইট, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জাতিসংঘসহ সবার কাছেই পৌছে যায়। ফলে বিশ্ব সোচ্চার হয়ে ওঠে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিরোধেও এগিয়ে আসে এবং এতে স্বভাবতই আগ্রাসী ও আগ্রাসন নিরুৎসাহিত হয়। ভারতও তাই সহজে বাংলাদেশ দখল করতে পারবে না। আমাদের সশস্ত্রবাহিনী অবশ্যই সে আক্রমণ প্রতিহত করবে। পাশাপাশি এগিয়ে আসবে এদেশের প্রতিটি মানুষ। ১৩ কোটি জনতা সক্ষম, সকলেই হবে যোদ্ধা এবং এদের কেউ পরাজিত করতে পারবে না। দেশের ভূমি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আমরা জীবন দেব। এক্ষেত্রে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর প্রশিক্ষণ, কমিটমেন্ট হলো ঃ We can be defeated in a battle but we can't be captured. অর্থাৎ হয় তো কোন খন্ড যুদ্ধে আমরা পরাজিত হতে পারি, কিন্তু আমাদের দেশ কেউ দখল করতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী কি কনভেনশনাল না সিটিজেন আর্মি হওয়া উচিত?

মে. জে. (অব.) জেড. এ. খান ঃ এক্ষেত্রে একটা ব্যালান্স থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তাই বাংলাদেশে যেমন একটি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত, সুসংগঠিত

কনভেনশনাল সশস্ত্রবাহিনী থাকবে, তেমনি একটি জনভিত্তিক সেকেন্ড লাইন ফোর্সও গঠন করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, সশস্ত্রবাহিনীর বাইরে আমরা আরো কয়েক লাখ নাগরিককে বেছে নিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে পারি। যুদ্ধাবস্থায় এরা কে, কোথায় গিয়ে রিপোর্ট করবে তা পুণর্নির্ধারিত থাকবে। সশস্ত্রবাহিনীও জানবে এদের অবস্থান সম্পর্কে। ফলে জরুরী অবস্থায় সমন্বয় সাধন করে প্রয়োজনীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে, যাতে শত্রু আকস্মিক সুবিধা আদায় করতে না পারে। তবে এভাবে জনসম্পৃক্ত বাহিনী গঠনে রিস্কও আছে। এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহৃত হতে পারে। বিশৃংখলাও সৃষ্টি করতে পারে সামরিক প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে। তাই যথাসম্ভব কঠোরভাবে সিকিউরিটি ভেরিফিকেশন করে তবেই এদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এখানে এ ধরনের সেকেন্ড লাইন ফোর্স গঠন সম্পর্কে আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করতে চাই। তিনি আনসার ও ভিডিপি গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে এ ধারণার জন্ম দেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে বিবেচনায় রেখে একটি ব্যালান্সড প্রতিরক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলা।

(দৈনিক ইনকিলাব, ২৬-০৪-২০০০)

পঁচিশ বছর মেয়াদী কথিত 'মৈত্রী চুক্তি'র জন্য প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ণ করা যায়নি

আমাদের প্রতিরক্ষাকে যুগোপযোগী করতে প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ঃ যারা এ নিয়ে হৈ চৈ করেন তারা 'লেন্দুপ দোর্জি'র দল

মে. জে. (অব.) এম. এ. মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর দীর্ঘ ত্রিশ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো একটি লিখিত বা আনুষ্ঠানিক প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়নি। এর পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল ১৯৭২ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তৎকালীন সরকারের স্বাক্ষরিত তথাকথিত 'শান্তি-মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি'। কারণ, পঁচিশ বছর মেয়াদী এই চুক্তিতে উল্লেখ ছিল যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্র তৃতীয় কোন পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হলে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তা আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। ফলে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর কাছে অনেকাংশে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ি। সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে এ মন্তব্য করলেন মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সাহসী যোদ্ধা মে. জে. এম এ মতিন দীর্ঘদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। চট্টগ্রামস্থ ২৪ পদাতিক

ডিভিশনের জিওসি'র দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি আরো ক'টি ডিভিশন কমান্ড করেছেন। দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে ১৯৯৬ সালে তিনি প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর অর্থাৎ ডিজিএফআই-এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপালনকালীন ২০ মে '৯৬ তারিখে সাফল্যের সাথে একটি ক্যু বা সামরিক অভ্যুত্থান প্রতিরোধে মুখ্য ভূমিকাও পালন করেন। বর্তমানে রাজধানী থেকে বহুদূরে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বসবাসরত মে. জে. এমএ মতিন একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনা করছেন। দূরত্বের ব্যবধানকে অতিক্রম করে সম্প্রতি তিনি দৈনিক ইনকিলাবকে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সুচিন্তিত মতামত সমৃদ্ধ তাঁর সাক্ষাৎকারটি নিম্নে পত্রস্থ করা হল ঃ

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কি কনভেনশনাল না সিটিজেন আর্মি হওয়া উচিত?

মে. জে. (অব.) এম এ মতিন ঃ বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেক দেশই তার স্বাধীন-সার্বভৌম সত্তাকে বজায় রাখার তাগিদে বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষাকল্পে এবং সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিজস্ব প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করে থাকে। কোন রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নীতি মূলত বিশ্ব মানচিত্রে তার অবস্থান, পারিপার্শ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিরাজমান সম্পর্ক, অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি, জাতীয় স্বার্থ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিকে অনুসরণ করেই কোনও দেশ কালক্রমে তার কাংখিত ব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিরক্ষানীতিও পরিবর্তিত হতে পারে।

সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমারের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। যদিও ভারতের সাথে দীর্ঘদিন যাবত বেশ কিছু সমস্যা অমীমাংসিত অবস্থায় ঝুলে আছ। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, চলমান বিশ্বে কারো সাথে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, এমনকি দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে স্থাপিত তথাকথিত সখ্যতাও চিরস্থায়ী নয়। ইতিহাস আরো সাক্ষ্য দেয় যে, কোন দেশ শুধুমাত্র তার প্রতিবেশী নয়, অন্য যে কোন দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে। বাংলাদেশের বেলায় এ ধরনের কোন সম্ভাবনা আপাতঃদৃষ্টিতে নেই। কারণ, বাংলাদেশ তিনদিক থেকে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই আমাদের নাজুক ভৌগোলিক অবস্থানহেতু প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং মিয়ানমারের বিভিন্ন পদক্ষেপের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয় আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। ভেবে দেখতে হবে, আমাদের স্বাধীন সত্তা তথা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি কোথায় নিহিত, এমন হুমকি কোথা থেকে আসতে পারে। আমাদের ভুললে চলবে না, আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সরাসরি প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকেই যে আসবে তা নয়; বরং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের

সাহায্যপুষ্ট আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছ থেকেও তা আসতে পারে। কাজেই সার্বিক বিবেচনায় আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত, উঁচুমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সর্বোপরি জনসমর্থনপুষ্ট একটি কনভেনশনাল সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে-যে সশস্ত্র বাহিনী হবে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় সক্ষম। পররাজ্য গ্রাস নয়, আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা হবে মূলত আত্মরক্ষামূলক। আক্রান্ত হলে নিজ ভূখন্ডকে শত্রুমুক্ত রাখা। তবে কথায় আছে Offence is the best form of defence. কাজেই আক্রান্ত হলে প্রতিঘাত করা এবং প্রয়োজনবোধে যুদ্ধকে শত্রুর ভূখন্ডে ছড়িয়ে রাখতে হবে। আমাদের ভূখন্ড আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ, যা 'defender's heaven' নামে পরিচিত। অন্য কথায়-বাংলার মাটি, দুর্জয় ঘাঁটি। এ মাটি দুর্বৃত্তকে আসতে দেবে, যেতে দেবে না।

এদিকে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন হচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তাই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে প্রতিরক্ষা নীতি নির্ধারণী বিষয়ে দল-মত নির্বিশেষে জাতীয় ঐকমত্য স্থাপন করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি, সশস্ত্র বাহিনীর আকৃতি-প্রকৃতি কেমন হবে, সমরাস্ত্র ব্যবস্থা কি হবে এবং তা কোথা থেকে সংগৃহীত হবে এবং সর্বোপরি প্রতিরক্ষা মতবাদসহ আমাদের সম্ভাব্য স্ট্র্যাটেজি কি হবে এবং এ বিষয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা হবে কোন্ পর্যায়ের। আমাদের বিপুল জনসংখ্যা আমাদের সম্পদ, আমাদের জন্য আশীর্বাদ। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় Second line Force (সেকেন্ড লাইন ফোর্স) হিসেবে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। সেকেন্ড লাইন ফোর্স হিসেবে আমাদের এ বিপুল জনশক্তিকে সংগঠিত করতে হবে, সেনাবাহিনীর অধীনে তাদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং সর্বোপরি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাদের জন্য হাতিয়ার ও গোলাবারুদ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তারা জাতীয় সঙ্কটকালীন সময়ে সেনাবাহিনীর অধীনে সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রদত্ত ভূমিকা পালন করবে। আমাদের ভূখন্ড বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে মরণ আঘাত হানবে এবং জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত হবে। ততদিনে আমাদের সেকেন্ড লাইন ফোর্স সংগঠিত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে এবং সেনা সদস্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাবে। আমাদের ভুললে চলবে না, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ছয়টি ব্যাটালিয়নই ছিল মুক্তিযুদ্ধের Nucleus বা মূল কোর। তৎকালীন পাকিস্তান সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে কর্মরত হাতেগোণা ক'জন বাঙ্গালী সামরিক অফিসার সেদিন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে এদেশের আপামর ছাত্র-জনতা সংগঠিত হয়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার প্রয়াসে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ব্রতী হয় এবং পরিণামে এদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। তদ্রূপ ভবিষ্যত যুদ্ধেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী হবে আমাদের

সর্বাত্মক যুদ্ধের মূল কোর। কাজেই সশস্ত্র বাহিনীকে দুর্বল রেখে এদেশের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা সম্ভবপর হবে না।

প্রশ্ন ঃ একটি দেশে লিখিত কোন প্রতিরক্ষা নীতি থাকার প্রয়োজন আছে কি-না। যদি প্রয়োজন থাকে তা হলে এতদিন বাংলাদেশে তা হয়নি কেন?

মে. জে. (অব.) এম এ মতিন ঃ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেক দেশই নিজস্ব প্রতিরক্ষা নীতি অনুসরণ করে থাকে। ভারত ব্যতীত এ উপমহাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রে যেমন-পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং নেপালেরও নিজস্ব প্রতিরক্ষা নীতি আছে। প্রতিরক্ষা নীতি ব্যতীত কোন কার্যকরী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। কেননা, সেনাবাহিনীতে কোন ফরমেশন অথবা ইউনিটকে যখন কোন প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত করা হয় তখন তাকে অবশ্যই তার সম্ভাব্য শত্রুকে চিহ্নিত করে খোলামেলাভাবে বলতে হবে। তার শত্রু কে, কাকে সে মোকাবিলা করবে এবং কেন করবে? সম্ভাব্য শত্রুর সংখ্যা, শক্তি, তাদের প্রশিক্ষণের মান, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা ছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সীমাবদ্ধতার কথাও বিস্তারিত অবহিত করতে হবে। এসব বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় থেকেই লিখিতভাবে না হলেও একটি অলিখিত প্রতিরক্ষা নীতির উপর ভিত্তি করেই আমাদের বর্তমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রচিত হয়েছে এবং বাহিনী সদর দপ্তরসমূহ তাদের প্রশিক্ষণ ও অপারেশন সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। আমাদের সে অলিখিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই আমাদের সেনাবাহিনীতে কয়েকটি ফরমেশনও দাঁড় করানো হয়েছে, যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম বা উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সজ্জিত করা হয়েছে। তবে এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের স্বাধীনতার তিন দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে অথচ বিগত তিন দশকেও আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিরক্ষা নীতি প্রণীত হয়নি। বর্তমান সময়ে এ্যাডহক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি এবং সে অনুযায়ী সৃষ্ট এক অপর্যাপ্ত ও অবহেলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে মনে হয় যে, বাংলাদেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে এদেশের স্বাধীন সত্তাকে রক্ষা করা এদেশের সেনানায়কদেরই একমাত্র দায়িত্ব, এতে অন্য কারো কোন মাথাব্যথা নেই। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে এরূপ উদাসীনতা চলতে পারে না। বাংলাদেশের নিজস্ব কোন প্রতিরক্ষা নীতি না থাকার পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল এই যে, ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসার পর ভারত সরকার এবং তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে তথাকথিত শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি নামে ২৫ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এদেশের জনগণ এ চুক্তিকে একটি গোলামি চুক্তি হিসেবেই অভিহিত করে থাকেন। কারণ, এ চুক্তিতে বর্ণিত শর্তাবলী শুধুমাত্র দু'দেশের মাঝে তথাকথিত

দীর্ঘমেয়াদী শান্তি তথা মৈত্রী স্থাপনের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর প্রসার ছিল আরো ব্যাপক এবং গভীর। চুক্তিতে উল্লেখ ছিল যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্র কোন তৃতীয় রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে কি পদক্ষেপ নেয়া যায় তা তারা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কাজেই ২৫ বছর মেয়াদী তথাকথিত 'শান্তি-মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি'র মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রতিবেশীর কাছে অনেকাংশে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। এরূপ দায়বদ্ধ অবস্থায় বাংলাদেশের পক্ষে প্রকাশ্যে তার শত্রুকে চিহ্নিত করা সম্ভবপর ছিল না। তদুপরি সরকারের উচ্চপদে আসীন আমাদের কতিপয় নীতিনির্ধারকের মাঝেও বিদ্যমান এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা এবং বিশেষ করে একটি চিহ্নিত মহল কর্তৃক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে অপপ্রচার বাংলাদেশের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ণের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে বলে অনেকেই মনে করেন।

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত তার প্রতিরক্ষা বাজেট শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি করেছে। এই আলোকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো না কমানো উচিত?

মে. জে. (অব.) এম এ মতিন ঃ এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভারত দিনের পর দিন তার সমরশক্তি এবং সামরিক ব্যয় বাড়িয়েই চলছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো বা কমানো উচিত-তার ওপর মন্তব্য করার পূর্বে দু'দেশের জনসংখ্যা এবং আনুপাতিক হারে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেটের ওপর সামান্য আলোকপাত করার প্রয়োজন। গত ২৯ ফেব্রুয়ারী ভারতীয় পার্লমেন্টে পেশকৃত ২০০০-২০০১ সালের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ১৩.৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১ হাজার কোটি রূপী। চলতি বাজেটের চেয়ে প্রস্তাবিত বাজেটে সামরিক ব্যয় বাড়ানো হয়েছে ১৩ হাজার কোটি রূপী। শতকরা হারে এই প্রস্তাবিত বাজেট বর্তমান প্রতিরক্ষা বাজেটের চেয়ে শতকরা ২৮ শতাংশ বেশী। ভারতের প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষা বাজেট বিগত ৫৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি। ভারত এবার তার প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েছে বাংলাদেশী মুদ্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। অপরপক্ষে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২ কোটি ৮০ লাখ এবং তার প্রতিরক্ষা বাজেট ৩ হাজার কোটি টাকারও কম। প্রতিবেশী ভারতের জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে বাংলাদেশের চেয়ে সাড়ে সাত গুণ বেশী অথচ তার প্রতিরক্ষা বাজেট ২০ গুণ বেশী। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস এবং সশস্ত্র বাহিনী সংকোচনের একটি বিশেষ প্রবণতা বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভারত তার ব্যতিক্রম। ভারত তার সশস্ত্র বাহিনীর সম্প্রসারণ না ঘটালেও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার ও সম্প্রসারণে অধিকতর মনোযোগী হয়েছে।

অথচ আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি যে, চলতি আর্থিক বছরের শুরুতে বাংলাদেশ সরকার যখন মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা বাজেট পেশ করেন, তখন একটি

বিশেষ মহল তাৎক্ষণিকভাব তুমূল হৈ চৈ বাধিয়ে দেন। তারা দাবী জানান যে, প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে টাকা কেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সামাজিক কনকল্যাণমূলক খাতে সে অর্থ বরাদ্দ করা হোক। বাংলাদেশের মত দারিদ্র্যপীড়িত দেশে এমন দাবী উত্থাপন অযৌক্তিক নয়। তবুও ন্যূনতম প্রয়োজন বলে একটি কথা আছে। প্রতিবেশী ভারত নিরন্তর তার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে যাবে আর আমরা শুধু অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখব তা কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? তদুপরি ভারতের এই বিশাল প্রতিরক্ষা বাজেটের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই বা কি? কারগিল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের মত একটি ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর মোকাবিলায় ভারতের পক্ষে ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এক দানবীয় আকৃতির প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রয়োজন কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? বলা চলে যে, ভারতের এ সমরসজ্জা উপমহাদেশের বাইরে বহির্বিশ্বের কোন শক্তিকে মোকাবিলার জন্য নিশ্চিয়ই নয়। বরং ভারতের এ সমরসজ্জা পাকিস্তানসহ অপরাপর সকল ছোট ও অপেক্ষাকৃত অতি দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় সামর্থ্য অনুযায়ী আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করে তোলার জন্য সচেষ্ট হওয়ার পথে বাধা কোথায়? এটা এখন সময়ের দাবীও বটে। আমাদের সেনাবাহিনীর ডিভিশনসমূহের জনবল ও হাতিয়ার বিধিসঙ্গত প্রাধিকার (Authorization)-এর তুলনামূলক নিতান্তই অপ্রতুল। বন্ধু রাষ্ট্র চীনের সহায়তায় আমাদের অস্ত্র ভান্ডারের স্বল্পসংখ্যক আধুনিক অস্ত্রের সংযোজন ঘটলেও সেগুলোকে সচল রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় খুচরা যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ-এর অভাব সব সময়ই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কোন আন্তরিক প্রয়াস কখনো চালানো হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ ক্ষমতায় এসে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কথা সবাই সব সময় বেশ জোর দিয়েই বলে থাকেন। উল্লেখ্য, রাইফেলসহ কতিপয় ছোট হাতিয়ারের জন্য ব্যবহৃত এ্যামুনিশন আমাদের সমরাস্ত্র কারখানায় প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরী হলেও ভারী হাতিয়ারসমূহের জন্য ব্যবহৃত গোলাবারুদ এদেশে তৈরী হয় না। ধার অথবা ক্রয়কৃত এ্যামুনিশন দিয়ে যুদ্ধ করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা কোনদিনই সম্ভবপর নয়। এ সত্য অতি নিকট-অতীতে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে মিয়ানমার সেনবাহিনী কর্তৃক অতর্কিতে হামলা চালিয়ে আমাদের রেজুপাড়া বিওপি দখল থেকে সৃষ্ট সীমান্ত উত্তেজনার সময় আমরা অসহায়ের মত অনুভব করেছি। তাই সংকটকালীন সময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য নিজস্ব আধুনিক সমরাস্ত্র কারখানা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

তদুপরি বলা চলে যে, একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের স্বাধীন অস্তিত্ব তথা নিরাপত্তার বিষয় অন্য সব ইস্যুর উর্ধ্বে স্থান পেয়ে থাকে। এ ইস্যুতে কোন প্রকার আপোষ তথা শৈথিল্যের কোন অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। আমি বলব না যে, প্রতিবেশী ভারতের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হবে। তবে উপমহাদেশে বিরাজমান ভূ-রাজনৈতিক (Geo-political) পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুযোগপযোগী করে তোলার জন্য প্রতিরক্ষা বাজেটকে অনেক বড় বলে যারা অহেতুক হৈ চৈ বাধিয়ে তোলেন তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই এদেশের জনগণের কাছে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরেন না। তারা এদেশকে ভারতের করদরাজ্যে পরিণত করার স্বপ্নে বিভোর। তারা আসলে এদেশে মুখোশধারী সিকিমের লেন্দুপ দোর্জির দল।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলে থাকেন, আমরা বিশাল ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভারতের রয়েছে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সেনাবাহিনী। সুতরাং ভারতের সাথে আমাদের যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমাদের একটি ছোট সেনাবাহিনী থাকতে হবে-যে বাহিনী মূলত জাতীয় দুর্যোগকালীন সময়ে ভূমিকা পালন করবে। এমনকি কেউ কেউ এমনও বলে থাকেন যে, আমাদের মত দেশে সেনাবাহিনী থাকারও দরকার নেই। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

মে. জে. (অব.) এম এ মতিন ঃ এ ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে নিবেদিত একটি বিশেষ মহল কর্তৃক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার। তবে একথা সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে একটি দেশ যত ছোট এবং দুর্বলই হোক না কেন সরাসরি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কম। যদিও চেচনিয়ায় রুশ আগ্রাসন এখনও অব্যাহত রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তি কর্তৃক দুর্বল ও অপেক্ষাকৃত ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্রে স্বাধীনতা হরণের কলা-কৌশলও পাল্টে গেছে। সরাসরি সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রকে দখল করে নেয়ার পরিবর্তে পরম হিতাকাংক্ষী বন্ধু সেজে উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল এখন আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তির মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আর সে কৌশলের অংশ হিসেবেই আধিপত্যবাদী শক্তি কর্তৃক সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাদের আজ্ঞাবহ এক পুতুল সরকার এবং ক্রমান্বয়ে তাদের মাধ্যমেই সেদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা হয় অচলাবস্থার। শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে সে দেশের জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরানো হয়, জাতিকে বিভক্ত করে তাকে পারস্পরিক হানা-হানি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত করে তার মনোবল তথা প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিনষ্ট করা হয়। এমন অবস্থায় আগ্রাসী শক্তির আজ্ঞাবাহীরা সিন্দবাদের ভূতের মতোই জাতির ঘাড়ে সুদৃঢ়ভাবে চেপে বসে। ফলে এমন এক সময় আসে যখন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অসহায় সে জাতি নিজের অজান্তেই নিজেকে সঁপে দেয় আধিপত্যবাদী শক্তির ইচ্ছার কাছে। এমনিভাবে এক অস্থিতিশীল কৃত্রিম রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিকিমকে গ্রাস করেছিল।

তাই আধুনিক বিশ্বে কোন জাতিকে তার স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা বজায় রাখার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়, বিশেষ করে তার প্রতিবেশী যদি হয় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী এবং তার চরিত্রে বদ্ধমূল থাকে আধিপত্যবাদী মনোভাব। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতও তার জন্মলগ্ন থেকেই সকল প্রতিবেশীর কাছে একটি আধিপত্যবাদী শক্তি

হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তার রয়েছে নিজস্ব প্রয়োজনের তুলনায় বহুগুণ বড় এক বিশাল সামরিক বাহিনী এবং গড়ে তুলেছে পারমাণবিক অস্ত্রসহ আধুনিক মারণাস্ত্রের এক বিশাল মওজুদ। এছাড়া অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির একনিষ্ঠ অনুসারী হচ্ছে ভারত।

একসময় আমরা দেখেছি যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতীয় উপদেষ্টাদের পরামর্শ ও কারসাজিতে আমাদের সেনাবাহিনী ক্রমশ সরকারী উদাসীনতা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে তোলার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসেবে সে সময় গড়ে তোলা হয় রক্ষীবাহিনী ও নানাবিধ ব্যক্তিগত বাহিনী। তদুপরি আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি চিহ্নিত অংশ বাংলাদেশে সেনাবাহিনী রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তারা চালিয়েছেন অপপ্রচার। তাদের মতে, ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ ছোট ও দুর্বল বিধায় সম্মুখ সমরে বাংলাদেশ কোনদিনই টিকে থাকতে পারবে না। তাই সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করে তারা কথায় কথায় সেনাবাহিনীকে ছেঁটে ফেলার উপদেশ বিতরণ করে এসেছেন। অথচ পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যারা তাদের শক্তিধর অতিকায় বৃহৎ প্রতিবেশীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ কিউবা ও তাইওয়ানের কথাই ধরা যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংলগ্ন কিউবার আয়তন ৪২ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর থেকে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বাধীন কিউবা কখনো আমেরিকার মত প্রবল পরাক্রমশালী পরাশক্তির কাছে নতিস্বীকার করেনি। একথা আমাদের অজানা নয় যে, ষাট এর দশকে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে বিবাদ দেখা দেয় তারই প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা এক ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধের শুরু হতে যাচ্ছিল। তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কিউবা থেকে রাশিয়ান মিসাইল স্থাপনাসমূহ সরিয়ে ফেলার জন্য ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে চরম হুমকি প্রদান করেছিলেন। কিউবান প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো আমেরিকান প্রেসিডেন্টের প্রদত্ত হুমকির কাছে নতিস্বীকার করেননি। বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেও কিউবা আজও স্বাধীন সত্তা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছে। বর্তমান বিশ্বের এমনিতর অপর একটি ক্ষুদ্র দেশ তাইওয়ান। যার আয়তন মাত্র ১৪ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২ কোটি ২৫ লাখ। তাইওয়ানের পার্শ্ববর্তী দেশ গণচীন। তুলনামূলকভাবে গণচীন তাইওয়ান-এর চেয়ে ২৭১ গুণ বড় এবং জনসংখ্যার দিক থেকে ৫০ গুণ বেশী। ১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর থেকে গণচীন কোন সময়ই তাইওয়ান (সাবেক ফরমোসা)-এর স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। আয়তন এবং জনসংখ্যার দিক থেকে এত ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাইওয়ান কিন্তু চীনের মতো প্রবল পরাক্রমশালী শক্তির বিরুদ্ধে সমান্তরাল অবস্থান গ্রহণ করে স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে টিকে থাকতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তাই বলে কিউবা বা তাইওয়ানের লোকজন তো কোনদিন তাদের শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার

বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেনি এবং বলেনি যে, পরম শক্তিধর প্রতিবেশীর সাথে সমান্তরাল অবস্থান তথা বৈরীভাব পোষণ করে স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে চলা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ইস্ট এশিয়ার অন্যতম নগর রাষ্ট্র সিঙ্গাপুরের কথাও উল্লেখ করা যায়। তারও নিজস্ব প্রতিরক্ষা নীতি আছে। সিঙ্গাপুর তার প্রতিবেশী মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি আশংকা করে। তাই সিঙ্গাপুর তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এবং ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ একটি অতি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে।

যারা বলেন, সম্মুখ সমরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে টিকে থাকতে পারবে না, তাই আমাদের দেশে নামমাত্র একটি ছোট সেনাবাহিনী থাকলেই চলবে, তাদের ধারণা ভুল। কারণ আমাদের বোঝাতে হবে যে, প্রতিবেশী ভারত ইচ্ছে করলেই তার সমস্ত শক্তি নিয়ে বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। কোন অবস্থাতেই ভারত চীন ও পাকিস্তানের সাথে তার সীমান্তকে অরক্ষিত রাখবে না। ভারত তার পারমাণবিক শক্তি তিনদিকে ভারত বেষ্টিত বাংলাদেশের উপর প্রয়োগ করবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সংলগ্ন তার নিজস্ব ভূখন্ডের বেশ কিছু অংশ একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই।

একথা আমাদের মনে রাখতে হবে-জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতা রক্ষার্থে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে সগৌরবে মাথা উঁচু করে থাকার যোগ্যতা ইতোমধ্যেই অর্জন করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কারও দয়ার দানও নয়। এ সশস্ত্রবাহিনী শুধু এক রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠেনি, চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাও দিয়েছিলেন বাংলা মায়ের এক মহান সন্তান, বাঙ্গালী জাতির গৌরব ও গর্ব ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর বীর সেনানী 'এক অখ্যাত' (একটি বিশেষ মহল বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে তাকে এ বিশেষণেই ভূষিত করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে থাকে) মেজর জিয়াউর রহমান। একথাও দেশবাসীর অজানা নয় যে, এই অখ্যাত মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা ও পাকিস্তানী দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বদেশকে মুক্ত করার উদাত্ত আহবানের মাঝে এদেশের দিশেহারা মানুষ সেদিন খুঁজে পেয়েছিল দিক-নির্দেশনা। প্রাথমিক পর্যায়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী, ইপিআর এবং পুলিশ ও আনসার সদস্যদের সংগঠিত করে তোলা হয়। দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র গড়ে ওঠে সশস্ত্র প্রতিরোধ, তারা লিপ্ত হয় সম্মুখ সমরে। স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

এছাড়া ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে তথাকথিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দেশের অখন্ডতা রক্ষাকল্পে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় সন্ত্রাস দমন উপলক্ষে দায়িত্ব পালনকালীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সংযম, ধৈর্য, কর্তব্যনিষ্ঠা, অতি উঁচু মানের শৃংখলা এবং সর্বোপরি মানবিক গুণাবলী ও মূল্যবোধের উজ্জ্বল ও অনবদ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্বের যে কোন সেনাবাহিনীর জন্য তা

অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিরাজ করবে। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ রাইফেলস, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং আনসার ও ভিডিপি'র উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্য উক্ত সন্ত্রাস দমন অভিযানে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট তথাকথিত শান্তিবাহিনী সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে আমাদের এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা দখল করা তো দূরের কথা তারা আমাদের একটি ছোট্ট out post-ও আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে এবং এক মুহূর্তের জন্য দখল করে রাখতে সক্ষম হয়নি। শুধু তা-ই নয়-বন্যা, সাইক্লোন প্রভৃতি জাতীয় মহাদুর্যোগের দিনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশবাসীর আস্থা ও প্রশংসা কুড়িয়েছে। ভবিষ্যতেও যে কোন জাতীয় সঙ্কটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এদেশের আপামর জনতার সাথ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে একাত্তরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হবে। পরিশেষে আমি বলব, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা এনেছে, তাই এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতা সংরক্ষণের প্রতীক হিসেবে এ সেনাবাহিনীকে অবশ্যই মাথা উঁচু করে সগৌরবে দাঁড়াতে হবে। কেননা, ভবিষ্যত যুদ্ধেও আমাদের সশস্ত্রবাহিনী হবে আমাদের সর্বাত্মক যুদ্ধের Nucleus বা মূল কোর।

(দৈনিক ইনকিলাব, ২৯-০৪-২০০০)

দুর্বল নিরাপত্তা শত্রুকে আক্রমণে প্রলুব্ধ করে

বন্ধুত্ব বজায় রাখতেও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন

সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব এম, এ, হাকিম

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে কি হবে না তা সম্পূর্ণই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। তাই দেখা যায় ১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্ব প্রদান করেনি। পক্ষান্তরে '৭৫-পরবর্তী সরকারসমূহ যেমন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনামলে শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠনে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব জনাব এম. এ. হাকিম এই অভিমত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে তিনি জানান যে, পরবর্তী সরকারগুলোও প্রতিরক্ষা খাতে জে. জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত ধারা অব্যাহত রাখেন যা সাম্প্রতিক সময়েও অনুসরণ করা উচিত। দীর্ঘদিন বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব

পালনকারী জনাব হাকিম চাকরি সূত্রে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অঙ্গনসহ জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন। বেসামরিক কর্মকর্তা হলেও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ বা নীতি ও সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। দীর্ঘ এই অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ কিরূপ হওয়া উচিত- এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি দৈনিক ইনকিলাবকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এদেশের প্রতিরক্ষা নীতি বা মতবাদ হওয়া উচিত পররাষ্ট্রনীতিতে বর্ণিত আদর্শের পরিপূরক। সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়- এটাই হবে আমাদের মূলনীতি। তবে জনাব হাকিমের মতে, এই বন্ধুত্ব হতে হবে সমতার ভিত্তিতে। একথা মনে রেখেই আমাদের প্রতিরক্ষা মতবাদ হবে স্বকীয় চিন্তা, চেতনাপ্রসূত। তবে যেহেতু বাংলাদেশ ভৌগোলিক দিক দিয়ে একটি ছোট দেশ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্র্য তাই প্রাধিকার-ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য প্রাপ্ত সম্পদকে সকল সেক্টরে অধিকমাত্রায় ব্যয় করার দিকে সর্বপ্রথম নজর দিতে হবে এবং এসব বিষয় হিসেবে রেখেই বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি বা মতবাদ প্রণয়ন করা উচিত বলে জনাব এম এ হাকিমের অভিমত। তাঁর মতে, আমাদের প্রতিরক্ষা মতবাদের মূলমন্ত্র হবে আক্রমণ নয়, আত্মরক্ষা এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে প্রণয়ন করতে হবে কার্যকর প্রতিরক্ষা মতবাদ- যার আলোকে গড়ে উঠবে একটি আত্মরক্ষামূলক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এদিকে শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য বা কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব জানান, দেশের ভূখন্ড রক্ষার পাশাপাশি প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ অর্থাৎ তেল, গ্যাস, চুনাপাথর, কয়লা, কঠিন শিলা ইত্যাদির সুরক্ষা ও আহরণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের সাধ্যমত একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা অবকাঠামো গঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এ যাবৎ প্রতিরক্ষা নীতি কেন প্রণয়ন করা হয়নি- এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জনাব এম এ হাকিম বলেন, প্রতিরক্ষা নীতি যে লিখিত নেই তা বলা যাবে না। কারণ, যুদ্ধ নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি ওয়ার বুক রয়েছে। এছাড়া আছে Draft Defence of Bangladesh ordinance এবং Draft Defence of Bangladesh Rules. এগুলো স্বভাবতই টপসিক্রেট ডকুমেন্ট। তাই প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, সচিব ও সংশ্লিষ্ট ব্যতীত ভিন্ন কেউ এ সম্পর্কে কিছু জানতে পারে না। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোন নীতি নির্ধারণ করতে হলে এ ডকুমেন্টগুলো কনসাল্ট করা হয়। এছাড়া War Book-এর কপি সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব ও সকল জেলার ডিসির কাছেও সংরক্ষিত থাকে যাতে যুদ্ধাবস্থায় ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এ ধরনের কিছু অতিগোপনীয় দলিলের কথা উল্লেখ করলেও তিনি স্বীকার করেন, অন্যান্য খাত যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, গৃহায়ণ, আমদানী-রফতানী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেখানে জাতীয় নীতি লিখিত আকারে ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করা হয়েছে সেখানে এখনও লিখিত আকারে

কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিরক্ষা নীতিমালা নেই। এ প্রেক্ষিতে তাঁর মতে, বিভিন্ন সময়ে সশস্ত্রবাহিনী ও প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সারসংক্ষেপ যা মন্ত্রণালয়ের নথিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করে সাজিয়ে প্রতিরক্ষা নীতি আকারে প্রণয়ন করা যেতে পারে। তবে দীর্ঘদিন দেশে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বা সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় যথাসময়ে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি- এ মন্তব্য করে জনাব এম এ হাকিম শিগগিরই এ ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তাঁর মতে, প্রতিরক্ষা নীতি বা এতদসংক্রান্ত দলিলাদি যেহেতু দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাই এটা সব সময়ই 'Classified secret' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এদিকে প্রতিরক্ষা খাতে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করা কষ্টসাধ্য হলেও বাংলাদেশের সকল অঞ্চলকে শক্তিশালী ডিফেন্স নেটওয়ার্কের আওতায় আনার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন জনাব হাকিম। এক্ষেত্রে সম্প্রতি প্রতিবেশী ভারতের শতকরা ২৮ ভাগ প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি ও সে আলোকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট প্রণয়ন করা উচিত কি-না এ প্রশ্ন করা হলে তিনি দৈনিক ইনকিলাবকে জানান যে, ভারত একটি বিশাল দেশ। চির শত্রু পাকিস্তানের সাথে বিভিন্ন সমস্যা ছাড়াও এর রয়েছে কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যাপক বিচ্ছিন্নতাবাদ সংক্রান্ত সমস্যা। তাই ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানোর প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু তার মতে, বাংলাদেশের সে ধরনের কোন ব্যাপক নিরাপত্তা সমস্যা আপাতত নেই এবং বাংলাদেশ কারও সাথে যুদ্ধ চায় না। কাজেই ভারতকে অনুসরণ করে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোকে তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। এছাড়া প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কোন বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় না বলে দেশের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে অধিক ব্যয় সমীচীন নয় বলেই তাঁর ধারণা। তার ওপর সীমিত সম্পদ দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার প্রসঙ্গও তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে তাই বলে প্রতিরক্ষা খাতকে 'ঠুটো জগন্নাথে' পরিণত করার পক্ষপাতী তিনি নন। বরং তিনি বলেন ঃ ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমার এমনকি নেপালেও বাংলাদেশের তুলনায় প্রতিরক্ষা খাতে বাজেটের বেশী অংশ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। তাই তার মত হচ্ছে, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোন আপোষ নেই এবং এ জন্য শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী গঠন, আধুনিক সমরাস্ত্র সংগ্রহ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বিকল্প পথে হলেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন সেক্টরের সীমাহীন অপব্যয়, অপচয় রোধ করে অর্থ সংকুলানের কথা বলেছেন।

এ পর্যায়ে আমরা বিশাল ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করে ভারতের সাথে যুদ্ধে বাংলাদেশ পারবে না এ জন্য কোন সেনাবাহিনী রাখার প্রয়োজন নেই এ সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে জনাব এমএ হাকিম সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বিমত পোষণ করেছেন। কারণ, তাঁর মত হচ্ছে, ভারত ছাড়া মায়ানমারের সাথেও বাংলাদেশের প্রায় ২০০

কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। এখন যদিও এ দুটো দেশের সাথে বন্ধুত্ব আছে কিন্তু যে কোন ঘটনায় এই বন্ধুত্ব বিঘ্নিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে বৈরী পরিস্থিতিতে সশস্ত্রবাহিনী না থাকলে আমাদের আত্মরক্ষার উপায় কী হবে? স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করবে কে? অথচ তাঁর মতে, যদি একটি শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী থাকে তা হলে আমরা যেমন আক্রমণের প্রাথমিক ধাক্কা প্রতিরোধ করে জাতিসংঘ ও বন্ধুপ্রতিম দেশের সহায়তা লাভের মত সময় পাব, তেমনি আক্রান্ত হলে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারব। এ ধারণা শত্রুর থাকলে সেও আর আক্রমণ করতে পারবে না যা তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী সমতা নিশ্চিত করে বন্ধুত্ব রক্ষার উপায়ও বটে। অথচ শক্তি না থাকলে শত্রুও আমাদের আক্রমণ করায় প্রলুব্ধ হবে- এ আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, সশস্ত্রবাহিনী না থাকার কারণে আমরা যদি শত্রু আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামাল দিতে না পারি তা হলে জাতিসংঘ বা অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করার পূর্বেই শত্রু একটি বড় এলাকা দখল করে নেবে যা পরে নেগোসিয়েশন বা বার্গেইনিং-এর সময় শত্রুর পক্ষে বড় প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে। তাই শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী থাকার প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করায় তিনি আদৌ একমত নন। তিনি এও মনে করেন, শুধু বহিঃশত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধই নয়, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বিশেষ করে যে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা মোকাবিলা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যও আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে। আর এ সশস্ত্রবাহিনী তাঁর দাবী মতে, শুধু দেশের অর্থই ব্যয় করছে না, বিদেশে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে নিয়োজিত থেকে দেশকেও দিচ্ছে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা।

একটি শক্তিশালী, পেশাগতভাবে দক্ষ কনভেনশনাল প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোন বিকল্প নেই- এ ব্যাপারে প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব সুস্পষ্টভাবে অভিমত প্রকাশ করার পাশাপাশি সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স হিসেবে আধাসামরিক বাহিনী যথা বিডিআর, আনসার, ভিডিপিকেও অধিক শক্তিশালী করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, জে. জিয়ার সময় যে কনসেপ্ট অনুযায়ী আনসার, ভিডিপি গঠন করা হয়েছিল, সে অনুযায়ী এদের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে যে কোন জরুরী অবস্থায় দেশরক্ষার কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট জেলায় তালিকা সংরক্ষণ করে পূর্ব থেকে এদের কার কি কাজ হবে, কোথায় যেতে হবে- এগুলো ঠিক করে দেশ প্রতিরক্ষায় আমাদের কার্যকারিতা অনেকাংশে বাড়ানো সম্ভব। পাশাপাশি সকল শ্রেণীর জনগণের মাঝে নিরাপত্তা সচেতনতা গড়ে তোলাও প্রয়োজন বলে তাঁর ধারণা। তবে সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স হিসেবে যাদেরই তৈরী করা হোক না কেন একটি শক্তিশালী সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী আমাদের থাকতেই হবে, সাক্ষাৎকার প্রদানের শেষ পর্যায়ে এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন জনাব এম এ হাকিম।

(দৈনিক ইনকিলাব, ৩০-০৪-২০০০)

প্রতিরক্ষা খাতে কেবল ব্যয়ই বাড়াতে হবে না এর তৎপরতা ও দক্ষতাও বহুমুখী করতে হবে

সাদেক খান
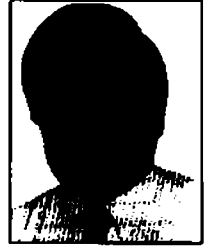
প্রখ্যাত সাংবাদিক, বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক সাদেক খান বলেছেন, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি শুধু গতানুগতিক সমরশক্তিনির্ভর হলে চলবে না, একুশ শতকের জ্ঞানভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থার যুগে তাকে অবশ্যই আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আত্মরক্ষার কৌশলও অবলম্বন করতে হবে। কেবল সীমান্ত রক্ষাই নয় আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির অবকাঠামোকেও রক্ষা করতে হবে। তাই প্রতিরক্ষা খাতে কেবল ব্যয়ই বাড়াতে হবে না; বরং তৎপরতা ও দক্ষতাও বহুমুখী করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের প্রতিরক্ষা নীতি আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারমুখী বা আধিপত্যবাদী। আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক ও জাতি গঠনমূলক। কিন্তু কেউ যদি আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখায়, আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চায় তবে তা আমরা বরদাশত করব না। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে আলোচনার প্রধান অন্তরায় ছিল ভারত-বাংলাদেশের ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি। এ মৈত্রী চুক্তিতে ভারত বাংলাদেশের অপ্রস্তুতির সুযোগে একতরফা সুবিধা আদায় করে নেয়। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক চেতনা ভারতীয় ফন্দির বিষয়ে এতই সজাগ ছিল যে, আমাদের ক্ষুদ্র সামরিক শক্তিও ভারতের চোখ রাঙ্গানির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস পেয়েছিল। এ মৈত্রী চুক্তির অবসানের পর বিদেশী স্বার্থের তল্পিবাহক কিছু মতলববাজ দেশবাসীকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সচেতন নাগরিকরা তাদের যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এ অপচেষ্টা খন্ডন করে দিচ্ছে। জনাব সাদেক খান বলেন, আমি বুঝতে পারি না, কেন সেনাবাহিনীকে ছোট করতে হবে। সেনাবাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বিরাট কর্মসংস্থান এবং বহুমুখী ব্যবহারের একটি উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান। প্রতিরক্ষা ক্ষমতা একটি জাতীয় প্রযুক্তি সম্পদ। এর যথাযথ সদ্ব্যবহার সম্ভব হলে এখান থেকে আয়ও বাড়ানো সম্ভব হবে। সাপ্তাহিক এভিডেন্স-এর উপদেষ্টা সম্পাদক, প্রখ্যাত কলামিস্ট জনাব সাদেক খান বলেন, কনভেনশনাল আর্মি বা স্থায়ী সেনাবাহিনী এবং সিটিজেন আর্মি একে-অপরের বিকল্প নয়। বরং পরিপূরক এবং সহায়ক। যে সব দেশে সিটিজেন আর্মি রয়েছে, সে সব দেশে স্থায়ী সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বহুদেশের কনভেনশনাল আর্মির চেয়ে বেশী। জাতীয় প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আমাদেরও অবশ্যই প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশে প্রতিরক্ষানীতির স্বরূপ কি হওয়া উচিত-এ নিয়ে ইনকিলাবের পক্ষ থেকে জনাব সাদেক খানের মুখোমুখি হয়েছিলাম। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সাদেক খান উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

জনাব সাদেক খানের সাথে সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি কি রকম হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

সাদেক খান ঃ আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি কি হওয়া উচিত, সে ব্যাপারে আমাদের সংবিধানেই সিদ্ধান্ত আছে। সংবিধানের মূলনীতির ২৫ ধারায় বলা হয়েছে, "জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন।

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও আইনের অধিকার সমর্থন করিবেন এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

এছাড়া সংবিধানের ৪র্থ পরিচ্ছেদে প্রতিরক্ষা বিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে।"

৬২ (১) সংসদ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিচারসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন ঃ

(ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ ও উক্ত কর্মবিভাগসমূহের সংরক্ষতি অংশসমূহ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

(খ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহে কমিশন মঞ্জুরি।

(গ) প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগদান ও তাহাদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ এবং

(ঘ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহ ও সংরক্ষিত অংশসমূহ-সংক্রান্ত শৃঙ্খলামূলক ও অন্যান্য বিষয়।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা এ অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য বিধান না করা পর্যন্ত অনুরূপ যে সকল প্রচলিত আইনের অধীনে নহে, রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সেই সকল বিষয়ের জন্য বিধান করিতে পারিবেন। সংবিধানে যুদ্ধ সংক্রান্ত ৬৩(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে না।'

এতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়েছে। জনগণের প্রতিনিধিদের এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেয়া আছে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতেও রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা নীতি সাংবিধানিকভাবে আত্মরক্ষামূলক। আমরা কারও শত্রু হতে চাই না। কিন্তু কেউ আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে তাও বরদাশত করব না। আমাদের কোন ভৌগোলিক সীমারেখার ওপর অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করলে আমরা তা বরদাশত করব না। আমাদের ভূমি, জনসংখ্যা অনুপাত খুবই প্রতিকূল। আমরা ঐতিহাসিকভাবে দাবী করতে পারি আমাদের জনগোষ্ঠীর ভূমির সংস্থানের জন্য আশপাশে যাদের অতিরিক্ত ভূমির অধিকার রয়েছে তারা আমাদের জায়গা ছেড়ে দিবেন।

কিন্তু তা আমরা করিনি করতেও চাই না। আমাদের সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে কিংবা আভ্যন্তরীণ বিন্যাসের মাধ্যমে ভূসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব। আমরা তারই ওপর নির্ভর করে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানের ওপর জোর দিয়েছি। বহুদিন ধরে একটা প্রচার চলে আসছে যে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে একটা স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না, এটা ভায়াবল নয়। ইতিহাস প্রমাণ করেছে বাংলাদেশ শুধু যে ভায়াবল তা নয়। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নিতান্ত কম নয়। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বস্তুত শুধু সীমান্ত রক্ষা নয়, তার আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির অবকাঠামো রক্ষাও বটে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি শুধু গতানুগতিক সমরশক্তিনির্ভর হলে চলবে না। একুশ শতকের জ্ঞানভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থার যুগে তাকে অবশ্যই আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আত্মরক্ষার কৌশলও অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ একটি দেশে লিখিত কোন প্রতিরক্ষা মতবাদ থাকার দরকার আছে কি-না? যদি সে দরকার থাকে তা হলে বাংলাদেশে তা এতদিন হয়নি কেন?

সাদেক খান ঃ বাংলাদেশের সব সময়ই একটা প্রতিরক্ষা নীতির কাঠামো ছিল যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী তার প্রাথমিক কৌশল, বিকল্প কৌশল বা তারও পরে ১, ২, ৩ করে সম্ভাব্য প্রতিকূলতা মোকাবিলার জন্য গোপন ছক কেটেছে। সব দেশেই এ ধরনের ছক থেকে থাকে। ১ নং ছক কাজে না লাগলে ২ নং, ২ নং না হলে ৩ নং কাজে লাগান হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ভারতের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি করে। কিন্তু ওই মৈত্রী চুক্তিতে ভারতের মনোভাব ছিল একতরফা সুবিধা আদায়। কারণ তারা সামরিকভাবে ছিল বিরাট। আমরা ছিলাম অপ্রস্তুত। কিন্তু বাংলাদেশের নাগরিক চেতনা ভারতীয় ফন্দির বিষয়ে এতই সজাগ ছিল যে, আমাদের ক্ষুদ্র সামরিক শক্তিও ভারতের চোখ রাঙ্গানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস পেয়েছিল। কার্যত মৈত্রী চুক্তির খেলাপ করে ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে '৭৪-৭৫ সাল থেকেই বৈরী অবস্থান নিতে শুরু করল। চুক্তিবদ্ধ কানাডীয় তেল অনুসন্ধানী জাহাজকে বঙ্গোপসাগর থেকে তাড়িয়ে দিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে উস্কে দিল কিছু অশিষ্ট চাকমা সন্ত্রাসীকে। তারপর '৭৫-এর পট-পরিবর্তনের পর ফারাক্কার পানি সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে পূর্বের চুক্তির কোন তোয়াক্কা করলো না। আর সরাসরি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আক্রমণ চালাতে সামরিক মদদ দিতে শুরু করল। অথচ বাংলাদেশ যে প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করেছিল, তাতে ভারতকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল যে,

বাংলাদেশের ভিতরে এসে ধ্বংসাত্মক কার্য চালানোর চেষ্টা করলে বা বাংলাদেশের ওপর অন্যায় আগ্রাসন করা হলে এদেশের সামরিক বাহিনী বসে থাকবে না। তারাও পাল্টা আক্রমণ চালাবে। বাংলাদেশের এই আত্মবিশ্বাসী কৌশল অবশ্যই জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় সহায়ক হচ্ছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ চায়নি সরাসরি ভারতের সাথে এই বিরোধের আন্তর্জাতিক প্রকাশ ঘটাতে। শুধুমাত্র পানির বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক দরবারে গিয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সচেষ্ট ছিল তার প্রতিরক্ষা শক্তিকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করতে। প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনার প্রধান অন্তরায় ছিল ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি। কারণ আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা থাকায় অন্য দেশগুলোর কাছে আমাদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত। এদেশের এককালীন নেতৃত্ব, যে দায়বদ্ধতা স্বজ্ঞানে মেনে নিয়েছিল এ মৈত্রী চুক্তির অবসানের পর প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা এদেশে শুরু হয়েছে। বিদেশী স্বার্থের তল্পিবাহক কিছু মতলববাজ তার সুযোগ নিয়ে কিংবা তার আগে থেকেই দেশবাসীকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিভ্রান্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সচেতন নাগরিকরা তাদের খোলাখুলিভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে তাদের সে সব অপচেষ্টা ভন্ডুল করে দিচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ অধুনা একটি মতবাদ প্রচার করা হচ্ছে যে, ভারতীয় বিশাল সেনাবাহিনীকে কোনভাবেই আমাদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিরক্ষা খাতে আমাদের ব্যয় না বাড়িয়ে একটি ছোট সেনাবাহিনী রেখে তা দিয়ে কেবল দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলা করা উচিত। কেউ কেউ বলছেন, আমাদের দেশে সেনাবাহিনীরই প্রয়োজন নেই। অথচ ভারত প্রতিবছরই তার প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়ে চলেছে এবং আগামী বাজেটেও তার প্রতিরক্ষা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি করছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

সাদেক খান ঃ ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধির সাথে আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধির বিষয়টা সমান্তরাল নয়। কারণ, ভারতের ঘোষিত প্রতিরক্ষানীতি আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারধর্মী বা আধিপত্যবাদী। আর আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি নিতান্তই আত্মরক্ষা ও জাতি গঠনমূলক। আমি প্রতিরক্ষা বাজেটের বিষয়টাকে একটু ঘুরিয়ে বলব। আমি বলব, প্রতিরক্ষার ক্ষমতা হচ্ছে একটা জাতীয় প্রযুক্তি সম্পদ, তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। শান্তি বা যুদ্ধে উভয় সময়ই এই প্রযুক্তি সম্পদের বিশেষ ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে। আমাদের এই প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি সম্পদের আয় এবং ব্যয় উভয়ই বাড়াতে হবে। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দেই, যেমন-আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার কাজ থেকে আমাদের আয় বাড়তে পারে। তেমনি আমাদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির পরিসরও বাড়াতে হবে। তার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর আধুনিকীকরণ দরকার হবে। আমাদের মত জনসংখ্যাবহুল দেশে সেনাবাহিনীকে কি কাজে লাগাব তা চিন্তা করতে হবে। কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি সম্ভব- যদি অপচয় বা ফাঁকি না দেয়া যায়। আবারও দৃষ্টান্ত দেই, যেমন- ইন্টারনেটের উদ্ভব ঘটেছিল মার্কিন সামরিক প্রযুক্তির মাধ্যমে, তার

সুফল ভোগ করছে সারা দুনিয়া। মার্কিন অর্থনীতি পুরাতন খোলস ছেড়ে এখন তথ্য প্রযুক্তির খোলস নিয়েই বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। পার্শ্ববর্তী ভারতেও তার ছোঁয়া লেগেছে। নেহরু সাহেবের বিরাট আকারের রাষ্ট্রীয় উৎপাদনের উদ্যোগ থেকে ভারতের তেমন কোন লাভ হয়নি। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে ভারতীয়রা সফলকাম হয়েছে। তারা দেশে ফিরে যে বিনিয়োগ করেছে, সেগুলোরই শেয়ারের কোটেশন এখন দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ বা অন্যান্য শেয়ার মার্কেটে। আমাদের দেশেও কতকগুলো বিষয়ে R&D (গবেষণা ও উন্নয়ন) প্রসারভিত্তিক হতে পারে। সেগুলো আমাদের উপযুক্ত প্রযুক্তিভিত্তিক হতে হবে। সামরিক বাহিনী সে দায়িত্ব নিতে পারে। যেমন-বঙ্গোপসাগরের তলদেশে যে বিরাট সম্পদ রয়েছে তার ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে নৌবাহিনীকে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। এ জন্য বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মায়ানমার ও বাংলাদেশ মিলিয়ে সম্ভাবনাময় গ্যাস সম্পদের মওজুদ এখন বিশ্বের জ্বালানি মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। এর নানারকম অর্থ আছে। আঞ্চলিকভাবে বা জাতীয়ভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও জনস্বার্থে সদ্ব্যবহারের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। কারণ, আর ১০ বছরের মধ্যে জ্বালানি বিষয়ে নতুন কোন প্রযুক্তি আবিষ্কার না হলে বিশ্বের জ্বালানি মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো নানারকম চাপের সম্মুখীন হবে। কারণ, ইতোমধ্যে বিশ্বে জ্বালানির চাহিদা বেড়েই চলবে। কাজেই প্রতিরক্ষা খাতে শুধু আমাদের ব্যয়ই যে বাড়াতে হবে তা নয়। তৎপরতা, দক্ষতাও বহুমুখী করতে হবে। সামরিক বাহিনীর দুর্যোগকালীন ভূমিকা একটা গৌণ ভূমিকা মাত্র। এটা মূলত নাগরিকেরই ভূমিকা। সংগঠিত শক্তি হিসেবে তাদের ভূমিকা ও তৎপরতা নজরে বেশী পড়ে, কার্যকরীও বেশী হয় বটে। তবে যে কোন সক্ষম নাগরিকের ভূমিকাও সে অবস্থায় কম নয়।

প্রশ্ন ঃ **বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কনভেনশনাল না-কি সিটিজেন আর্মি হওয়া উচিত?**

সাদেক খান ঃ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কনভেনশনাল না সিটিজেন আর্মি হবে-এটা একেবারেই খেলো প্রশ্ন। যেসব দেশে সিটিজেন আর্মি রয়েছে, যেমন- সুইজারল্যান্ড, সেখানেও স্থায়ী সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বহু দেশের কনভেনশনাল আর্মির চেয়ে বেশী। সম্ভবত আমাদের চেয়েও বেশী সেসব দেশে সক্ষম সমস্ত নাগরিকের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যয় বহনের সুযোগ বা সামর্থ্য আমাদের নেই। কাজেই আমাদের অবশ্যই স্থায়ী সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে এবং আমি আগেই বলেছি, কর্মসংস্থানের একটা কার্যকরী ও উৎপাদনশীল ব্যবস্থা হিসেবে সেটাকেই গড়ে তুলে আমাদের তা আরও প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশ্নটা আসলে এটা নয়। সামরিক বাহিনী বৃদ্ধি করা হবে কি হবে না-জাতীয় প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আমাদের অবশ্য প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। অন্য একটা কথা অবশ্য রয়েছে-এ সামরিক বাহিনী জনগণের রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকবে কি-না। যে কোন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজে অবশ্যই যে কোন রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে জনগণের ইচ্ছার ও জাতীয় স্বার্থে অনুগত থাকতে

হবে। আমাদের একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, স্থায়ী সেনাবাহিনী এবং সিটিজেন আর্মি একে-অপরের বিকল্প নয় বরং পরিপূরক ও সহায়ক।

(দৈনিক ইনকিলাব, ০৯-০৫-২০০০, এ সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন দৈনিক ইনকিলাব-এর চীফ রিপোর্টার জনাব মঞ্জুরুল আলম)

যারা সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন অস্বীকার করেন তারা মীরজাফর

ভারত-বাংলাদেশ ও ইসলামের প্রধানতম বৈরী শক্তি

মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবির তালুকদার, এনডিসি, পিএসসি.

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক খাতসহ নিরাপত্তার সকল ক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশের সাথে বৈরিতা প্রদর্শন করে চলেছে। প্রচারণা মাধ্যমে, বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও পাকিস্তানের পাশাপাশি বাংলাদেশকে টার্গেট হিসেবে চিহ্নিত করেছে ভারত। ১৯৯২ সালে ভারতীয় ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে এনডিসি কোর্সে অধ্যয়নকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে এ মন্তব্য করেছেন মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আনোয়ারুল কবির তালুকদার। ২৯ এপ্রিল ২০০০ তারিখে তাঁর নিউ ডিওএইচএস-এর বাসায় আলাপকালে মে. জে. (অব.) আনোয়ারুল কবির অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে জানান যে, ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তিনি লক্ষ্য করেছেন, ভারতীয়রা প্রায় প্রতিদিনই পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশকে বৈরী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করছে। এছাড়া ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে এমন সব মনগড়া অপপ্রচার চালাচ্ছে যা যে কোন গণতন্ত্রমনা, সভ্য মানুষের পক্ষে কুরুচীপূর্ণ, একপেশে বলে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। এমনকি সরাসরি বাংলাদেশকে গ্রাস করা উচিত- এ ধরনের মারাত্মক মন্তব্যযুক্ত বইও ভারতীয় ডিফেন্স কলেজে প্যাকেজ হিসেবে পড়তে দেয়া হতো। India And The Neighbour শিরোনামের এই বইটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, লেখক '৪৭-এ সিলেট ও খুলনা অঞ্চলকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে না পারাকে তার বইয়ে ভুল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাই লেখকের মতে, ওই ভুল ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর শুধরে নেয়া উচিত ছিল। এমনকি লেখক একথাও বলেছেন যে, '৭১-এ আসলে ভারতের উচিত ছিল পুরো পূর্ব পাকিস্তানকেই দখল করা। এ ধরনের অবিশ্বাস্য কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে মে. জে. (অব.) আনোয়ারুল কবির অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে ভারতকে বাংলাদেশ ও ইসলামের অন্যতম বৈরী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, সঙ্গত কারণেই আগ্রাসী ভারতের মোকাবিলায় সচেতন হতে হবে, থাকতে হবে প্রস্তুত।

দীর্ঘ বত্রিশ বছরের অধিক সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ

আনোয়ারুল কবীর তালুকদার এনডিসি, পিএসসি অবসর গ্রহণের পূর্বে রংপুরস্থ ৬৬তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও সেনা সদরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও এর বিভিন্ন জটিল দিক নিয়ে তার রয়েছে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও সুচিন্তিত মতামত। এখানে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে দৈনিক ইনকিলাবকে যে মতামত ব্যক্ত করেন তা পত্রস্থ করা হল-

প্রশ্ন ঃ নিরাপত্তা নিয়ে প্রতিটি দেশেরই মাথাব্যথা থাকা স্বাভাবিক। বাংলাদেশও এ থেকে ব্যতিক্রম কিছু নয়। সকল দিক বিবেচনায় এদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ কি রকম হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

মে. জে. (অব.) কবির ঃ প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা মতবাদ মূলত জনগণের উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল। সিকিউরিটি সম্পর্কে সে কি ভাবছে, কতটুকু জানে, তার ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও জাতিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে তার উপলব্ধি কিরূপ- এগুলোকে বেস ধরেই একটি দেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করতে হয়। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এদেশের মানুষও তার ভয় কি, কিভাবে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে স্বভাবতই এসব চিন্তা করে। এখন আমরা যদি বাস্তব চিন্তা করি, যুক্তির কথা বলি তা হলে দেখতে পাব যে, আমাদের দেশ ভারতের মত একটি বৃহৎ শক্তি দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত। তার আগ্রাসী চরিত্র সম্পর্কে আমরা জানি। কিন্তু এদেশের মানুষ বড় উদার। এরা কখনই অন্য কোন দেশ দখলের চিন্তা করে না। নিজে শান্তিতে থাকতে চায়, অপরে শান্তিতে থাকুক তাও কামনা করে। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ অবশ্যই এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তাদের কেউ আক্রমণ করলে তারা জীবন দিয়ে হলেও দেশের পবিত্র ভূমি রক্ষা করবে। '৭১ সালেও এমনটি হয়েছে। সেবার বিত্তশালী ও বিবৃতিজীবী ইন্টেলেকচুয়ালরা সম্মুখ সমরে না গেলেও মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সাধারণ জনগণ জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছে। এদেশে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সংখ্যা বেশী। এদের দেশপ্রেমও নিখাদ। তাই ভবিষ্যৎ যে কোন বৈরী পরিস্থিতিতেও শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত মানুষের অভাব হবে না এদেশে।

এদিকে একটি দেশের সাথে অপর দেশের বৈরিতা হতে পারে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এমনকি ধর্মীয় পর্যায়ে সম্পদ নিয়েও শত্রুতার জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। একে আমরা Clashes of interest বলতে পারি। এসব খাতে আমরা কখনই ভারতকে পর্যুদস্ত করার কথা ভাবি না। এর কোন প্রয়োজনও নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যদি আক্রান্ত হই তা হলে তো এদেশের বার কোটি মানুষ বসে থাকবে না, থাকতে পারে না এবং এক্ষেত্রেই দিক-নির্দেশনার জন্য প্রতিরক্ষা মতবাদের প্রয়োজন হয়। এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এ ব্যাপারে পুরো জাতি অর্থাৎ বারো কোটি মানুষের মত কি? যদি সুনির্দিষ্ট মতবাদ তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয় তা হলে জনগণের মতামতও যেমন গ্রহণ করার সুযোগ তৈরী হবে, তেমনি জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করে গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। এখন যে লোক বলছেন ট্যাক্সের পয়সা দেব না, আর্মির বাজেট

বাড়িও না, যদি তাকে বোঝান যায় তা হলে তিনি নিরাপত্তার প্রশ্নে সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবেন। জনগণের সকলকে মটিভেট করে যুক্তি দিয়ে সংগঠিত করতে হবে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে। এক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে নীতি থাকবে তা হল বার কোটি জনগণ, এদের দৃপ্ত মনোবল, সমস্ত সম্পদ, সচল বৈদেশিক নীতি বিশেষ করে বন্ধুপ্রতিম দেশের অকুণ্ঠ সহায়তার আশ্বাস ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যতবেশী সম্ভব দেশের সমর্থন আদায় ও এগুলোর সমন্বয় সাধন করা। বিশেষ করে ভারত সব সময় তার প্রতিরক্ষা চিন্তা-চেতনায় বাংলাদেশকে টার্গেট করছে- এটা মনে রেখে আমাদের সকল পর্যায়ে জনগণকে মটিভেট করা উচিত। কারণ, ভারত খুব ভাল করেই জানে ছোট দেশ বাংলাদেশ তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এরপরও যখন তারা আমাদের টার্গেট করে তখন অবশ্যই গিলে খাবার জন্যই তা করে। এ পর্যায়ে তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পর্যায়ে আগ্রাসন যেমন করতে পারে, তেমনি সামরিক খাতেও আগ্রাসন চালাতে পারে। তাই সকল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে-সেখানে প্রতিরক্ষা বাহিনীই শুধু নয়, দেশের প্রতিটি মানুষ সচেতন হবে হুমকির খাতগুলো নিয়ে। সবাই প্রস্তুত থাকবে আত্মরক্ষার জন্য।

প্রশ্ন ঃ একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশ স্বাধীন হলেও এ যাবৎ বাংলাদেশে লিখিত বা আনুষ্ঠানিক কোন প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়নি কেন?

মে. জে. (অব.) কবির ঃ প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের মূল দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের যারা সরকার পরিচালনা করে থাকেন। তবে সরকারের পক্ষে এককভাবে এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা কঠিন। বরং যে কোন কারণেই হোক কোন সরকার এমনকি পূর্ববর্তী সামরিক শাসকরাও ক্ষমতা রক্ষায় 'মহাব্যস্ত' থাকায় হয় তো এদিকে নজর দিতে পারেনি।

এদিকে ডিফেন্স পলিসি লিখিত বা প্রকাশ্য না থাকলেও ভারতে যখন মন্ত্রীদের প্রশ্ন করা হয় তখন তারা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারেন যে, লিখিত না হলেও তারা প্রত্যেকেই ভারতের প্রতিরক্ষা নীতি কি তা জানেন। অথচ, বাংলাদেশে জোর দিয়ে কেউ বলতে পারবে না যে, সে এ ব্যাপারে কিছু জানে। তাই যত শীঘ্র সম্ভব একটা সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ, এমনিতেই জনসংখ্যানুপাতে আমাদের ভূমির পরিমাণ খুবই কম। তাই আমরা এক ইঞ্চি জমিও হারাতে পারি না। একইভাবে আমাদের নদীর পানি কেউ বাঁধ দিয়ে আটকালেও আমাদের ভয়ানক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য আমাদের প্রতিবাদ করার প্রয়োজন হবে এবং প্রতিবাদ তখনি করতে পারব যখন আমাদের শক্তি থাকবে। তবে এখানে একটা কথা হয় তো বলা যায় যে, প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময় একটা 'ডাইরেক্টিভ' তৈরী করা হয়েছিল। এখনও সেটা ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। ওই 'ডাইরেক্টিভে' বলা ছিল আমাদের একটা রিজনেবল স্ট্যান্ডিং আর্মি থাকবে যা আমরা Afford করতে পারব। আর বাকি শক্তিটা আসবে সমাজের মধ্য থেকে। এ নীতিমালার আলোকেও এখন প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা যায়।

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত সম্প্রতি প্রতিরক্ষা বাজেট শতকরা ২৮ ভাগ বাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কতটুকু? এবং এ প্রেক্ষিতে আমাদের বাজেট বাড়ান উচিত কি-না?

মে. জে. (অব.) কবির ঃ ভারত হচ্ছে পৃথিবীর হাতেগোণা ক'টি দেশের একটি, যে প্রতিবছর মাত্রাছাড়াভাবে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়ে চলেছে। আমি আগেই বলেছি, ভারত বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার বদলে অনেক বেশী মাত্রায় বৈরিতা প্রদর্শন করে আসছে। তাই সঙ্গত কারণেই ভারত বাজেট বাড়ালে আমরা একেবারে উটপাখির মত বালুতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে পারি না। তবে এটাও ঠিক যে, আমাদের ভারতের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ন্যূনতম পর্যায়ে নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য যা প্রয়োজন তা আমাদের করতে হবে এবং এতে যদি সে প্রয়োজন মেটাতে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হয় তা হলে সে পদক্ষেপ অবশ্যই নিতে হবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা অর্থ বরাদ্দ পাব কোথা থেকে? এ ব্যাপারে আমি বলব যে, ভারতের সকল ক্ষেত্রে এমনকি জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজে (NDC) এমনভাবে মটিভেট করা হয় যাতে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষার চিন্তা প্রতিফলিত হয়। যেমন- তারা ইন্ডাস্ট্রি করার ক্ষেত্রে দেখবে এতে ডিফেন্সের লাভ হবে কিভাবে এবং তারা এসব ক্ষেত্রে এমন লাভ নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে যা প্রতিরক্ষা খাতে অবদান রাখতে পারে। আবার হিন্দুস্তান মটরস, অশোক লেল্যান্ড থেকে শুরু করে যে কোন ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার কারখানা থেকেও তারা যাতে প্রয়োজনে ডিফেন্সের জন্য বিভিন্ন টেকনিক্যাল সহায়তা পায়- এমন ব্যবস্থা রাখে। আমরাও এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারি। আবার অপচয়, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি কমিয়েও প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ সংস্থান করা যায়। ব্যাংক ঋণখেলাপীদের কাছে যত টাকা পাবে, সেগুলোর অর্ধেক উদ্ধার করা গেলেও তো আমাদের শুধু প্রতিরক্ষা কেন অন্যান্য খাতে অর্থ বরাদ্দ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। এছাড়া, এখনও যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, সে অর্থের বা সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেও আমরা প্রতিরক্ষা খাতে গতিশীলতা আনতে পারি। সম্প্রতি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মিগ-২৯ ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো না কিনে যদি এই অর্থ দিয়ে বিমান আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার অস্ত্র কেনা যেতো তা হলে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা এয়ার ডিফেন্স নেটওয়ার্কের আওতায় আসতে পারত। সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় আফগানরা এভাবে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রাশিয়ান জঙ্গী বিমান বহরকে নাস্তানাবুদ করেছে। তাই এ দিকটিও খেয়াল রাখা দরকার বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলেন, বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সেনাবাহিনীর অধিকারী ভারত দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। তাই ভারতের সাথে যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু পারব না তাই ক্ষুদ্র, দরিদ্র দেশ বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী থাকার প্রয়োজন নেই। আবার কেউ কেউ ভারতকে পরম বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করে অযথা সশস্ত্রবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করার পক্ষপাতি নন। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

মে. জে. (অব.) কবির ঃ যারা এ ধরনের কথা বলে তাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ যে, তারা কোর্টে গিয়ে হলফনামা দিয়ে বলুন, ভারত কখনও আমাদের আক্রমণ করবে না, কখনও আমাদের বর্ডারে লোক মারবে না, কখনও আমাদের নদীতে বাঁধ দেবে না। আর যদি ভারত এ ধরনের পদক্ষেপ নেয় বা আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে হুমকি সৃষ্টি করে তা হলে ওই সব বুদ্ধিজীবীর কি পানিশমেন্ট হবে, তা যদি তারা নির্ধারণ করে দেন তাহলে ভাল হয়। অবশ্য পরজীবী এসব জ্ঞানপাপীর হলফনামাও আমরা মানতে পারি না। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও কোন সময় যুদ্ধ ছাড়া অতিক্রান্ত হয়েছে- এমন উদাহরণ নেই। লেনিন, স্ট্যালিন ও টলস্টয়ও তো যুদ্ধিবিহীন একটি দিন উপহার দিয়ে যেতে পারেননি। যুদ্ধ পৃথিবীতে থাকবেই। কারণ পৃথিবীতে যেমন মানুষ আছে, তেমনি শয়তানও আছে। তাই এটা কারও ধরে নেয়া ঠিক হবে না যে, তার প্রতিরক্ষার প্রয়োজন নেই। জাপানের কথাই ধরা যাক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান পারমাণবিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার পর সেলফ ডিফেন্স ফোর্স গড়ে তোলে। এখন তো চিন্তাই করা যায় না, জাপানের ডিফেন্স কত শক্তিশালী। তাই ছোট হলেই যে সশস্ত্রবাহিনী থাকবে না, এটা পাগলের প্রলাপ বৈ কিছু নয়। আর যারা বলেন, বাংলাদেশ বড় দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত তাই রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করলাম না, কারণ বন্ধ করে কি হবে? এভাবে কেউ কি রাতে ঘরের দরজা খোলা রাখবেন? কোন ন্যূনতম বুদ্ধির লোক তা করবেন না বলেই ধরে নেয়া যায়। ঠিক একই যুক্তিতে বলা যায়, চারদিকে বিশাল দেশ থাকলেই যে প্রতিরক্ষা বাহিনী থাকার দরকার নেই তা সম্পূর্ণ অমূলক। বরং সশস্ত্রবাহিনী থাকাটাই বাস্তব, যাতে আমরা যে কোন বৈরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারি। সবচে' বড় কথা, আমরা কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আমাদের দেশ কখনও আক্রান্ত হবে না? বা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না? এমন কোন নিশ্চয়তা কারও পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়। যেহেতু নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না, তাই সব সময় প্রস্তুত থাকতেই হবে।

এবার দেখা যাক, ভারত আমাদের প্রকৃত বন্ধু কি-না? এক্ষেত্রে আমি প্রথমেই বলতে চাই, ভারত যদি সব সময়ের জন্য আমাদের বন্ধুই হবে তা হলে ওই কথাটার কি হবে যে, পৃথিবীতে কোন স্থায়ী শত্রু বা মিত্র নেই? কিভাবে আমরা বিশ্লেষণ করব ৫৬টি নদীর উজানে ভারত কর্তৃক বাঁধ দেয়াকে? কিভাবে অস্বীকার করব সীমান্তের চারপাশে দেয়া কাঁটাতারের বেড়াকে? কোন্ বন্ধুত্বের খাতিরে মেনে নেব সীমান্তে পাখির মত গুলি করে বাংলাদেশীদের হত্যাকান্ডকে? এসব বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই যারা ভারত 'বন্ধু' হওয়ায় সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজন নেই বলেন, তারা মীর জাফর। তারা ভারতের পয়সায় লালিত-পালিত হচ্ছেন বিভিন্নভাবে।

এক্ষেত্রে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করতে চাই। ১৯৯২ সালে ভারতের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় আমি দেখেছি যে, খুবই পরিকল্পিত উপায়ে ভারত পাকিস্তানের পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ইসলামবিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে প্রায় প্রতিদিনই এ ধরনের প্রসঙ্গ উঠানো হত। বলা হত Islam is naeither democratic, nor modern nor scientific. একই সাথে

বাংলাদেশকেও তারা টার্গেট মনে করত। বলত, এক কোটি বাংলাদেশী ভারতে চলে গেছে, বাংলাদেশের উচিত ভারতকে গ্যাস দেয়া ইত্যাদি। এমনকি ওই প্রতিষ্ঠানের কমান্ডান্ট লে. জে. খাজুরিয়া যিনি এক সময় ভারতীয় সেনা সদরে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক ছিলেন তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন যে, তারা বাংলাদেশের গ্যাস পেতে আগ্রহী এবং তারা গ্যাস আমদানী করবে। আশ্চর্যের ব্যাপার '৯২ সালে কিন্তু বাংলাদেশে এ নিয়ে কোন কথা শোনা যায়নি। অথচ, তারা অনেক পূর্বেই ঠিক করে রেখেছে-তাদের বাংলাদেশের গ্যাস দরকার। এতে বাংলাদেশ মরল কি বাঁচল তাতে তাদের মাথাব্যথা নেই। এখন এ ধরনের মনোবৃত্তি যাদের তাদের আমরা বিশ্বাস করি কিভাবে? বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার অর্থ হচ্ছে এদেশের ৮৮% জনগণের বিরুদ্ধে কথা বলা। তাই আমরা কোন যুক্তিতেই বলতে পারি না, ভারত আমাদের নিরীহ বন্ধু মাত্র। এসব বিবেচনায় আমি বলব বিশ্বের সবদেশেই সশস্ত্রবাহিনী আছে, সেখানে আমরা কেন একমাত্র ব্যতিক্রম হতে যাব? কেন সশস্ত্রবাহিনী না রেখে অযথা রিস্কের মধ্যে থাকব? ইতিহাসের কোন্ যুক্তিতে, শিক্ষায় এ ধরনের উদাহরণ আছে? না থাকলেও এ দেশে যারা এরূপ কথা বলেন, তারা আসলে মানসিক দৈন্যতায় ভুগছেন।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী কি কনভেনশনাল না সিটিজেন আর্মি হওয়া উচিত?

মে. জে. (অব.) কবির ঃ বাংলাদেশে সার্বিক বিবেচনায় একটা শক্তিশালী স্ট্যান্ডিং সশস্ত্রবাহিনী থাকবে, সাজ-সরঞ্জাম থাকবে এবং আমাদের বেসামরিক যে সম্পদ আছে সেগুলোর পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে যুদ্ধের সময় এবং এটা করতে গেলে শান্তিকালীন সময়েই এর প্রস্তুতি নিতে হবে। যেমন- দেশে কতগুলো, কি কি ধরনের ইন্ডাস্ট্রি আছে, ওয়ার্কশপ আছে, গাড়ী আছে, যুদ্ধে এগুলো থেকে কি সহায়তা পাওয়া যাবে; ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কতজন আছে দেশে, কিভাবে সাহায্য করতে পারেন সবদিকেই আমাদের প্রস্তুতি থাকতে হবে। এ ধরনের সার্বিক প্রস্তুতি যদি আমাদের থাকে তা হলে সহজে অন্য দেশ আমাদের আক্রমণে সাহস পাবে না। তবে সিটিজেন আর্মি সম্পদশালী ইসরাইল বা সুইজারল্যান্ডের পক্ষে সম্ভব, তা সীমিত সম্পদের দেশ বাংলাদেশের জন্য বাস্তবসম্মত নয়। এছাড়া সিটিজেন আর্মি বলতে যদি সব নাগরিককে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা বোঝায় তা হলে এ ধরনের আর্মি আমাদের দরকার নেই। বরং এদেশে এক কোটির মত জনতাকে প্রশিক্ষিত করতে পারলেই যথেষ্ট। এদের মধ্যে আনসার, ভিডিপি, ছাত্র অর্থাৎ সকল পেশার সিলেকটেড লোক থাকবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আমরা যে কোন বৈরী পরিস্থিতি সামাল দিতে পারব। উল্লেখ করতে হয়, যুগোশ্লাভিয়াতে এক সময় নাগরিকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হত। ফলে যখন বসনিয়ার মুসলমানদের আক্রমণ করা হয় তখন বসনিয়ার মুসলমানরা পূর্বের ট্রেনিং থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে যেতে পেরেছে। পুরো জনগোষ্ঠীকে সামরিক ট্রেনিং না দিতে পারলেও ন্যূনতম একটি অংশকে তাই প্রশিক্ষণ দিয়ে রাখার কোন বিকল্প নেই।

(দৈনিক ইনকিলাব, ১১-০৫-২০০০)

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা আর স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতা এক কথা নয়

যারা বলেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই তারা বাংলাদেশকে ভারতভুক্ত করতে চান

মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহম্মদ ইব্রাহিম, বীর প্রতীক, এডব্লিউসি, পিএসসি

একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফসল বাংলাদেশে বাস করে যারা বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই তাদের অনেকে এমনও মনে করেন যে, এ দেশের পৃথক স্বাধীন অস্তিত্বেরই বা কি প্রয়োজন? যদি তাই না হবে তা হলে যেখানে প্রতিটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়, সেখানে বাংলাদেশে এ ধরনের হীনমন্য, পরজীবী মানসিকতার জন্ম হয় কিভাবে? অকৃত্রিম দেশপ্রেমের টানে যৌবনের দুরন্ত দিনগুলোয় যে সামরিক কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, সেই মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহম্মদ ইব্রাহিম, বীর প্রতীক, এডব্লিউসি, পিএসসি আজ সঙ্গত কারণেই সশস্ত্র বাহিনীকে ঘিরে কোন নেতিবাচক প্রচারণা মেনে নিতে পারেন না। দৈনিক ইনকিলাব প্রতিনিধির সাথে আলাপকালেও তিনি তাঁর সে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অকপটে। আয়তনে বিশাল ভারতের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশ কিরূপ সমতা ও মর্যাদা আশা করে- সে প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন সম্রাট আলেকজান্ডার ও রাজা পুরুর মধ্যে আড়াই হাজার বছর পূর্বের আলাপচারিতার ঘটনা। সিন্ধু নদের তীরে ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা পুরুকে আলেকজান্ডার জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি আমার কাছ থেকে কি রকম ব্যবহার আশা করেন? পুরু গর্বের সাথে বলেছিলেন, রাজার নিকট থেকে, রাজার প্রতি, রাজার মতো। একই সাথে তিনি এও মনে করেন যে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা আর গত ৩০ বছর ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতা করা এক বিষয় নয়। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে সাম্প্রতিক জন-আলোচনাকে ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করে মে. জে. ইব্রাহিম জানান যে, প্রতিরক্ষা কেবলমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর বিষয় নয়। তাই প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে এখন প্রকাশ্যে যেসব কথাবার্তা হচ্ছে তাতে জনগণ এ বিষয়ে যেমন জানার সুযোগ পাচ্ছে, তেমনি প্রতিরক্ষা বিষয়ে তাদের যে ধোঁয়াটে ধারণা ছিল তাও অনেকটা কেটে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে জনসচেতনতা। গণতান্ত্রিক একটি দেশে এভাবেই একটি বিষয়ে প্রথমে জনমত গঠিত হয় যা পরবর্তীতে একটি নীতিমালা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ কিরূপ হওয়া উচিত এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ ঐ রকম হওয়া উচিত- যেটা বলে দেয় ভবিষ্যতে যে কোন আক্রমণের সময় আমরা কিভাবে নিজেদের রক্ষা করব? এবং এ মতবাদে এটা ধরে নিতে হবে, কেউ না কেউ আমাদের আক্রমণ করতে পারে। অর্থাৎ কখনো কারও আক্রমণের শিকার হব না এ ধারণা থাকা চলবে না। কারণ,

যে কোন মুহূর্তে যে কোন দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার কথা ধরে নিয়েই পৃথিবীর সকল দেশ প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করে আসছে। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, দরিদ্র দেশ হলেই যে প্রতিরক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা থাকবে না- এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে মে. জে. ইব্রাহিম জানান, বহু ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশ যাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকটা বাংলাদেশের মতো তারাও অনেক কার্যকর প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করেছে হুমকির খাতসমূহকে সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করে। ঠিক একইভাবে আমাদের দেশেও একটি প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করা যেতে পারে। তবে তাঁর মতে, প্রতিরক্ষা মতবাদ বা Defence Policy-র চেয়ে নিরাপত্তা মদবাদ বা Security Policy-র ব্যাপারে আমাদের অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কারণ, তিনি মনে করেন, প্রতিরক্ষা শব্দটির সাথে ঐতিহ্যগতভাবে শুধু আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্সের নাম জড়িয়ে গেছে। কিন্তু নিরাপত্তা ধারণার সাথে প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গ ছাড়াও আরও অনেক বিষয় জড়িত রয়েছে যা একটি দেশ বা জাতিকে রক্ষার পুরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিতে পারে। কারণ, প্রতিরক্ষাবাহিনী হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার সর্বশেষ মাধ্যম। এর পূর্বে রয়েছে পররাষ্ট্রনীতি, নিকট ও দূরের প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক, জনগণের মনোবল, বাণিজ্য নীতিমালা, অর্থনৈতিক অবস্থানসহ আরও বহু অনুষঙ্গ- যেগুলো একত্রে একটি দেশের সার্বিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলে। অথচ আমাদের দেশে তা করা হয়নি বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, আজ আমরা অর্থনৈতিক আগ্রাসনের শিকার হলেও নীতিমালার অভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছি না। এখন যদি এ কারণে সব কলকারখানা লোকসান দেয়, লাখ লাখ লোক বেকার হয়ে যায় তা হলে অর্থের যোগান আসবে কোথেকে? এবং তাঁর প্রশ্ন যদি অর্থ না থাকে তা হলে প্রতিরক্ষা বাহিনী চলবে কি দিয়ে? এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও একটি পরিবারের উদাহরণ দিয়ে মে. জে. ইব্রাহিম বলেন, একজন নবপরিণীতা স্ত্রীর কাছে নিরাপত্তা হলো তার স্বামী, একটি শিশুর কাছে নিরাপত্তা হলো তার মা। পরবর্তিতে হয় তো এই পরিবারটি আরও বেশী নিরাপদে থাকার জন্য একটি বাড়ী করতে চায়, গাড়ী কিনতে চায়। ঠিক একইভাবে নিরাপত্তা ধারণা সময়ানুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে থাকে। পরিবারের ক্ষেত্রে যেমন নিরাপত্তার আঙ্গিক হলো আমি যাতে বেঁচে থাকতে পারি, সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে পারি এবং বেঁচে থাকার স্থানটা যেন অন্তত থাকে; তেমনি একটি দেশের ক্ষেত্রেও তিনি মনে করেন, নিরাপত্তা মতবাদ এমনভাবে প্রণীত হতে হবে যাতে এটি উপযুক্ত পররাষ্ট্রনীতি, কার্যকর অর্থনৈতিক নীতিমালা ও জনগণের মনোবল বা জনমত দ্বারা সমর্থিত হয় এবং এভাবে একটি উপযোগী মতবাদ প্রণয়ন করা সম্ভব হলে যে কোন পর্যায়ে, যে কোন দেশ থেকে আসা হুমকিকে এদেশের জনগণ প্রতিহত করতে পারবে বলে তার বিশ্বাস।

এদিকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য শত্রু ও হুমকির খাতসমূহ বিবেচনায় মে. জে. ইব্রাহিম একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে, ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর দক্ষিণ-পূর্বে দু'শ মাইলের

মতো সীমানা রয়েছে মায়ানমারের সাথে। এ দুটোই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। পাড়া, মহল্লায় যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, ঝগড়াঝাটি হয় তা প্রতিবেশীর সাথেই হয়ে থাকে- এ মত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, যদি কারও সাথে আমাদের ঝগড়াবিবাদ বা সশস্ত্র বৈরিতার সৃষ্টি হয় তা হলে তা সঙ্গত কারণেই হবে নিকটতম প্রতিবেশীর সাথে। এ ক্ষেত্রে তিনি বলতে চান না যে, ভারত সব সময় একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু তিনি এও মনে করেন যে, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানই বলে দেয় যদি কোনদিন কোন বিষয়ে কারও সাথে বৈরিতার সৃষ্টি হয় তা হলে তা হওয়ার সম্ভাবনা ভারতের সাথেই বেশী এবং এ ধরনের বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার মতো উপাত্তের কোন কমতি তাঁর দৃষ্টিতে নেই। আজ ভারত সেদেশে এক কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের অভিযোগ করছে, নদীর উৎসমুখে বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহে সৃষ্টি করেছে বাধা। আবার ভারত মনে করতে পারে, আমরা তাদের স্বার্থহানি ঘটাচ্ছি। এ ধরনের হাজারো কারণে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে যুদ্ধের আকারও নিতে পারে বলে মে. জে. ইব্রাহিমের অভিমত। এছাড়া আমাদের দ্বিতীয় প্রতিবেশী মায়ানমারের পক্ষ থেকেও শারীরিক আগ্রাসনের সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দেননি। বরং এ ব্যাপারে তিনি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন ১৯৯১ সালে রেজুপাড়া বিওপি নিয়ে মায়ানমারের সাথে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ঘটনাকে। একই সাথে তিনি সীমান্ত সংশ্লিষ্টতা না থাকায় অন্য কোন দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কম বলে উল্লেখ করেন। ঠিক একই যুক্তিতে পাকিস্তানেরও এদেশে ফিজিক্যালী আগ্রাসন চালানোর ক্ষমতা নেই বলে তাঁর অভিমত। তবে বাংলাদেশে অনেকে স্বাধীনতার মূল শত্রু হিসেবে এখনো পাকিস্তানকে চিহ্নিত করেন এটা কতটুকু বাস্তবসম্মত- সে ব্যাপারে তার মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব যদি আক্ষরিক অর্থে বাস্তবায়ন করা হতো তা হলে তো আমরা তখনি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পেতাম আজকের বাংলাদেশকে। তাই তাঁর প্রশ্ন, দীর্ঘ ৩০ বছর স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করে এখনো কেউ কেউ পাকিস্তানের চিন্তা করছেন কেন? অবশ্য তাই বলে পাকিস্তানের পক্ষে এদেশে আক্রমণ চালানো বা পাকিস্তানই আমাদের মূল শত্রু- একথা মানতে তিনি মোটেই রাজি নন। বরং ভারত মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করলেও আর কতদিন তাদের কাছে আমাদের নতজানু হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, ভারতপ্রেমীদের কাছে সে প্রশ্নই তিনি করেছেন। এ কারণেই তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে আইএসআই-এর এজেন্ট থাকার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক না হলেও ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর এজেন্টই সবচেয়ে বেশী। শত্রু-মিত্র নির্ধারণ ও আগ্রাসন প্রসঙ্গে মে. জে. ইব্রাহিম তাই নির্দ্বিধায় সান্নিধ্যকে আক্রমণের মূলনীতি বিবেচনায় ভারতের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

এ পর্যায়ে যে কোন আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্নে লিখিত প্রতিরক্ষানীতি প্রয়োজন কি-না জানতে চাইলে তিনি বাংলাদেশ আর্মিতে আটাশ বছর চাকরি জীবনের মূল্যায়ন

করে বলেন, লিখিত নীতিমালা ছাড়াই যখন এতোদিন চালানো গেছে তা হলে আর লিখিত নীতিমালার প্রয়োজন কি? এছাড়া এই দীর্ঘ সময়ে সশস্ত্রবাহিনীর অগ্রগতিও এ জন্য বাধাগ্রস্ত হয়নি। তবে লিখিত একটি নীতিমালা থাকলে সশস্ত্রবাহিনীর ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন অনেক সুসংহত হতো বলে তিনি স্বীকার করেছেন। তা হলে এতোদিন প্রতিরক্ষা নীতি লিখিত আকারে প্রণয়ন করা হয়নি কেন- এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, লিখিত আকারে নীতিমালা প্রণয়ন অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। এক্ষেত্রে কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিতে হতো, স্বাক্ষর দিতে হতো, বলতে হতো শত্রু কে, আক্রমণ আসবে কোত্থেকে? কিন্তু এ যাবৎ সে সৎ সাহস হয় তো কারও হয়নি।

সীমান্ত সংস্পর্শ থাকায় যে প্রতিবেশীর সাথে বৈরিতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, সেই ভারত সম্প্রতি তার প্রতিরক্ষা বাজেট ২৮% বৃদ্ধি করার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত- সে ব্যাপারেও মে. জে. ইব্রাহিমের রয়েছে সুস্পষ্ট অভিমত। এ প্রসঙ্গে তাঁর মত হচ্ছে, বাহ্যত ভারত প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েছে পাকিস্তানের সাথে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে। বিশেষ করে কারগিল সঙ্কট বাধ্য করেছে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে। এছাড়া ভারতের রয়েছে চীনের মতো মহাপরাক্রমশালী প্রতিপক্ষ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ হয় তো আসবে আরও পরে। তবে যার শক্তি আছে, সে এমন শক্তি প্রয়োগ করে যেমন একটা শক্ত লাঠি ভাঙতে পারে, তেমনি তার কাছে একটা পাটখড়ি ভাঙাও কোন ব্যাপার নয়। তাই এ নিয়ে কিছুটা হলেও শংকিত হওয়ার কারণ আছে। কিন্তু তাই বলে ভারতের অর্থনীতি ২৮% প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধিকে সাপোর্ট করতে পারলেও আমাদের একই হারে বাজেট বৃদ্ধি হয় তো সম্ভব নয়। বরং আমাদের অর্থনীতি যতটুকু ভার বহন করতে পারে তা হিসেবে রেখেই বাজেট প্রণয়ন করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এ ব্যাপারে তিনি সিস্টেম লসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, ভারতে সিস্টেম লস আমাদের চেয়ে কম যা এদেশে মাত্রাতিরিক্ত। কিন্তু কেউ সিস্টেম লস কমানোর দিকে নজর না দিয়ে একতরফাভাবে প্রতিরক্ষা বাজেটের সমালোচনা করে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষা বাজেট হ্রাস করার বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি উল্টো জানতে চান, যার শরীরে মেদ, ভুঁড়ি আছে তার অতিরিক্ত চর্বি কমানোর কথা বলা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু যার শরীরে ঠিকমতো মাংসই নেই তাকে কিভাবে আরও চিকন হওয়ার উপদেশ দেয়া যায়? তাই তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর বাজেট হ্রাস করার যে কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমাদের নিজ অর্থনীতি থেকে বাজেট বৃদ্ধি হয় তো আপাতত সম্ভব নয়। কিন্তু বন্ধুপ্রতিম দেশের কাছ থেকে ২০/৩০ বছরের কিস্তিতে আমরা যেমন সমরাস্ত্র সংগ্রহ করতে পারি, তেমনি বন্ধু দেশের সহায়তায় সমরাস্ত্র কারখানা স্থাপন করে উৎপাদিত পণ্য দেশের কাজে লাগানো ছাড়াও বিদেশে রফতানীর উদ্যোগ নেয়া যায়। তবে যদি প্রতিরক্ষা খাতে আদৌ কোন অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়ার সুযোগ হয় তা হলে তার মতে, সেই অর্থ দিয়ে বিমান

আক্রমণ প্রতিরক্ষার জন্য শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম গড়ে তোলা প্রয়োজন। কারণ, এখনো আমাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অত্যন্ত দুর্বল। তাই মে. জে. ইব্রাহিম মনে করেন, সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও সীমিত পরিসরে নৌ-বাহিনীর সমন্বয়ে একটি পৃথক এয়ার ডিফেন্স কমান্ড গড়ে তোলা যেতে পারে।

এদিকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সশস্ত্রবাহিনীর অধিকারী ভারতের সাথে যুদ্ধ করার প্রশ্ন না থাকায় বাংলাদেশে সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজন নেই- একটি চিহ্নিত মহল কর্তৃক এ ধরনের প্রচারণার ব্যাপারে অভিমত জানতে চাইলে মে. জে. ইব্রাহিম অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছি দেশ আক্রান্ত হলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার জন্য নয়। আর যারা সশস্ত্রবাহিনী বিলুপ্ত করার কথা বলেন তারা মনে করেন, ভারতের ভেতর বাংলাদেশ লীন হয়ে গেলে ভাল হয়। তাই তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এসব কথিত বুদ্ধিজীবীর সাথে একমত হতে পারছেন না বলে জানান এবং একমত হতে না পারার জন্য কোন দুঃখবোধও তার নেই। তার মতে, সশস্ত্রবাহিনী অবশ্যই থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ভারতের জনসংখ্যানুপাতে সশস্ত্রবাহিনী যে আকারের সেরূপ বাংলাদেশে জনসংখ্যানুপাতে বড় সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজন না হলেও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যতোটুকু প্রয়োজন, ঠিক সে আকারের একটি সশস্ত্রবাহিনী অবশ্যই আমাদের থাকবে। তবে বাংলাদেশের মতো ছোট দেশে শুধুমাত্র সশস্ত্রবাহিনী থাকলেই চলবে না, পাশাপাশি সহায়তার জন্য নাগরিক সমাজকেও প্রস্তুত থাকতে হবে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া তিনি এ অভিমত দিয়েছেন যে, একটি শক্তিশালী, সুপ্রশিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সশস্ত্রবাহিনী আকারে ছোট হলেও ক্ষতি নেই, যদি একে প্রয়োজনে রাবারের মতো টেনে বড় করা যায়। এ ব্যাপারে তার পরামর্শ হচ্ছে যদি সশস্ত্রবাহিনী থেকে অবসর নেয়া সস্যদের রিজার্ভ লিস্টে রাখা যায় এবং গড়ে তোলা যায় শক্তিশালী আনসার-ভিডিপি বাহিনী তা হলে জরুরী অবস্থায় খুব কম সময়ে বিশাল প্রতিরক্ষা বাহিনী দাঁড় করিয়ে দেয়া যায় শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধে। এভাবে শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রণীত পরিকল্পনানুযায়ী এক কোটি আনসার, ভিডিপি বাহিনী গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি জানিয়েছেন, আপাতত সিটিজেন আর্মি কনসেপ্টে না গিয়ে আমাদের বরং এ ধরনের সেকেন্ড লাইন ফোর্স গঠনে জোর দেয়া উচিত। কারণ, তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী সিটিজেন বা উৎপাদনশীল আর্মি কনসেপ্ট থিয়োরিটিক্যালি ভাল শোনালেও বাস্তবে পৃথিবীর কোথাও আজ এ ধারণা প্রয়োগ করা হয় না। এমনকি বিশ্বের কোন সামরিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এ ধরনের কোন কনসেপ্ট পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া আর্মিকে যারা কৃষিকাজসহ কথিত উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করতে চান তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আর্মি দিয়ে যদি একবার ব্যবসা করানোর চেষ্টা করা হয় তা হলে সেটি আর ফাইটিং আর্মি থাকবে না। তবে জনস্বাস্থ্যসেবা, স্কুলঘর নির্মাণ ইত্যাদি সেবামূলক কাজে নিয়োজিত করায় কোন নেতিবাচক দিক নেই বলে তিনি বলেছেন।

(দৈনিক ইনকিলাব. ১৩.০৫.২০০০)

একই অঞ্চলে যদি কেউ বেশী শক্তিধর হয়ে উঠে তা হলে শক্তির ভারসাম্য ব্যাহত হয়

মেজর জেনারেল (অবঃ) এম. এ. হালিম, পিএসসি

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর বা ডিজিএফআই-এর সাবেক মহাপরিচালক মে. জে. (অবঃ) এম. এ. হালিম একজন মুক্তিযোদ্ধা। ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি এক লিখিত সাক্ষাতকার প্রদান করেন প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলী নিয়ে। এখানে তো পত্রস্থ করা হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি কিরূপ হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

মে. জে. (অব.) এম. এ. হালিম ঃ সম্প্রতি প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বেশ লেখালেখি হচ্ছে। সেমিনার, আলোচনা সভা, এমনকি সংসদীয় কমিটিতে প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জনগণের মনে প্রতিরক্ষা নীতি ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক নানা প্রশ্ন জেগেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেল। এতোদিন পরে এই প্রশ্ন কেন? তাহলে কি কোন নীতি ছাড়াই প্রতিরক্ষা বাহিনী কাজ করে যাচ্ছিল? নীতি ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের রূপরেখা প্রণয়ন, কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এর উপর ভিত্তি করেই প্রতিরক্ষা বাহিনী তার রূপরেখা, অবকাঠামো, জনবল, সরঞ্জামাদি প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

দেশের প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করার দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের আর তার বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব সামরিক কর্মকর্তাদের। আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করার পূর্বে কতগুলো বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে; যেমন আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, পার্শ্ববর্তী দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শ, প্রতিবেশীর প্রতি তাদের মনোভাব ইত্যাদি। এছাড়া আধুনিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব অসীম। এই সব বিষয় বিবেচনা করে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি সবার সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র হল Friendship to all, Malice to none. আমরা আগ্রাসন বা সম্প্রসারণের নীতিতে বিশ্বাসী নই, আত্মরক্ষামূলক নীতিতে বিশ্বাসী। শত্রুর আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি ও ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেন আমাদের দেশের জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে বা আত্মরক্ষার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হতে হয়।

প্রশ্ন ঃ আমরা জানি বাংলাদেশের কোন লিখিত প্রতিরক্ষা নীতি নেই। কেন? আর প্রতিরক্ষা নীতি লিখিত থাকার প্রয়োজন আছে কি-না?

মে. জে. (অব.) এম. এ. হালিম ঃ সব দেশেরই প্রতিরক্ষা নীতি রয়েছে। এমন কোন স্বাধীন দেশ নেই যার প্রতিরক্ষা নীতি নেই। লিখিত হোক আর অলিখিত হোক প্রতিরক্ষা নীতি থাকা অপরিহার্য। জাতীয় পর্যায়ে প্রতিরক্ষা নীতির শুধু মূল ধারণা বা Concept দেয়া থাকে। তাই লিখিত না হলেও কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, তবে লিখিত হলে ভাল।

প্রতিরক্ষা নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিরক্ষার রূপরেখা, অবকাঠামো, জনবল, সরঞ্জামাদি ইত্যাদির পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরবর্তীতে রণকৌশল ও সমর কৌশল নির্ণয় করা হয় এবং প্রশিক্ষণ ও মহড়ার মাধ্যমে এই সকল কৌশলের বাস্তব প্রয়োগ করা হয়। এই সকল পরিকল্পনা অবশ্যই লিখিত হতে হবে।

জাতীয় ও প্রতিরক্ষা নীতির মূল ধারণা বা Concept জনসমক্ষে আলোচনা করা যেতে পারে। সংসদেও আলোচনা হতে পারে। কিন্তু প্রতিরক্ষা নীতির লক্ষ্য অর্জনে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তা গোপন থাকাই কাম্য।

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি (২০০০ সালে) ভারত তার প্রতিরক্ষা বাজেট ২৮% বাড়িয়েছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কতটুকু? এবং আমাদের বাজেট বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে কি-না?

মে. জে. (অব.) এম. এ. হালিম ঃ এক প্রতিবেশীর শক্তি বাড়লে তার প্রভাব অন্য প্রতিবেশীর উপর পড়ে বৈকি। ভারত আমাদের প্রতিপক্ষ নয় বরং আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ। ভারতের সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতা আমাদের কাম্য নয়। আমরা শান্তিপ্রিয় দেশ, পার্শ্ববর্তী সব দেশের সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্ব বজায় রাখা আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র। তবে একটি অঞ্চলে সব ক্ষমতাবান দেশের শক্তির মাঝে যদি আনুপাতিক সমতা থাকে তা হলে শক্তির একটা ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। আর যদি কেউ বেশী শক্তিধর হয়ে উঠে তা হলে শক্তির ভারসাম্য ব্যাহত হয়। এতে শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আগেই বলেছি, ভারতের সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতা আমাদের কাম্য নয়। ভারত তার প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করেছে বলে আমাদেরও বৃদ্ধি করতে হবে- এমন কোন কথা নেই। তবে আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি সচল রাখতে এবং আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রতিরক্ষা বাজেট যতটুকু বাড়ানোর প্রয়োজন শুধু ততটুকু বাড়ালে চলবে।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলেন আমরা বৃহৎ ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং তার রয়েছে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সেনাবাহিনী। সুতরাং ভারতের সাথে যুদ্ধের প্রশ্নই উঠে না। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

মে. জে. (অব.) এম. এ. হালিম ঃ প্রশ্ন হচ্ছে ভারত যদি কখনও কোনভাবে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন আমরা কি করবো? তাদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করবো? যুদ্ধের প্রশ্ন যদি না-ই উঠে তা হলে তো তা-ই করতে হবে। তা হলে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কি হবে? জাতি হিসাবে আমরা যে শপথ নিয়েছিলাম যে নিজের জীবন দিয়েও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবো, সে শপথের মূল্য কোথায় থাকবে?

ইসরাইল একটি ক্ষুদ্র দেশ-চারদিকে শত্রু দ্বারা বেষ্টিত, তবু তারা যুদ্ধ করছে। চেচনিয়া বিরাট শক্তিধর রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। যুদ্ধ কেউ চায় না। বিশেষ করে যে সব দেশ সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তারা সব সময় যুদ্ধ এড়িয়ে চলে। কিন্তু যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে, কোন জাতি যুদ্ধ করেনি- এমন নজির খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর।

যুদ্ধ আমরা অবশ্যই চাই না। কিন্তু যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে বা অনিবার্য হলে আমরা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবো- এই মহান ব্রতই হবে আমাদের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

প্রশ্ন ঃ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর কি কনভেনশনাল না-কি সিটিজেন আর্মি রূপে গঠিত হওয়া উচিত?

মে. জে. (অব.) এম. এ. হালিম ঃ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসাবে ছোট হোক বড় হোক বিশ্বের সব দেশেরই নিয়মিত বাহিনী আছে। বাংলাদেশেরও নিয়মিত বাহিনী থাকা উচিত। Citizen Army নিয়মিত বাহিনীর সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু সীমান্তে আসন্ন বা শত্রুর তড়িৎ আক্রমণ প্রতিহত করতে নিয়মিত বাহিনীর বিকল্প নেই। আমাদের দেশে নিয়মিত বাহিনীর আকার ছোট রেখে আপদকালীন সময়ে প্রয়োজনে Citizen Army দ্বারা এর সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অনেক দেশে এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট Citizen Army Concept-এ যাওয়ার অনুকূলে নয়। কারণ আমাদের দেশে অনেক সন্ত্রাসীর নিজস্ব বাহিনী রয়েছে। অনেক সমাজপতি ও বিত্তশালী ব্যক্তি God Father হয়ে নিজস্ব বাহিনী পুষে থাকেন। এই সব বাহিনী নিয়ে তারা Mini Army গড়ে তুলেছে এবং নিজ এলাকায় তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করেছে। সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত Citizen Army যুবকদের নানা প্রলোভনে বা প্রভাবে এই সব বাহিনীতে যোগদানের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ভারত পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের জন্য ভারতই হুমকি

কেবল ভৌগোলিক স্বাধীনতা নয় আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষাই হচ্ছে প্রতিরক্ষা নীতি

কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন, বীর প্রতীক

বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ কি হওয়া উচিত তা নিয়ে মুখোমুখি হয়েছিলাম

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সাবেক মন্ত্রী, প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা, সংসদ সদস্য, কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) আকবর হোসেনের, যিনি কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন সেনাবাহিনীতে। কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) আকবর হোসেন আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রতিরক্ষা নীতি হচ্ছে আমার স্বাধীন-স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং ব্যতিক্রমগুলোকে রক্ষা ও বিকশিত করার নীতি। বর্তমান যুগে ভৌগোলিক আগ্রাসনের চেয়েও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে আগ্রাসনের সমস্যাই বড় সমস্যা। তিনদিক ভারতবেষ্টিত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা, তার স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতই হচ্ছে হুমকি। তিনি বলেন, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতকে আক্রমণের জন্য নয়। ভারত থেকে বাঁচার জন্য। ভারত এ অঞ্চলে বৃহৎ সামরিক শক্তি। তাই আমরা ছোট দেশগুলো উদ্বিগ্ন। ভারত যদি তার সামরিক ব্যয় না বাড়ায় তা হলে আমাদেরও হয় তো প্রয়োজন পড়বে না। তিনি বলেন, যারা আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট কমাতে বলেন, তাদের উচিত আগে ভারতকে এ কাজে বাধ্য করা।

জনাব আকবর হোসেন বলেন, কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা রক্ষা নয়, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পররাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি মাথায় নিয়ে নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

কর্নেল (অব.) আকবরের সাথে সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণী নীচে দেয়া হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

আকবর ঃ আমাদের তিন দিকে ভারত, এক দিকে বঙ্গোপসাগর। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সকল ক্ষেত্রে ভারতই হচ্ছে আমাদের জন্য হুমকি। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিরক্ষা নীতি হচ্ছে আমার স্বাধীন-স্বতন্ত্র সত্তাকে রক্ষা এবং বিকশিত করার নীতি। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার জনগোষ্ঠী থেকে অন্য ভৌগোলিক সীমারেখার জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে বিধায় একে অপরের থেকে স্বাধীন। এ কারণেই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ভারত ও পাকিস্তান পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র। আমাদের এই বাংলাদেশের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রম অর্থনীতির ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক, সামাজিক আচার, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ইতিহাস, ঐতিহ্য সব ক্ষেত্রেই। আর এ ব্যতিক্রমগুলো শাণিত করাই হচ্ছে আমার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। অর্থাৎ আমার স্বাধীন সত্তা তথা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখা এবং শাণিত করাই হবে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি। আমাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা ও বিকশিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে, অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে, পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার নীতিতে প্রতিরক্ষার চিন্তা সন্নিবেশ করতে হবে। কারণ আমাদের ব্যতিক্রমগুলো যদি অন্যের সাথে মিশে যায় তা হলে আর আমার স্বাধীনতা থাকে না। সঙ্গত কারণেই ভারত

বাংলাদেশের নিকট প্রতিবেশী এবং সকল দিক দিয়েই বাংলাদেশ থেকে বড়। তাই বাংলাদেশের ব্যতিক্রম এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ভারতের দ্বারাই। তাই প্রতিরক্ষা নীতিতে এ বিষয়টিকে মুখ্য হিসেবে দেখতে হবে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে কোন লিখিত প্রতিরক্ষা নীতি আছে কি-না। এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং তা কিভাবে গড়ে তোলা যায়.....?

আকবর ঃ বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিরক্ষা নীতির কোন লিখিত কাঠামো না থাকলেও এদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিরক্ষার একটি মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো রয়েছে। এ কারণেই বাংলাদেশ এখনো স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এদেশের জনগণ ভালভাবেই জানে, কোন বহিঃশক্তি তাদের স্বাধীন সত্তার হুমকির কারণ হতে পারে। অর্থনীতিতে যখন বিপর্যয় নামে, যখন চোরাচালান বাংলাদেশের শিল্পকে ধ্বংস করে, ডাম্পিং নীতির মাধ্যমে দেশী পণ্যকে দেশের বাজার ছাড়া করা হয় তখন জনগণ সহজেই বুঝতে পারে, এটা কাদের দ্বারা এবং কোন্ দেশ থেকে হচ্ছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যখন আঘাত আসে, বিলীন করে দেয়ার চেষ্টা নেয়া হয় তখনও সহজেই ধরা পড়ে এখানে কার আগ্রাসন কাজ করছে। মোদ্দাকথা, জনগণ প্রতিরক্ষা সম্পর্কে সচেতন এবং শত্রুও চিহ্নিত। তবে এ সচেতনতাকে সংগঠিত রূপ দেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা দরকার। একটি নীতিগত কাঠামো প্রয়োজন। ভৌগোলিক আগ্রাসন মোকাবিলায় একটি সুসংগঠিত সেনাবাহিনী অবশ্যই থাকবে। কিন্তু বর্তমান যুগে ভৌগোলিক আগ্রাসনের চেয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে আগ্রাসন প্রতিরোধের চেতনা এবং সংগঠিত রাখার একটি চলমান ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলে থাকেন, বাংলাদেশ বিশাল ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভারতের বিশাল সশস্ত্র বাহিনীকে আমাদের কোন অবস্থাতেই মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের বড় সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। এর বাজেট আরো কমানো উচিত। কেউ কেউ বলেন, বাংলাদেশে সেনাবাহিনী থাকারই দরকার নেই। অথচ ভারত তার প্রতিরক্ষা বাজেট ২৮ ভাগ বাড়িয়েছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

আকবর ঃ যারা বলেন, ভারতের বৃহৎ সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় আমাদের এই ছোট সেনাবাহিনী দিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়, তাই সেনাবাহিনীর বাজেট কমানো উচিত তারা স্ববিরোধী বক্তব্য রাখছেন। যখন ভারতের তুলনায় আমাদের সেনাবাহিনী ছোট হিসেবে বিবেচিত হবে তখন সঙ্গত কারণেই বৃহৎ বাহিনীর মোকাবিলায় আমাদের বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আমাদের অর্থের অভাব থাকতে পারে, সামর্থ্যের দুর্বলতা থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে যে শক্তিশালী করতে হবে- এটা অনস্বীকার্য-ভারতের বৃহৎ সেনাবাহিনী না থাকলে এবং তারা বছরের

পর বছর সেনাবাহিনীর বাজেট না বাড়ালে আমাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হতো না। ভারতের সেনাবাহিনী কার জন্য? নিশ্চয়ই আমেরিকা বা ইউরোপের জন্য নয়। এ সেনাবাহিনী পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা তথা তার আশপাশের দেশগুলোর জন্যই তো। সে যদি তার সেনাবাহিনী শক্তিশালী করতে পারে তা হলে আমি পারব না কেন? আজকের যে বৃহৎ ভারত তা আগে এ অবস্থায় ছিল না। বৃটিশরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলোকে এক করে দিয়ে এ বৃহৎ ভারত প্রতিষ্ঠা করে গেছে। আজ যদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্য অর্থাৎ পূর্বের আসাম যদি স্বাধীন থাকত, যদি কাশ্মীর স্বাধীন থাকত, ইউপি, পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন থাকত তা হলে এ অঞ্চলে কারোরই বড় সেনাবাহিনী রাখার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এখন ভারত যেহেতু একটি বৃহৎ সামরিক শক্তি, তাই প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন। যে চিন্তা আজ বলে আমাদের কনভেনশনাল আর্মি থাকা উচিত নয় তাদের বলা উচিত ভারতেরও আর্মি থাকার প্রয়োজন নেই। তা হলে পুরো অঞ্চলকে নো আর্মফোর্স প্যাক্টে আনতে হবে। কিন্তু তা না বলে শুধু বলা হয় বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই বা সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা আর বাজেট কমাতে হবে। তখন এ বক্তব্যকে স্বাভাবিকভাবে নেয়া যায় না। এ বক্তব্যকে প্রতিরক্ষা চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণ করতে হবে। একটি বিষয়ে সবার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে, আমরা ছোট হতে পারি। কিন্তু স্বাধীন এবং স্বাধীন থাকতে চাই। জয়নাল হাজারীর কাছ থেকে ভিপি জয়নালকে বাঁচাতে হলে দু'টি পদ্ধতিতে বাঁচা যায়। প্রথমত, তার মোকাবিলা করে, দ্বিতীয়ত, তার অনুকম্পা নিয়ে। দ্বিতীয় পথে ভিপি জয়নালের স্বাধীনতা ও মর্যাদা থাকে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিষয়টি এরূপই। তাই আমার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আমার সেনাবাহিনী ভারতকে আক্রমণের জন্য নয়। ভারত থেকে বাঁচার জন্য। আমাদের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন নেই-এ তত্ত্ব নয়। সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে। এ তত্ত্বের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনুযায়ী কিভাবে শক্তিশালী করা যায় তার পরিকল্পনা করতে হবে। দাতাদের যারা আমাদের প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট কমানোর কথা বলেছেন তাদের উচিত ভারতকেও একই প্রেসক্রিপশন দেয়া। ভারত যে বছর বছর তাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াচ্ছে এক্ষেত্রে তারা কিছু বলছে না কেন?

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কি কনভেনশনাল না সিটিজেন আর্মি হওয়া উচিত?

আকবর ঃ যারা সিটিজেন আর্মির কথা বলেন, তাদের বলি সিটিজেন আর্মির একটি পরিকল্পিত কাঠামো থাকতে হবে। গোলাবারুদ, যানবাহন, অস্ত্রাগার, এয়ারফোর্স, নেভী লাগবে। এ সম্পূর্ণ শক্তিটা কতটুকু, তার প্রেক্ষিত হবে আমার জন্য হুমকি। যে শক্তি আমার শক্তিটাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তা পরিচালনার জন্য তো একটি নিউক্লিয়াস থাকতে হবে। যা সুদক্ষ এবং সুসংগঠিত হবে। এই নিউক্লিয়াসবাহী হচ্ছে সেনাবাহিনী। তাই সিটিজেন আর্মির চিন্তাধারায়ও নিউক্লিয়াস হিসেবে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন রয়েছে এবং সেনাবাহিনী থাকতে হবে। বাজেট বাড়লেও এই নিউক্লিয়াসের অধীনে যদি পুরো জনগোষ্ঠীকে সামরিক প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় আমি তাতে রাজি। কারণ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্বের ব্যাপারে, স্বাতন্ত্র্য স্থিতি সম্পর্কে

অবশ্যই সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। তা হলেই বাংলাদেশে সামগ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

তবে সবচেয়ে উত্তম যদি আলোচনার মাধ্যমে পাক-ভারত-বাংলাদেশ এ উপমহাদেশে সামরিক উত্তেজনা কমিয়ে আনা যায়। (ইনকিলাব, ২৩.০৪.২০০০)

বাংলাদেশকে সামরিক দিক দিয়ে পরাভূত করা সম্ভব নয়

একটি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী সরকারের পক্ষেই কার্যকর প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন সম্ভব

মেজর (অব.) মনজুর কাদের
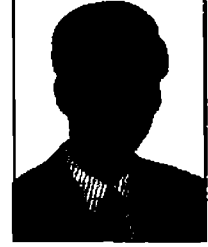
প্রাক্তন সেচ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এবং ইংরেজী সাপ্তাহিক এভিডেন্স পত্রিকার সম্পাদক মেজর (অব.) মনজুর কাদের বলেছেন, বাংলাদেশকে সামরিক দিক দিয়ে পরাভূত করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা পরোক্ষভাবে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এদেশে একটি তাবেদার পুতুল সরকার কায়েম রাখতে চায়। তিনি এও বলেন যে, ভারত আমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করে তা দেশবাসীর জানা আছে। ১৯৭১ সালে ভারত আমাদের সাহায্য করেছিল কোন উদারতার মনোভাব নিয়ে নয়, মানবতার কথা বিবেচনা করে নয়, সে সহযোগিতা করেছিল তার নিজস্ব স্বার্থে ও প্রয়োজনে।

মেজর (অব.) মনজুর কাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত থাকা ছাড়াও ১৯৬৮-'৬৯ সালে পাবনা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আঞ্চলিক কমিটির আহবায়ক হিসেবে গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের নেতা হিসেবে যোগ দেন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন মেজর মনজুর কাদের এএসসি স্কুল, আর্মি মিলিটারী পুলিশ স্কুলের প্রশিক্ষক হিসেবে এবং আর্মি হেডকোয়ার্টারে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া তিনি সেনাবাহিনীর কম্বাইন্ড আর্মস স্কুলে ট্যাকটিক্যাল কোর্স, আর্মি মিলিটারী পুলিশ অফিসার্স কোর্স এবং পুলিশের গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ স্কুলে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ কোর্স করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ মেজর মনজুর কাদের ১৯৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত সাংবাদিকতা পেশাতে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিকমানের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'এভিডেন্স' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন ঃ

প্রশ্ন ঃ ছোট-বড় সব দেশেরই একটি প্রতিরক্ষা মতবাদ থাকে। বাংলাদেশে এ ব্যাপারে এ যাবত সুনির্দিষ্ট কোন রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিরক্ষা

মতবাদ কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

মেজর কাদের ঃ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ যেমন ভারত, চীন এবং মায়ানমারের মনোভাবের দিকে নজর রেখেই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আমরা যদিও সব সময় বলি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কিন্তু ভারত আমাদের কিরূপ আচরণ করে তা দেশবাসীর জানা আছে। ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করেছিল কোন উদারতার মনোভাব নিয়ে নয়, মানবতার কথা বিবেচনা করে নয়, সে সহযোগিতা ভারত করেছিল তার নিজস্ব স্বার্থে ও প্রয়োজনে। ভারতের সামরিক সহযোগিতা আমরাও আমাদের প্রয়োজনে গ্রহণ করেছিলাম। কেউ কেউ মনে করেন যে, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের এই সহযোগিতার কথা চিরদিন স্মরণ রাখতে এবং চিরদিন ভারতের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। দেশমুক্ত হওয়ার মাত্র ৩ মাসের মাথায় সারাদেশের জনতা ফুঁসে উঠেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং তারই ফলশ্রুতিতে ভারতকে তাঁর সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মাটি থেকে অতি দ্রুত প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছিল। তাই প্রতিরক্ষা মতবাদের কথা বলতে হলে আমাদের সম্ভাব্য থ্রেট হিসেবে ভারতের কথাই খেয়াল রাখতে হবে। কারণ ভারত অতীতে তার আশপাশের ছোট ছোট ভূখন্ডকে গ্রাস করেছে। ভারতের এই আগ্রাসী চরিত্রের বিপরীতে কিভাবে আগ্রাসন প্রতিরোধ করা যায়, সেটাই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে সামরিক খাতেই যে কেবল ভারত আমাদের আক্রমণ করতে পারে তা নয় বরং এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়েই এখন ভারতীয় আগ্রাসনের ছোয়া পাওয়া যায়। প্রতিরক্ষা অর্থাৎ জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা যদি বলা হয়, তাহলে এসব প্রতিটি খাতেই আগ্রাসন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান একমেরু বিশ্বে সরাসরি সামরিক আগ্রাসন চালানোর চেয়ে উপরোক্ত খাতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা অনেক সহজ। এখানে আমি উদাহরণ হিসেবে আমাদের সেনাবাহিনীতে অশোক লেল্যান্ড ট্রাক ক্রয়ের কথা বলতে পারি। একটি গুলী না ছুঁড়েও ভারত আমাদের সেনাবাহিনীতে পর্যন্ত মিলিটারী ভার্সন ভেহিক্যাল সরবরাহের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অবশ্য অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক খাতে শুধু ভারতই নয়, পশ্চিমী আগ্রাসনও আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। তাই সবদিকে রক্ষার জন্য আমাদের সম্ভব সব উপায় অবলম্বন করার কোন বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ঃ একটি দেশে লিখিত প্রতিরক্ষা নীতি থাকার প্রয়োজন আছে কিনা? যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে এতদিন বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়নি কেন?

মেজর কাদের ঃ এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয়। তারা তখন ভারতের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই ব্যস্ত ছিল। অথচ ভারত প্রতিনিয়ত বাংলাদেশকে একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা করছিল। ১৯৭৫ সালের আগষ্ট এবং নভেম্বরে ভারতের সে স্বপ্ন এবং চেষ্টা বিফল হয়। এরপর বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীতে সৈনিকদের প্রশিক্ষণের সময় ভারতকে সম্ভাব্য শত্রু হিসেবে ধরেই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

জেনারেল জিয়ার শাসনামলে একটি ছায়া প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের কথাও জানা যায়। তবে একথাও ঠিক যে, এ যাবত প্রকাশ্যে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করার ব্যাপারটি চেপে যাওয়া হয়েছে। তবে আমাদের দেশের একটি শক্তিশালী দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির সরকার গঠিত হলেই কেবল আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে বাইরের শত্রু থেকে রক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ উপমহাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে উত্তপ্ত অঞ্চল। এর ওপর ভারত সম্প্রতি তার প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েছে শতকরা ২৮ ভাগ। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো উচিত কিনা?

মেজর কাদের ঃ বর্তমান বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো জাতীয় আয়ের ওপর নির্ভর করে। অতীতে যখন স্নায়ুযুদ্ধ বা কোল্ড ওয়ার ছিল তখন পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিশালী দেশগুলো বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত ছিল। সে সময় শক্তিশালী দেশসমূহ তাদের প্রয়োজনানুযায়ী ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব অনুসারে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করত, বর্তমানে সে অবস্থা নেই। এখন অনেকটা নিজ জাতীয় আয় থেকেই প্রতিরক্ষা ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এক্ষেত্রে ভারতও তাই করছে। রাশিয়া সমরোপকরণ দিলেও ভারতকে তার কোটি কোটি নাগরিক অভুক্ত রেখেই এমন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। এক সময় সোভিয়েত রাশিয়া এমন সীমাছাড়া হারে বাজেট বাড়াতো। ফলে রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে নজর দিতে না পারায় সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে যায়। ভারতের পরিণতিও সে রকম হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ভারত সামরিক বাজেট মূলত পাকিস্তান, চীনকে টার্গেট করে বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশকে ঐ হারে বাজেট বাড়ানোর কোন যুক্তি নেই। বরং আমি আগেই বলেছি, আমরা যদি ভারতের পরোক্ষ আগ্রাসনগুলো সচেতনভাবে রুখে দিতে পারি, তাহলেই মোটামুটি নিরাপদে থাকা সম্ভব। কিন্তু তাই বলে আমরা প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বাড়াবো না-এমটা ঠিক নয়। আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে যতটুকু পারা যায়, ততটুকু আমাদের করতেই হবে। তবে একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী সরকারই পারে আভ্যন্তরীন সম্পদ বৃদ্ধি করে দেশ রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করতে।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলে থাকেন, আমরা বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সেনাবাহিনীর অধিকারী ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। এছাড়া ভারত বন্ধু রাষ্ট্র। এ জন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর আদৌ প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

মেজর কাদের ঃ আমরা যেমন বিশাল ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত, ভারত তেমনি তার বৈরি পাকিস্তান, কাশ্মীর, নেপাল এবং চীন দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাংলাদেশকে আক্রমণ করতে হলে ভারত তার সামরিক শক্তি ঐ সকল দেশের সীমান্ত থেকে প্রত্যাহার করে বাংলাদেশ সীমান্তে সমাবেশ ঘটাতে পারবে না। ১৯৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ভারত থেকে সামরিক বাহিনী হামলা চালায়। ১৯৭৭ সালের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বিভিন্ন সেনানিবাসে সামরিক অফিসারদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে ভারতীয় আক্রমণের

কথা তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, ভারত বাংলাদেশকে আক্রমণ করলে প্রথমে একটি কনভেনশনাল যুদ্ধ হবে, এর পরে দেশের ভূখন্ড রক্ষার জন্য গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল যেমন আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, মনিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম- এই সাতটি রাজ্য গেরিলা যুদ্ধ করে দিল্লীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করতে চাচ্ছে। তাই বাংলাদেশকে সামরিক শক্তি দিয়ে পরাভূত করে ভারত তখনই উত্তর-পূর্ব ভারতের পাশে ১২ কোটি বাংলাদেশীকে গেরিলায় রূপান্তরিত করার পদক্ষেপ নেবে না। সুতরাং ভারত একটি বিশাল শক্তি, আমরা তার সাথে পারবো না-এ ধরনের অমূলক ভীতির মধ্যে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই সশস্ত্র বাহিনী আকারে ছোট হলেও থাকতে হবে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মোকাবিলার জন্য সশস্ত্রবাহিনী রাখতে হয়। শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া আর্মিকে তাই আজ এখন ব্যবহার করা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ স্যাবোটাজ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করার জন্য। আজ যদি এ দেশগুলোয় সশস্ত্র বাহিনী না থাকত, তা হলে কি অবস্থা দাঁড়াতো-তা যে কেউ অনুধাবন করতে পারেন। তাই আমাদের দেশের সেনাবাহিনী থাকার দরকার নেই-যারা বলেন, তারা আসলে বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। এদিকে বাংলাদেশকে সামরিক দিক দিয়ে পরাভূত করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তারা এদেশে একটি তাবেদার পুতুল সরকার কায়েম রাখতে চায়। আর একান্তই যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে একটি জাতীয়তাবাদী সরকারে গোপন তাবেদারদের অত্যন্ত সুকৌশলে ঢুকিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব নিরংকুশ করতে হলে সকল মহলকেই এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কি নভেনশনাল সিটিজেন আর্মি হওয়া উচিত?

মেজর কাদের ঃ আধুনিক বিশ্বে অবশ্যই বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে অত্যাধুনিক কনভেনশনাল ফর্মেই গড়ে তুলতে হবে তা সংখ্যার দিক দিয়ে ছোট হলেও। কারণ, প্রয়োজনে ঐ ছোট এবং অত্যাধুনিক বাহিনী নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে জনগণের সহায়তায় একটি বিশাল প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করতে সক্ষম হবে। আর সিটিজেন আর্মি কনসেপ্ট সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ব্যাকডেটেড ধারণা। তবে আমাদের জনগোষ্ঠীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলা প্রয়োজন বলেও আমি মনে করি।

সামরিক আগ্রাসন দৃশ্যমান-অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অদৃশ্য

সশস্ত্রবাহিনী হচ্ছে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের স্ট্যাবিলাইজার

মে. জে. (অব.) মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, পিএসসি

দীর্ঘ প্রায় বত্রিশ বছরের সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, পিএসসি বলেছেন, সশস্ত্রবাহিনী হলো একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের

ভারসাম্য রক্ষাকারী বা স্ট্যাবিলাইজার। সশস্ত্রবাহিনী না থাকলে যেকোন দেশ যে কোন মুহূর্তে অস্থিতিশীল হয়ে পড়তে পারে। তাই তাঁর মতে, যারা সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজনীতাকে অস্বীকার করেন তারা হয় বাংলাদেশী নয়, নয় তো অন্তর্ঘাতক বা স্যাবোটিয়ার।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকারী মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ, পিএসসি ১৯৫৯ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করেন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি চাম্ব জরিয়া সেক্টরে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেন। '৭০ সালে কোয়েটাস্থ ষ্টাফ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন লাভকারী মে. জে. সামাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৮১, ৭৭ ও ৬৫তম ব্রিগেড কমান্ড করার পাশাপাশি ১৯৮০-'৮৪ পর্যন্ত কুমিল্লাস্থ ৩৩ পদাতিক ডিভিশন ও ১৯৮৬-'৮৭ পর্যন্ত তিনি সেনাবাহিনীর সিজিএস অর্থাৎ চীফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে ও ১৯৮৭-'৯০ পর্যন্ত ষ্টাফ কলেজের কমান্ড্যান্ট হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। দীর্ঘ সামরিক জীবনে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্রমবিবর্তন খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একজন সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত জেনারেল হিসেবে তিনি সবার কাছেই সমাদৃত।

১২ মে ২০০০ তারিখে তাঁর ডিওএইচএস-এর বাসায় গৃহীত সাক্ষাৎকারের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ প্রতিটি দেশের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকার প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিরক্ষা খাতও এর বাইরের কিছু নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ কিরকম হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

মে. জে. (অব.) সামাদ ঃ প্রতিরক্ষা মতবাদের অরিজিন বা উৎস যদি খোঁজা যায় তা হলে প্রথমেই দেখা যাবে যে, প্রতিটি মানুষেরই ব্যক্তিগতভাবে বেসিক ইন্‌সটিঙ্কট বা অনুভূতি থাকে আত্মরক্ষার। ব্যক্তিপর্যায় থেকে শুরু করে সামাজিক বা সমষ্টিগত পর্যায়েও আত্মরক্ষার এই ধারণাটি স্বীকৃত। এখন জাতি বা দেশ যা-ই হোক না কেন-তাদের আত্মরক্ষা করার একটি সহজাত অধিকার থাকে এবং প্রকৃতিগতভাবেই তারা এ ব্যাপারে জড়িয়ে যায়। ব্যক্তিজীবনে এর পরিধিটা হয় তো ছোট কিন্তু জাতীয় জীবনে দেশের প্রেক্ষাপটে এটা অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়।

প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে জাতীয় বা দেশীয় প্রেক্ষাপটে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা আমাদের প্রয়োজন। এর একটা হচ্ছে টেরিটরিয়াল বা প্রত্যক্ষ সামরিক আগ্রাসন। আর বাকিগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় খাতসহ অপরাপর সকল ক্ষেত্রে পরিচালিত আগ্রাসন। এ ধরনের আগ্রাসনের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। যে কোন দেশপ্রেমিক সরকার এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখে দেশের সকল নাগরিকের মধ্যে কিভাবে সচেতনতা গড়ে

তুলবে তার ওপর ভিত্তি করেই মূলত প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করা হয়। এখানে দেশবাসীকে হুমকির খাতসমূহ সম্পর্কে অবহিত করা এবং সে অনুযায়ী সচেতন করে তোলাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, অর্থনৈতিক আগ্রাসনের কথাই যদি ধরা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, অনেক সময় অর্থনৈতিক খাতে আগ্রাসন সামরিক আগ্রাসনের ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। যেমন-চোরাচালানের বিস্ময়কর ফল সম্পর্কে হয় তো সাধারণ দেশবাসী ততটা অবগত নয়। কিন্তু অব্যাহত চোরাচালানে এক সময় দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। সৃষ্টি হয় অস্থিরতা। এক সময় সাধারণ জনগণের কষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের মনোবল যায় কমে এবং যখন মনোবল কমে যায় তখন ভুক্তভোগী স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যাবে নেতিবাচক মনমানসিকতার অধিকারী, হতাশাবাদী বা ক্ষেত্রবিশেষে তার হতাশার প্রকাশ ঘটতে পারে আইন অমান্য করার মধ্যদিয়ে। সম্প্রতি ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে কথিত সিন্ডিকেট ব্যাংক কেলেঙ্কারির ঘটনায় এমনটিই লক্ষ্য করা গেছে। ঠিক একইভাবে সাংস্কৃতিক খাতেও আজ আমরা আগ্রাসনের শিকার। বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বাংলাদেশী কোন শিল্পীর চেয়ে এখন আমরা ডিশ কালচারে বেশী অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভারতীয় অভিনেত্রী মমতা কুলকার্নিকে নিয়ে এ দেশে পাগলপারা অবস্থা। এগুলোর ফল মোটেই ভাল নয়। সামরিক আগ্রাসন চোখে দেখা যায়। কোথায় গুলী চলল, কোথায় বোমা পড়ল-তা সবাই দেখতে পায়। কিন্তু সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আগ্রাসনের ধরন খুব সূক্ষ্ম হওয়ায় আপাতঃদৃষ্টিতে এগুলোকে চোখে দেখা যায় না। যেমন- মিশনারী তৎপরতার মাধ্যমে যখন ধর্মীয় পর্যায়ে আগ্রাসন চালানো হয় তখন সাধারণ মানুষ প্রাথমিক পর্যায়ে তা অনুধাবন করতে পারে না। প্রতিবেশী ভারতে এ ধরনের খ্রীষ্টান মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে আজ যে প্রতিবাদ আমরা দেখি তা ধর্মীয় পর্যায়ে আগ্রাসনের একটা উদাহরণ হতে পারে। এরূপ আগ্রাসন প্রথম দিকে বোঝা না গেলেও যখন এগুলো একটা আকার নেয়, তখন বোঝা যায়। কিন্তু সে পর্যায়ে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ ধরনের বিভিন্ন খাতে যেখানে আগ্রাসনের সম্ভাবনা আছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে সরকার ও সচেতন নাগরিকদের পক্ষ থেকে যারা সচেতন নয় তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ নিতে হবে।

অন্যদিকে, যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ সামরিক আগ্রাসন পরিচালিত হয় বা কেউ যদি আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করে, তা হলে সেটা যেই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ জন্য প্রত্যেক দেশে একটা স্ট্যান্ডিং আর্মি থাকে এবং তাদের কাজ হচ্ছে বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রথম ধাক্কা থেকে দেশকে রক্ষা করা। যা হোক, সামগ্রিকভাবে আমি বলব-আমরা আগ্রাসী নই। আগ্রাসন পরিচালনা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু সামরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অর্থাৎ সকল সেক্টরে বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতাকে মোকাবিলার লক্ষ্যে আমাদের একটা প্রস্তুতি অর্থাৎ প্রতিরক্ষা মতবাদ থাকতে হবে।

প্রশ্ন : একটি দেশে লিখিত প্রতিরক্ষা নীতি থাকার প্রয়োজন আছে কি-না? যদি সে প্রয়োজন থেকে থাকে তাহলে এতদিন বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়নি কেন?

মে. জে. (অব.) সামাদ : অবশ্যই প্রতিরক্ষা নীতি সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত থাকার প্রয়োজন আছে, তা না হলে হাল ছাড়া নৌকার মত অবস্থা হবে। অথচ এটা লিখিত থাকলে প্রতিরক্ষা নীতিতে যে ধারাবাহিকতা ও সময় সময় সংশোধনের প্রয়োজন হয় তা করা যায়। এছাড়া প্রতিরক্ষাবাহিনীর উন্নয়নের প্রসঙ্গ তো রয়েছেই। তবে এতদিন বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা নীতি কেন প্রণয়ন করা হয়নি, সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন না করে এদেশে যারা সরকার প্রধান বা সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন তাদের করলেই যথার্থ উত্তর পাওয়া যাবে। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে মত হচ্ছে-বাংলাদেশের প্রথম দুই সরকার অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাক আহমদ সরকার পর্যাপ্ত সময় পায়নি প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য। আর সম্ভবত ভারতের সাথে সুসম্পর্ক থাকায় শেখ মুজিবুর রহমান একে এতটা প্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করেননি। তার হয়তো পরিকল্পনা ছিল সময়-সুযোগ মতো এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার। তার আগেই তিনি দুঃখজনকভাবে নিহত হন। এরপর জিয়াউর রহমানের সময় আক্ষরিক অর্থে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা না হলেও একটা ট্যাকটিক্যাল ডাইরেকটিভ তৈরি করা হয়েছিল। সামরিক খাতে আগ্রাসনকে হিসাবে রেখে এটি প্রণীত হয়। যার ওপর ভিত্তি করে '৭৬, '৭৭, ও '৭৮ সালে অনেক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে '৮১ সালের মার্চ মাসে এ নীতিমালার আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে জে. জিয়ার নির্দেশ জে. মীর শওকত আলী একটি মহড়ার আয়োজন করেন। এটা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। এ থেকে সে সময় অনেক কিছুই বেরিয়ে আসে। কিন্তু দুঃখের কথা, এ পরিকল্পনা থেকে কোন সুবিধা নেয়া যায়নি। কারণ, তার আগেই জে. জিয়া নিহত হন। তাই এই ট্যাকটিক্যাল প্ল্যানের সফলতার জন্য যে স্ট্র্যাটেজিক্যাল সাপোর্ট নির্ধারণের প্রয়োজন ছিল তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। পরবর্তীতে সরকারগুলোর সময় এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল কি-না তা বলা সম্ভব নয়। জে. জিয়ার মৃত্যুর পর এক সময় জে. এরশাদ তদানীন্তন সরকারের কাছে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব দেন। আমরা ভেবেছিলাম সিকিউরিটি কাউন্সিল হলে হয় তো প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা যাবে। কিন্তু ক্ষমতায় এসে জে. এরশাদ নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের কথা ভুলে যান এবং প্রতিরক্ষা নীতি নিয়েও তখন আর কিছু হয়নি। যদি হতো তা হলে আমি অবশ্যই জানতে পারতাম। কারণ ১৯৮৪-'৮৬ পর্যন্ত আমি আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে সিজিএস অর্থাৎ চীফ অফ জেনারেল স্টাফ হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম।

এদিকে, বাংলাদেশে কোন লিখিত প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়নি কেন, তার একটা উত্তর হতে পারে যে, এ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে ভারতের কথা উল্লেখ করতে হয়। এখন কেউ হয় তো বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে চায় না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, প্রতিরক্ষা

নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে হুমকির খাত বা দিকসমূহ চিহ্নিত করতে হলে ভারতের কথা না বলেও তা করা যায়। জামালপুর-শেরপুর দিয়ে কে বাংলাদেশে আক্রমণ চালাতে পারে তার নাম না উল্লেখ করলেও বুঝে নিতে তো কোন অসুবিধা নেই।

এছাড়া শুধু ভারত কেন, প্রতিরক্ষা নীতিতে হুমকির খাত বিবেচনা করতে হলে মায়ানমারের নামও তো আসতে পারে। একথা তো কারও অজানা নয় যে, ১৯৯১ সালে মায়ানমার আমাদের রেজুপাড়া বিওপি দখল করে নিয়েছিল। তার ওপর শ্রীলংকার উদাহরণ আমরা দিতে পারি। শ্রীলংকা আজ কোন বহিঃশত্রুর সাথে লড়ছে না। নিজ দেশে নিজ নাগরিকের বিরুদ্ধেই তাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এভাবে বাংলাদেশের খুলনা, যশোর এলাকা নিয়ে যদি কেউ স্বাধীন বঙ্গভূমির নামে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে তাহলে কি হবে? তাই প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করতেই হবে এবং এখন পলিটিক্যাল সরকারগুলো চিন্তা-ভাবনা করার যথেষ্ট সময় পাচ্ছে বলে এ ব্যাপারে তারা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে।

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি এ উপমহাদেশকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশেরই হাতে এখন রয়েছে পারমাণবিক বোমা। এছাড়া এ বছর ভারত তার প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েছে শতকরা ২৮ ভাগ। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো উচিত কি-না?

মে. জে. (অব.) সামাদ ঃ এ ক্ষেত্রে প্রথমেই একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। পানিতে তলিয়ে গেলে কারও মাথার ওপর দিয়ে এক ফুট পানি যাওয়া যা, দশ ফুট পানি প্রবাহিত হওয়াও তা। ঠিক সে ভাবে ভারতের সামরিক বাজেট ২৮% বৃদ্ধির বহু আগে থেকেই তা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তাই তাদের বাজেট ৮৮% বৃদ্ধি পেলেও আমাদের ঐ একই অবস্থা থাকবে। বাংলাদেশের জন্ম থেকে এই একই অবস্থা চলছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, তাই বলে কি আমরা অসচেতন থেকে যাব? না, মোটেও নয়। বরং আমাদের এমন একটা উপায় বের করতে হবে, যাতে আমরা পানির ওপর সাঁতার কেটে ভেসে থাকতে পারি। এ জন্য প্রথমে তলিয়ে যাওয়া থেকে আমাকে ভেসে উঠতে হবে। অন্তত একটা নৌযান তো থাকতে হবে-যাতে আমরা বৈঠা বেয়ে তীরে ভিড়তে সক্ষম হই। এখন এটা করতে গিয়ে আমরা তো ভারতের সাথে পাল্লা দিতে পারব না। সেটা অযৌক্তিকও হবে। তবে তারা যেভাবে পারমাণবিক বোমা ফাটালো তাতে আমাদের আরও অসন্তুষ্টির সাথে প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। ভারত ও পাকিস্তান দুটো দেশকেই আমাদের বলা উচিত ছিল যে, আমরাও এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং দক্ষিণ এশিয়া তাদের জমিদারীর অংশ নয়।

এদিকে আর্মি যদি রাখতে হয় তা হলে এর প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একে পরিপূর্ণ অবয়ব দিতে হলে স্বাভাবিক নিয়মেই বাজেট বাড়াতে হবে। পূর্বে যেখানে একটা জীপ চার লাখ টাকায় পাওয়া যেতো, এখন সেটা হয়তো আট লাখ টাকা। তাই

Present Price Index অনুসারে এমনিতেই বাজেট বাড়াতে হচ্ছে। এটা সরকারের ভাবার বিষয়। কারণ, যখন সরকারের প্রয়োজন হয় তখন তারা ট্যাক্স বাড়িয়ে হঠাৎ অতিরিক্ত ফি আদায় করে টাকা উঠিয়ে নেয়। তা হলে প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেটা হবে না কেন? এছাড়া, পরিবহণ খাতেই যদি ধরা যায় তা হলে দেখা যাবে কোটি কোটি টাকা চাঁদাবাজি হচ্ছে সেখানে। তাই দেশরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা খাতে সশস্ত্রবাহিনীকে অর্থ বরাদ্দ দিতে বাধা দেয়া হবে কেন?

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলেন, আমরা বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সশস্ত্রবাহিনীর অধিকারী বিশাল ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই ভারতের সাথে যুদ্ধের প্রশ্নই ওঠে না। সে জন্য সশস্ত্রবাহিনীরই প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি?

মে. জে. (অব.) সামাদ ঃ এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে-যারা এ ধরনের কথা বলছেন তারা বাংলাদেশী নয়, নতুবা স্যাবোটিয়ার্স বা অন্তর্ঘাতক। এরা এ ধরনের কথা বলে বাংলাদেশীদের নৈতিক মনোবল ও সাহস কমানোর কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তারা কি এটা ভুলে গেছেন, যখন ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল তারা কি জানত বা তাদের কি গ্যারান্টি দেয়া হয়েছিল যে, নয় মাসে দেশ স্বাধীন হবে? এমন নিশ্চয়তাও দেয়া যায়নি যে,এরা জীবিত থাকবে বা দেশে ফিরে আসতে পারবে। এরা কোন ফলাফলের কথা চিন্তা না করেই লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল। তাই জিততে পারব কি পারব না-তা কোন বাংলাদেশীর কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়। ভারত অনেক বড় দেশ হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভারত আমাদের গিলে খেয়ে ফেলবে। যারা নিরস্ত্রীকরণ বা সশস্ত্রবাহিনী বিলুপ্ত করার কথা বলেন, তাদের আগে উচিত ভারতকে ডিসআর্ম করার কথা বলা। আর বন্ধুত্বের কথা যদি উঠে তা হলে বলতে হয়, ১৯৬২ সালের পূর্বে চীন-ভারত খুব ভাল বন্ধু ছিল। 'হিন্দী-চীনা ভাই-ভাই' শ্লোগান তখন খুব শোনা যেত। সেই বন্ধুত্ব থাকার সময় কি ভারত তার আর্মিকে ডিসব্যান্ড করে দিয়েছিল? না-কি ছুটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল? এরপর তো ১৯৬২ সালে যুদ্ধই হল দুই বন্ধুর সাথে। তাই প্রতিবেশী কারও সাথে বন্ধুত্ব থাকলেই যে আর্মি রাখার প্রয়োজন হবে না তা সম্পূর্ণই অযৌক্তিক কথা। আর সশস্ত্রবাহিনীকে অনুৎপাদনশীল খাতও বলা যাবে না। কারণ, সশস্ত্রবাহিনী হল সমাজের স্ট্যাবিলাইজার। আর্মি না থাকলে পুরো সমাজেই অস্থিতিশীল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা হচ্ছে একটা রাষ্ট্রের শেষ ভরসাস্থল। এখন কথিত বুদ্ধিজীবীরা যে এটা বলছেন, তারা জেনে-শুনেই এটা বলছেন। তা না হলে তারা দেখাক, বিশ্বে কোন দেশের সশস্ত্রবাহিনী নেই? এ ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ডের কথা অনেকে বলেন। কিন্তু সে দেশেও একটা বড় প্রচলিত আর্মি রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, যে কোন সম্ভাব্য আক্রমণের কথা বিবেচনা করেই কিন্তু সশস্ত্রবাহিনী রাখতে হয়। হয় তো পঞ্চাশ বছরেও কোন যুদ্ধ হবে না, আবার পাঁচ বছরের মধ্যেও যুদ্ধ হতে পারে। এদিকে খেয়াল রেখেই সব সময় সশস্ত্রবাহিনীকে শক্তি ও প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয়। এ সাথে সশস্ত্রবাহিনীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে যত বেশী তৈরি রাখা যাবে, দেশরক্ষার ক্ষেত্রে তত বেশী লাভ বা নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর অবয়ব কি কনভেনশনাল হবে, না-কি সিটিজেন আর্মি হবে?

মে. জে. (অব.) (সামাদ : কনভেনশনাল আর্মির ধারণা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে। ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রে অনেক জাতিকে আনকনভেনশনাল ধাঁচের যুদ্ধ শুরু করে শেষ পর্যন্ত তাকে কনভেনশনাল সেটআপে নিয়ে এসে যুদ্ধ জয় করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সুতরাং কনভেনশনাল আর্মি কনসেপ্ট থাকতেই হবে। আমাদের দেশের ১২ কোটি জনতাকে বাদ দিয়ে যুদ্ধ করা যাবে না সত্য, তবে আমাদের কনসেপ্ট হবে It will be a Peloples Army with a conventional hardcore nucleus. অর্থাৎ আমাদের এখানে একটা পিপলস আর্মি গঠিত হবে, যার নিউক্লিয়াস হিসেবে থাকবে একটি সুসংগঠিত কনভেনশনাল আর্মি। অর্থাৎ একটি কনভেনশনাল আর্মির পাশাপাশি প্রতিরক্ষায় আমাদের জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়াতে হবে। তবে এটা কিন্তু গণবাহিনী নয়। বরং প্রতিরক্ষায় জনগণ কিভাবে অংশগ্রহণ করবে, সেটাই আমাদের ঠিক করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধেও প্রথমে আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্ট অংশ নিয়েছে, তারপর তারা নিউক্লিয়াস হিসেবে জনগণকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আনকনভেনশনাল যুদ্ধ হলেও শেষদিকে কিন্তু এস ফোর্স, জেড ফোর্স, কে ফোর্স গঠনের মাধ্যমে আবার কনভেনশনাল ফর্মেই ফিরে যেতে হয়েছে। মোট কথা, আমরা জনগণের সমষ্টিগত সম্পৃক্ততার মধ্যদিয়ে কনভেনশনাল কনসেপ্টে কিভাবে লড়ব, তাই ঠিক করতে হবে। জে. জিয়ার সময় যে মহড়া হয়েছিল তা এ থিওরীকে মাথায় রেখেই করা হয়েছে। এখানে আবার জনগণের পাশাপাশি আনসার, ভিডিপির মতো প্যারা মিলিশিয়ারাও কিন্তু একটা বড় শক্তি হিসেবে থাকতে পারে। (ইনকিলাব, ১৮.০৫.২০০০)

ভারতের মতো আগ্রাসী প্রতিবেশীর বিপরীতে এমন একটি শক্তিশালী বাহিনী চাই যা আগ্রাসন ও আভ্যন্তরীন গোলযোগ থেকে আমাদের রক্ষা করবে

মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান, এমপি
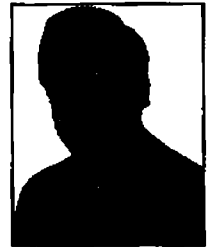
বাংলাদেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যারা কখনোই তাদের পেশাগত বা নিজস্ব গন্ডির মধ্যে ভিন্ন কারো মতামত গ্রহণে ইচ্ছুক নন, তাদের পক্ষে প্রতিরক্ষাবাহিনীর স্বরূপ ও এর বাজেট নিয়ে মহাজ্ঞানীর মতো হৈ চৈ করা কখনো শোভনীয় হতে পারে না। সাহিত্যের ছাত্র হয়ে কি কেউ একজন জেনারেলের চেয়ে ওয়ার প্ল্যানিং বেশী বোঝেন? অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন বিএনপি দলীয় এমপি ও

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি, বাজেট ও সশস্ত্রবাহিনীর স্বরূপ কি হবে- এ নিয়ে দৈনিক ইনকিলাব প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে তিনি জানান যে, বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী, প্রফেশন্যাল কনভেনশনাল সশস্ত্রবাহিনীর কোন বিকল্প নেই। তাঁর মতে, যথাশীঘ্র বাংলাদেশে একটি লিখিত ও সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করতে হবে যা এ যাবৎ রাজনীতিবিদদের দুর্বলতার জন্য আমলাচক্র প্রণয়ন করতে দেয়নি।

এখানে তাঁর সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ কি রকম হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান ঃ এক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে যে, অন্য কোন দেশেই আগ্রাসন চালানোর চিন্তা-ভাবনা আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাই বলে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমরা প্রস্তুত হবো না তা নয়। বরং আমাদের একটি শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী থাকতে হবে। তবে আমাদের প্রতিরক্ষা মতবাদ হবে রক্ষণাত্মক। কারণ, আমাদের কোন আক্রমণাত্মক উচ্চাশা বা এ ধরনের চিন্তার কোন অবকাশ নেই এবং আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতেও সহাবস্থানের কথা বলা আছে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা ও ভূমি রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী ডিফেন্সিভ সশস্ত্রবাহিনীর কোন বিকল্প থাকতে পারে না এবং এ জন্য যতোটুকু করা দরকার তা করতে হবে। এটা অবশ্যই হতে হবে অত্যন্ত পেশাভিত্তিক, যেখানে নেতৃত্বের গুণাবলীর প্রকাশ থাকবে এবং যারা কখনোই রাজনীতিতে জড়াবে না। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, তাহলো পৃথিবীর সবদেশেই পররাষ্ট্রনীতি ও ডিফেন্স ডকট্রিন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাধারণত যতক্ষণ কূটনৈতিক শক্তি দিয়ে লড়া যায় ততক্ষণ সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে কূটনীতিতে পরাজিত হলে স্বভাবতই সামরিক শক্তির শরণাপন্ন হতে হয়। আরও মনে রাখতে হবে, সামরিক শক্তি নিঃসন্দেহে কূটনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করে। এবারে দেখা যাক শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করে সামরিক মতবাদ প্রণয়নে আমাদের অবস্থান কি হবে? শুধু যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রই আমাদের সাথে শত্রুতা করবে তা নয়। তবে এটা সত্য যে, শত্রুতার সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনা থাকে প্রতিবেশীর সাথে। কারণ, পাশাপাশি থাকতে হলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে টানাপড়েন হয়। কাজেই সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিবেশীর সাথে যতোই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকুক না কেন বৈরিতা বা যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিবেশীর পক্ষ থেকেই বেশী। তাই প্রতিবেশীর সামরিক ক্ষমতা ও নীতি নির্ধারণের দিকে খেয়াল রেখে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে তারা যদি তুলনামূলকভাবে বেশী শক্তিশালী হয়ে যায় আর আমরা বেশী দুর্বল হয়ে যাই তা হলে আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিভিন্ন কারণে বিপন্ন হবে। কারণ, দুর্বল হলে প্রতিবেশীর কাছে সাহায্য চাইতে হতে পারে, যেমন হয়েছিল শ্রীলংকাকে। এতে শ্রীলংকার অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল? বিশ্ববাসী তা দেখেছে। আমরা চাই না, আমাদের

অবস্থা শ্রীলংকার মতো হোক। সার্বিকভাবে আমি বলতে চাই, আমাদের প্রতিরক্ষা মতবাদ হবে শক্তিশালী রক্ষণাত্মক অবকাঠামো গড়ে তোলা।

প্রশ্ন ঃ একটি দেশে লিখিত কোন প্রতিরক্ষা থাকার দরকার আছে কি-না? যদি থাকে তা হলে বাংলাদেশে তা এতদিন হয়নি কেন?

মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান ঃ বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নীতি নেই। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়েছে এডহক ভিত্তিতে ১৯৭২ সাল থেকে। তারপর আজ পর্যন্ত এর কি রূপ হবে, অবয়ব কি হবে, কি উদ্দেশ্যে হবে, ক্ষমতার সীমারেখা কতটুকু হবে, এসব বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি এ নিয়ে বেশ জোরালোভাবে বলা হচ্ছে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, রাষ্ট্রের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ন্যায় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও একটি সুনির্দিষ্ট নীতি থাকা উচিত। এ নীতি আবার প্রকাশ্য থাকাই ভাল। তবে এটা প্রকাশ্য ততোটুকুই হবে, যেটুকুতে আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না। যেমন- সামরিক নীতি কি হবে? আমরা যদি একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠন করতে চাই এতে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয় তাতে কিছু যায় আসে না। তাই এটা গোপন কিছু নয়। কিন্তু আমরা কোন্ জায়গায় কত সৈন্য মোতায়েন করব, কতটা গুলি করার অনুমতি দিব, মিসাইল ল্যাঞ্চ করবো কখন কিভাবে, তার কোড ওয়ার্ড কি হবে- সেগুলো ওপেন থাকতে পারে না। অপারেশনাল প্ল্যান, যুদ্ধনীতি বা কৌশল গোপন হতে পারে, কিন্তু আক্রান্ত হলে আমরা যে যুদ্ধে যাব এটা তো গোপন কোন ব্যাপার নয়। কাজেই আমি মনে করি, যেহেতু দেশের গরীব মানুষের কষ্টে অর্জিত ট্যাক্সের টাকায় সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে আমাদের জনগণকে রক্ষা করার জন্য, তাই সেখানে রাখঢাক না রেখে একটি সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরী করা উচিত যার উপর ভিত্তি করে সশস্ত্র বাহিনী এগিয়ে যাবে। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, কোন নির্দিষ্ট নীতি না থাকার ফলেই কিন্তু এযাবৎ সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনৈতিক ইস্যুতে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, পলিসি না থাকলে একে যে যেদিকে পারে সুযোগ বুঝে ব্যবহার করতে পারে। যেমন- প্রতিটি সরকারই মনে করেছে তারা সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ওয়েলফেয়ার খাতে কিছু করতে পারলে খুশী হয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা তাদের পক্ষে থাকবে যা এক সময় সশস্ত্র বাহিনীকে ঐ সব রাজনৈতিক দলের হাতিয়ারেও পরিণত করতে পারে। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট পলিসি থাকে, কর্তব্যের সীমারেখা থাকে তা হলে এটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

এবার দেখা যাক এতদিন যাবৎ বাংলাদেশে কেন কোন প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়নি? এ প্রসঙ্গে আমার কথায় অনেকে হয় তো নাখোশ হতে পারেন। কিন্তু তারপরও বলছি, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত রাজনীতিবিদরা পরিপূর্ণরূপে ক্ষমতায় আসতে পারেননি। বরং ক্ষমতায় থাকাকালীন তাদের সব সময় নির্ভর করতে হয়েছে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের উপরে। আমলারা কখনও চায় না তাদের কার্যপরিধি কি হবে তা কেউ বলে দিক। কারণ তাকে যদি কেউ তা বলে দেয় তা হলে তাকে তার নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে

থাকতে হবে। তাই প্রথম থেকেই এই আমলা শ্রেণী রাজনৈতিক শক্তিকে সাপ্রেস করার চেষ্টা চালিয়েছে এবং রাজনীতিবিদদের বুঝতে দেয়নি যে, এটা তাদের দায়িত্ব। পাশাপাশি রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার কারণেও সামরিক ও বেসামরিক আমলারা দেশের কর্ণধার হিসেবে নিজেদের জাহির করার অপচেষ্টা করেছে। এখনও দেখা যায়, একজন জনপ্রতিনিধির চেয়ে যে 'কোন আমলার ক্ষমতার দাপট অনেক বেশী। তাই রাজনীতিবিদরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি নীতিমালা প্রণয়নে এগিয়ে আসবেন ততই মঙ্গল।

প্রশ্ন ঃ আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত তার প্রতিরক্ষা বাজেট শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি করেছে। এই আলোকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাজেট কি বাড়ানো না কমানো উচিত?

মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান ঃ এখানে বাড়ানো বা কমানোর প্রশ্নে আমি অর্থ বা সংখ্যার দিকে যাব না। বরং আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এ গরীব দেশে প্রতিরক্ষা খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে তা সঠিকভাবে, দুর্নীতিমুক্তভাবে এ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ব্যবহার করা হচ্ছে কি-না। অতিসম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমাদের এখানে প্রতিরক্ষা বাজেটের একটা বড় অংশ ব্যয় করা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন তৈরী ও সেনা সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য, সমরশক্তি বাড়ানোর জন্য নয়। সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, এটা ঠিক। কিন্তু প্রথমে সমরশক্তি, অস্ত্রশস্ত্র বাড়াতে হবে তারপর আসবে অন্যান্য এ্যামেনিটির প্রসঙ্গ। এখন আমরা কিনছি এয়ারকন্ডিশন্ড পাজেরো জীপ, তৈরী করছি ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল অফিস, বাসা। এগুলো কি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ? এরপর সমরাস্ত্র কেনার ক্ষেত্রেও করা হচ্ছে অনিয়ম। আমার মত হচ্ছে, বাজেটে যে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তা দিয়ে প্রথমে সামরিক অবকাঠামো সুসংহত করে যে অর্থ বাঁচবে তা দিয়ে অন্যান্য কাজ করাতে হবে। এখানে যদি সামরিক প্রয়োজন মেটানোর পর এ্যামেনিটির জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হয় তা হলে তখন অবশ্যই সে অর্থের সংস্থান করতে হবে এবং এতে কারও কোন আপত্তি থাকার কথা নয়।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই বলে থাকেন, আমরা বিশাল ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভারতের রয়েছে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সেনাবাহিনী। সুতরাং ভারতের সাথে আমাদের যুদ্ধ করার প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমাদের একটা ছোট সেনাবাহিনী থাকতে হবে, যে বাহিনী মূলতঃ জাতীয় দুর্যোগকালীন সময়ে ভূমিকা পালন করবে। এমনকি কেউ কেউ এমনও বলে থাকেন যে, আমাদের মত দেশে সেনাবাহিনী থাকারই দরকার নেই। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান ঃ আমার কথা খুব পরিষ্কার যে, দুর্যোগকালীন আর্মি কোন আর্মি নয়। কারণ, এটা বলার অর্থ হলো এ সূত্র ধরেই হয় তো একসময় বলা হবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিভিল খাতেই হতে পারে, তাই কোন আর্মিরও দরকার নেই। এটা

হলো সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের একটা অংশ। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতের মতো আগ্রাসী প্রতিবেশীর বিপরীতে আমাদের চাই এমনি একটি কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা এদেশকে বাইরের আগ্রাসন, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতে পারবে। একটি অত্যন্ত দক্ষ, শক্তিশালী, পেশাভিত্তিক সশস্ত্রবাহিনীর কোন বিকল্প থাকতে পারে না এবং এ জন্য যত অর্থ ব্যয় করা দরকার তা অবশ্যই আমাদের করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী কি কনভেনশনাল না সিটিজেন আর্মি হওয়া উচিত?

মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান ঃ জানি না, কিভাবে বাংলাদেশের মানুষ সিটিজেন আর্মির কথা কল্পনা করে। ১৩ কোটি লোকের দেশে সিটিজেন আর্মি? এতগুলো লোককে অস্ত্র, ট্যাকটিকস, স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে ট্রেনিং দেয়ার মতো অর্থ, সামর্থ্য তো আমাদের নেই। কি করে কথিত বুদ্ধিজীবীরা এটা আশা করে? এটা উর্বর মস্তিস্কের উর্বর চিন্তা বৈ কিছুই নয়। এদেশের বাহিনী হবে অত্যন্ত দক্ষ, কনভেনশনাল আর্মি, যাদের শৃংখলা, নিয়ম, রীতি হবে কঠিন, কঠোর। না হলে রাজনীতিতে ব্যবহৃত হবে। সিটিজেন আর্মিতেও তারা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাই আমি আবারো বলছি যে, আমাদের সশস্ত্রবাহিনী হবে কনভেনশনাল। অবশ্য এদের উপর রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এক্ষেত্রে যারা বিভিন্ন উদ্ভট থিউরি দিয়ে আসছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই- বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পড়ানো হবে, তাদের অধ্যাদেশে কি থাকবে এসব নির্ধারণে তো বুদ্ধিজীবীরা অন্য পেশার কাউকে এমনকি জনপ্রতিনিধিদেরও ডাকেন না। এমন একটা ভাব দেখান যে, একমাত্র তারাই ঐ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। তা হলে তারা কিভাবে সমরনেতা বা বিশেষজ্ঞ না হয়ে সামরিক বাহিনী নিয়ে এতো মাথা ঘামান? সামরিক বাহিনীর অফিসাররা তাদের প্রফেশনের ক্ষেত্রে প্রচুর লেখাপড়া করেই সামরিক বিষয়ে মতামত রাখতে পারেন। সাহিত্যের ছাত্র হয়ে কি কেউ একজন জেনারেলের চেয়ে ওয়্যার প্ল্যানিং ভাল বুঝবেন? তাই এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নয়-আমাদের চাই শক্তিশালী কনভেশনাল সশস্ত্র বাহিনী।

(দৈনিক ইনকিলাব, ২৭-০৪-২০০০)

প্রতিরক্ষা নীতি ঠিক করা যেতে পারে পররাষ্ট্রনীতির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে

সুপ্রশিক্ষিত কনভেনশনাল আর্মির বিকল্প নেই, তবে একে নিউক্লিয়াস ধরে সিটিজেন আর্মি গড়ে তুলতে হবে

ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেছেন, ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে তীব্র বঞ্চনাবোধ রয়েছে যা এক সময় ছিল

হিটলারের জার্মানীতে। নাৎসী জার্মানীর নীতি নির্ধারকগণ মনে করতেন পৃথিবী তাদের বঞ্চিত করেছে। কেঁড়ে নিয়েছে অধিকার। অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চল জার্মানীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও কুচক্রীদের চক্রান্তে এখন মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। বঞ্চিত হয়েছি-এ ধারণা থেকেই এক সময় হিটলার পররাজ্য গ্রাসে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতীয় শাসকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী এমনকি সাধারণ জনগণও মনে করেন তারা বঞ্চিত হয়েছেন। তাদের দেশ ভাগ হয়ে গেছে। আরো বড় ভূ-খণ্ডের অধিকারী হওয়ার কথা ছিল তাদের। এজন্যই ভারতীয়রা এখন 'অখণ্ড ভারতের' স্বপ্ন দেখে। এবং এ ধরনের নেতিবাচক ধারণা থেকেই তারা একসময় বাংলাদেশ এমনকি পাকিস্তান দখল করে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাই ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামানের মতে, যারা ভারতকে অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করে কোন আক্রমনের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন তারা আসলে বাস্তববাদী নন।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মত্যবদ বা নীতি কিরূপ হওয়া উচিত -এব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষানীতি হবে অবশ্যই রক্ষণাত্মক যাতে সুনির্দিষ্টভাবে আমরা আমাদের রক্ষা করতে সমর্থ হই। তবে রক্ষণাত্মক প্রতিরক্ষানীতি নির্ধারণ করা হলেও আমাদের সর্বপ্রথম জানতে হবে কে শত্রু কে মিত্র। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কোন স্থায়ী শত্রু মিত্র নেই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাই হয়তো ১৯৭১ সালের বিচারে ভারত সহায়তাকারী; কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সেই চির সত্যটাকেই যেন মানতে হয়। এক্ষেত্রে ভারতের দিক থেকে কেন বৈরীতার সম্ভাবনা রয়েছে সে প্রশ্নে ডঃ মনিরুজ্জামান বলেন, ভারতের দিক থেকে ভয় নেই তা মোটেও সত্য নয়। বরং এমনও হতে পারে যে একদিন সত্যিসত্যিই ভারত আমাদের গ্রাস করে ফেলার উদ্যোগ নিবে। হয়তো সেখানে নির্বাচন হচ্ছে তখন বিজেপি মনে করলো বিজয়ের জন্য বাংলাদেশ বা এর একটি অংশ দখল করা দরকার। ভাবলো বাংলাদেশ দখল করলে হিরো হয়ে যাবো। এক সময় তদানীন্তন পাক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে বোঝানো হয়েছিল কাশ্মীর দখল করলে কায়েদে আযম-এর চেয়ে বড় হয়ে যাবেন। চিরদিন প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবেন। আইয়ুব একজন মডারেট জেনারেল হওয়ার পরও ভুট্টো তাকে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। এমনটা ভারতের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। তাই দেখা যায় নির্বাচন ঘনিয়ে এলেই ভারত পাকিস্তান, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন খেলায় মেতে উঠে। আর যুদ্ধ সবসময় পৃথিবীতে থাকবেই। তাই বিশ্বায়নের এই যুগেও দেখা যায় বসনিয়া, চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, কাশ্মীরে যুদ্ধ হচ্ছে। হিউম্যান নেচারই তাই। এজন্য ধরে নিতে হবে একজন না একজন শত্রু বা বৈরী শক্তি থাকবেই। এবং নিঃসন্দেহে আমাদের প্রধানতম বৈরী শক্তি হচ্ছে ভারত। যদি আঘাত আসে ভারতের দিক থেকেই আসবে। তাই ডঃ মনিরুজ্জামানের মতে, আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি হবে-কিভাবে ভারতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়-এর আলোকে। তিনি ভারতকে অবশ্যম্ভাবী প্রধান ও প্রথম বৈরী হিসেবে চিহ্নিত করে আরো বলেন, যুদ্ধ

যেহেতু অনেক সময় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে সহায়ক হয় সে কারণেও অসংখ্য জাতি ও জাত পাতের দেশ ভারত ক্ষুদ্র দেশ দখলের স্বপ্ন দেখতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী যে একসময় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন তাও ঐ ১৯৭১ সালে জয়ের কারণে।

এছাড়া Temptation তো সবসময়ই থাকে। তাই সবসময় নিজেকে রক্ষার প্রস্তুতি যেমন আমাদের থাকতে হবে তেমনি কে আমাদের আক্রমণ করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং এগুলো বিবেচনাতে নিয়েই তৈরী হবে প্রতিরক্ষানীতি।

ভারতের দুরভিসন্ধী সম্পর্কে ডঃ মনিরুজ্জমানের মতামত সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, অনেকেই মত দেন-ভারতের সাথে বন্ধুত্ব করো। তাহলে ভারত আমাদের কখনোই কিছু করবে না। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ এর উল্টো। কারণ প্রথমেই বলতে হয় ভারতের যে বিহেভিয়ার তা কিন্তু আগ্রাসী। তারা গোয়া, দমন, ছিউ, হায়দরাবাদ, সিকিম গায়ের জোরে দখল করেছে। এখন ভারতের সকল পার্টিরই এই একই দর্শন। তারা কাশ্মীরকে ছাড়তে চায় না। বাংলাদেশ তো বটেই পাকিস্তানকেও দখল করতে চায়। কারণ ভারতীয় এলিটদের মধ্যে না পাওয়ার বেদনা বা Sense of Deprivation রয়েছে যা একসময় জার্মানীর হিটলারের মধ্যে ছিল। তা এরা মনে করে ভারত ভাগ হয়ে গেছে। তাদের আরো বড় সাম্রাজ্য থাকা উচিত ছিল। ডঃ তালুকদারের মতে, এটা আপাতঃদৃষ্টিতে কঠিন ভারত বিরোধী কথা। কিন্তু তিনি মনে করন যারা যুদ্ধ নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তারা এ ব্যাপারে দ্বিতম পোষণ করতে পারবেন না। বরং তারা একমত হবেন যে, ভারতীয় নীতি নির্ধারকগণ বৈদিক রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন দেখে আসছে। তিনি উল্লেখ করেন, চিরদিন হিন্দুরা পরাজিত হয়ে আসছে এই হতাশ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই ভারত আজ পাগলের মতো দুনিয়াকে দেখাবার লক্ষ্যে সমরশক্তি বাড়িয়ে চলেছে, পারমানবিক বোমা ফাটাচ্ছে, প্রতিরক্ষা ব্যয়ও বল্গাইহীনভাবে বাড়াচ্ছে। কিন্তু তার আশঙ্কা এসবের After Effect-এ ভারত ভেঙ্গেও যেতে পারে। তবে এর সম্ভাবনা কম। কারণ, হান্টিংটন-এর সভ্যতার সংকট থিয়োরী অনুযায়ী হিন্দু সভ্যতা ভারতকে এক রেখেছে। ভাষার বৈচিত্রের পরও পৃথিবীতে একমাত্র ভারতে হিন্দু কনসেনট্রেশন বেশী হওয়ায় ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদকে আকড়ে ধরেই টিকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডঃ মনিরুজ্জামান ভারতীয় রাজনীতিবিদ এমনকি সাধারণ জনগণের মানসিকতা সম্পর্কে বলেন, ভারতীয়দের মনে সব সময় এটা কাজ করে যে, সেই সময়খন্দ, ইরান থেকে মুসলমান গুন্ডারা এসে আমাদের শাসন করেছে। এমনকি নেহরুর মধ্যেও এই মানসিকতা ছিল। তিনি তাই আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীকে চিঠি দিয়ে বলেছিলেন-আপনি পার্টিশন মানলেন কেন? এটা তো টেম্পোরারী। এই পার্টিশন টিকবে না। সাধারণ ভারতীয় জনগণও বলে-বাংলাদেশ তাদের Creation, তারা ১৬ ডিসেম্বরকে Victory Day of India হিসাবে পালন করে। জে. জ্যোকব তার বইতে পর্যন্ত বলেছেন-আমরা যুদ্ধ করে বাংলাদেশ বানিয়েছি। আজ সেই দেশ আমাদের সাথে মোনোফেক্কী করছে।

এই যে আ'লীগ এতো বন্ধুত্ব দেখাচ্ছে, সেই তাদেরও তো ভারত কোন ছাড় দিচ্ছে না। এমনকি ট্রানজিটের আড়ালে করিডর চাচ্ছে NEFA তে সৈন্য নিয়ে যাবার জন্য এবং চীনের সাথে যদি ভারতের যুদ্ধ হয় তাহলে চুক্তি থাক আর না থাক তারা বাংলাদেশের উপর দিয়ে সৈন্য নিবেই। অথচ ডঃ মনিরুজ্জামান মনে করেন বাংলাদেশ চীন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব করে ভারতকে বিপদে ফেলতে পারে। তার মতে, পররাষ্ট্র নীতি এমনভাবে করতে হবে যাতে চীন-মার্কিনের সাথে বন্ধুত্ব করা যায়। এ ব্যাপারে তিনি জাপানের উদাহরণ টেনে বলেন, জাপানে যুক্তরাষ্ট্র পারমানবিক বোমা ফেলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তারা জাপানের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়ায় একদিকে জাপান যেমন সোভিয়েত বৈরীতা থেকে নিরাপদ থেকেছে তেমনি Nation Building-এর দিকে নজর দিতে পেরেছে। এখন তারা এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ইচ্ছে হলে পারমানবিক বোমা বানাতে পারে। ডঃ মনিরুজ্জামান বলেন, এই যে ছত্রছায়া সেটা পররাষ্ট্র নীতি দিয়ে নিশ্চিত করতে হয়। তিনি উল্লেখ করেন, অস্থিতিশীলতা থাকলে বিদেশী হস্তক্ষেপের পথ সুগম হয়। ভারত সে কারণেই এদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখতে চায়। প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে তার অভিমত হচ্ছে-আমাদের প্রতিরক্ষা নীতি ঠিক করা যেতে পারে পররাষ্ট্র নীতির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে শত্রুর শত্রু যেমন চীন বা মার্কিনের সাথে বন্ধুত্বের মাধ্যমে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এমনকি তারা যদি বঙ্গপোসগরে নৌ বিমান ঘাটি বানাতে চায় তাহলে সেই সুযোগও তাদের দিতে হবে। অবশ্য তিনি এও বলেন যে, পররাষ্ট্র নীতি বা কুটনীতি সবসময় যে রিলায়েবল হবে তা নয়। বরং যে কোন সময় তা Betray করতে পারে। এজন্যই আমাদের নিজস্ব আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স থাকতে হবে এবং যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রস্তুতিও থাকতে হবে।

সশস্ত্রবাহিনীর [illegible] সম্পর্কে তার মত হচ্ছে, একটি সুপ্রশিক্ষিত কনভেনশনাল আর্মির কোন বিকল্প নেই এবং একে নিউক্লিয়াস করে ধীরে ধীরে সকল সক্ষম নাগরিককে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে সিটিজেন আর্মি। এখানে কনভেনশনাল আর্মি হবে First Line of Defence এবং সিটিজেন আর্মি হবে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করার মোক্ষম মাধ্যম। এ ব্যাপারে তিনি পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর উদাহরণ দিয়ে বলেন-ভুট্টো ভারতের মত বিশাল শত্রুকে পরাস্ত করতে প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র দেয়ার কথা বলেছিলেন। তার মতে, বাংলাদেশেও তাই করতে হবে। কৃষকের হাতে লাঙ্গলের পাশাপাশি দিতে হবে বন্দুক। তাহলে ঘড়ে ঘড়ে থাকবে প্রশিক্ষিত যোদ্ধা যারা ডিসিপ্লিনড হয়ে গড়ে উঠবেন। এজন্য পশ্চিমা দেশগুলোয় এক পর্যায়ে সকল সক্ষম নাগরিকের জন্য সামারিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এমনকি ইসরাইলে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'কে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করে, পরীক্ষা দিয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদমর্যাদা অর্জন করতে হয়। ড. মনিরুজ্জামান মনে করেন বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও জনসংখ্যা, ভু-রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় সম্ভাব্য শত্রু'র সাথে সমকক্ষতা অর্জন অসম্ভব এবং অপ্রয়োজনীয় হলেও ক্ষমতার ভারসাম্যতা

যেভাবেই হোক রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে কনভেনশনাল ও সিটিজেন আর্মি'র সংমিশ্রন হোক বা যে কোন কৌশলেই হোক তা বজায় রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। তবে তার মত হচ্ছে প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় যেন আরাম, আয়েশ, বিলাস ব্যসনের জন্য না হয়। ইউরোপীয় ষ্ট্যান্ডার্ড, প্রথা অনুসরণ করা অপ্রয়োজনীয় বলেই ড. মনিরুজ্জামান মনে করেন। তার কথা হচ্ছে আক্ষরিক অর্থেই দেশপ্রেমিক, উদ্যোগী সৈনিক তৈরী করতে হবে। এদের দিতে হবে প্রয়োজনীয় অস্ত্র। এছাড়া তাদের সামনে Cause তৈরী করতে হবে। কারণ একটা শত্রু থাকা ভাল। এটা জাতীয়তাবোধ তৈরী করে এবং তার মতে War is a big factor in national integration. তবে এর অর্থ উগ্র জাতীয়তাবাদ বা আগ্রাসী মনোভাব প্রকাশ নয়। বরং জাতীয় অহংবোধ জাগিয়ে তোলা।

এদিকে যারা সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন তাদের ড. মনিরুজ্জামান অবাস্তববাদী হিসাবে চিহ্নিত করে বলেছেন-এরা স্বপ্নবাদী। ছোট দেশ হলেই যে সেনা বাহিনী ছাড়া থাকতে হবে বা অস্তিত্ব বজায় রাখা যাবে না তা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। এক্ষেত্রে তিনি ফিনল্যান্ডের উদাহরণ উপস্থাপন করে বলেন-ষ্ট্যালিন শত চেষ্টা করেও সে দেশ কব্জা করতে পারেননি। আর কিউবা, তাইওয়ানের উদাহরণ তো আছেই। তিনি আরো বলেন-বিশ্বে হয়তো আনবিক যুদ্ধ না হতে পারে কিন্তু যুদ্ধ হবেই এটা কোনভাবেই এড়ানো যাবে না। এবং এ কারণেই প্রস্তুতি থাকতেই হবে তা যে উপায়ে বা কৌশলেই হোক না কেন।

(২০০০ সালে প্রদত্ত সাক্ষাতকার)

বাংলাদেশের জন্য একটি যুগোপযোগী প্রতিরক্ষানীতির প্রয়োজন রয়েছে

মেজর জেনারেল (অব.) ইমাম-উজ-জামান, বীর বিক্রম, পিএসসি

ভারতীয় সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রেক্ষাপটে, সংগত কারণেই তখন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সঠিক বিকাশ ঘটেনি। ১৯৭২-'৭৫ সময়কালে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে কেবল নামমাত্র স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছিল। শেখ মুজিব কোনো দিনই চাননি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী একটি শক্তিশালী ও কার্যক্ষম সমরশক্তি হিসেবে গড়ে উঠুক। তিনি বাংলাদেশকে 'Switzerland of the East' বানাতে চেয়েছিলেন। প্রায় দুই লক্ষ সুশিক্ষিত মুক্তিবাহিনীকে বিলুপ্ত করে দিয়ে তিনি মাত্র ৫টি ব্রিগেড নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করেন, যার সেনাপ্রধান ছিলেন একজন কর্নেল পদবীর অফিসার। নৌবাহিনীতে কয়েকটি পরিত্যক্ত গানবোট এবং বিমান বাহিনীতে গোটাকয়েক হেলিকপ্টার ছাড়া কিছুই ছিল না। ১৯৭৩-'৭৪ সালে পাকিস্তান

থেকে অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ সেনাসদস্য প্রত্যাবর্তন করলে তাদের অনেককেই চাকরিচ্যুত করা হয় এবং পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত করা হয়। পক্ষান্তরে, তৎকালীন সরকার 'রক্ষীবাহিনী' নামে একটি সমান্তরাল বাহিনী গঠন করে যার কর্মপরিধি ছিল অত্যন্ত রহস্যজনক। এছাড়াও সেই আমলে সেনাসদস্যদের জনসমক্ষে হেয়প্রতিপন্ন করা হতো। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তৎকালীন সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণেই, তখনকার শাসকরা বাংলাদেশের জন্য কোনো প্রতিরক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

১৯৭৫-এর পটপরিবর্তনের পরই সরকার বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে সঠিক মূল্যায়ন করে। সশস্ত্র বাহিনী ফিরে পায় তার হারানো গৌরব ও মর্যাদা। জেনারেল জিয়া বাংলাদেশের জন্য একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী এবং উপযুক্ত প্রতিরক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর প্রতিরক্ষা বাহিনী ছিল আবশ্যক। বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করতে হলে তার সমর্থনে থাকতে হবে একটি দক্ষ ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী। সেই উদ্দেশ্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া সেনাবাহিনীতে ব্যাপক সংস্কার আনার পদক্ষেপ নেন। তারই উদ্যোগে ৫টি ব্রিগেড সম্প্রসারিত হয় ৫টি পরিপূর্ণ ডিভিশনে। সেনাবাহিনীর যান্ত্রিক বহরে সংযোজিত হয় আধুনিক ট্যাঙ্ক, কামান ও মিসাইল। নৌবাহিনীতে যোগ দেয় ৪টি ফ্রিগেট, টরপেডো বোট, মিসাইলবোট, মাইন সুইপার এবং সাবমেরিন চেজার। বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয় মিগ-১৯ জঙ্গি বিমান, পরিবহণ বিমান, এম আই-৮ হেলিকপ্টার এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জামাদি। ১৯৭৭ সালে সেনাবাহিনীর জন্য সুদূরপ্রসারী একটি রণনীতি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮০ সালে তিন বাহিনীর সমন্বয়ে একটি জাতীয়ভিত্তিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয় যার মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অনুশীলন করা হয়। এতেই প্রতীয়মান হয় তৎকালীন সরকারের প্রতিরক্ষাবাহিনীকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার সদিচ্ছা।

দুঃখজনক হলেও এটা সত্য, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সশস্ত্র বাহিনীকে তার মূল দায়িত্ব থেকে লক্ষ্যচ্যুত করে দেশ শাসনে জড়িত করে ফেলেন। নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীকে তার পেশা বহির্ভূত কাজে লিপ্ত করান। ফলে প্রতিরক্ষা বাহিনীর উন্নয়নের ধারা বিঘ্নিত হয়ে যায়। দেশ রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব থেকে সেনা সদস্যরা লাইনচ্যুত হয়ে গিয়ে লিপ্ত হন দুর্নীতি ও ব্যক্তিস্বার্থে। সুতরাং, প্রতিরক্ষা নীতিকে সুসজ্জিত করা এবং শক্তিশালী করার কোন সুযোগ তখন দেয়া হয়নি। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দীর্ঘ নয় বছরের শাসন আমলে কেবলমাত্র একটি ডিভিশন গঠিত হয় এবং তা স্থাপিত হয় তারই এলাকা রংপুরে।

যা হোক, ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার অসমাপ্ত কাজ পূরণ করার দায়িত্ব নেয় সরকার। ১৯৯১ সালেই বাংলাদেশের

সপ্তম ডিভিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহে। এছাড়াও বেগম খালেদা জিয়ার দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার দ্বারা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে একটি নতুন গতি ও কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী রূপান্তরিত হয় অত্যাধুনিক, পেশাগত এবং দক্ষ বাহিনী হিসেবে। ১৯৯১-'৯৬ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে শুধু সরঞ্জামাদিই বৃদ্ধি পায়নি, সেই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে সেনাসদস্যদের মধ্যে দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মানবিক মূল্যবোধ। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একের পর এক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইউনিটসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জাতিসংঘ মিশনে দায়িত্ব পালন করে এবং উপযুক্ত সুনাম অর্জন করে। আজকে বাংলাদেশ জাতিসংঘে সর্ববৃহৎ শান্তিরক্ষাবাহিনী অবদানকারী দেশ।

অতি পরিতাপের বিষয় যে, ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উপর নেমে আসে ঘন অন্ধকার। অতীতের রেশ মেটাতে গিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে করা হয় দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও রাজনীতিকীকরণ। একদিকে সেনাবাহিনীর অদক্ষ, অশিক্ষিত এবং অথর্ব অফিসারদের রাতারাতি পদোন্নতি দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করা হয়, অন্যদিকে কোনো কারণ ছাড়া অনেক সৎ, নিষ্ঠাবান এবং কর্মতৎপর অফিসারকে চাকরিচ্যুত করা হয়। শেখ হাসিনা চেইন-অব-কমান্ড উপেক্ষা করে ঘরের চাকর-চাপরাশিদের বুদ্ধিতে প্রতিরক্ষা বাহিনী পরিচালিত করতেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গোপনীয়তা রক্ষার অজুহাতে তিনি প্রতিরক্ষা ক্রয়ের সকল নীতিমালা লঙ্ঘন করে ১,২০০ কোটি টাকা দিয়ে মিগ ও ফ্রিগেট কেনার সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিরক্ষা ক্রয়ে এত[illegible] দুর্নীতির নজির খুবই কম। তাদের ইচ্ছা ছিল দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ [illegible] ক[illegible] নির্বাচনে তারা পার পেয়ে যাবেন। কিন্তু খোদা তায়ালার অশেষ রহম[illegible] তাদের স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হয়নি। যারা সশস্ত্র বাহিনীকে অপব্যবহার করে [illegible]তায় টিকে থাকতে চেয়েছিল, তাদের থেকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন কি আ[illegible]শা করা যায়?

এখন আবার সুসময় এসেছে আমাদের প্রতিরক্ষা [illegible]নীকে নতুনভাবে গড়ে তোলার। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আরো শক্তিশালী বা আ[illegible]কীকরণের পূর্বে আমাদের একটি সঠিক প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। [illegible] প্রতিরক্ষানীতি হতে হবে স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদি এবং তা হতে হবে দেশের স্বা[illegible] বা রাষ্ট্রের স্বার্থে। এত দিন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী যে ধারায় গড়ে উঠেছে [illegible]ং যে রণনীতি অবলম্বন করছে, তা কেবলমাত্র একটি কাল্পনিক ধারণার ওপর। কোনো লিখিত দিক-নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে আমাদের প্রতিরক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। সরকারের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারকদের থেকে সেই দিক-নির্দেশনা আসা দরকার। নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি অথবা প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটি বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়নের দিক-নির্দেশনা দিতে পারে। প্রতিরক্ষানীতি গৃহীত হওয়ার পরই বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেয়া যেতে পারে।

একটি দেশের প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বস্তুত দুটো বিষয় গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হয়। প্রথমত, ঐ দেশের ওপর সামরিক হুমকির সম্ভাবনা, তার প্রকারভেদ ও পরিসর এবং দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্য। একটি দেশের ওপর বহির্শক্তির সামরিক হুমকির সম্ভাবনা নির্ভর করবে ঐ দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর, তার পররাষ্ট্রনীত এবং আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক পরিস্থিতির ওপর। একটি দেশে সামরিক হুমকি তিনটি আয়তনে আসতে পারে-স্থল ভাগে, নৌপথে এবং আকাশসীমা লঙ্ঘন করে। তাই সাধারণত একটি দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী তিনটি নির্দিষ্ট বাহিনীতে বিভক্ত। স্থলপথে সামরিক হুমকি সাধারণত প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ থেকে আশঙ্কা করা যায়। তবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যদি সংশ্লিষ্ট দেশের বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক থাকে এবং একে অপরের প্রতি যদি নির্ভরশীল হয়, তবে সে ক্ষেত্রে হুমকির সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ হচ্ছে ভারত ও মায়ানমার। ভারতের সাথে আমাদের ৪৫৩৫ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের সাথে আমাদের ২১৪ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। আমাদের প্রতিরক্ষানীতির একটি মুখ্য উপাদান হবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে এই আন্তর্জাতিক সীমানা পাহারা দেয়া ও রক্ষা করা। শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্র নয়, যে কোনো বহির্শক্র আমাদের আন্তর্জাতিক সীমানা যাতে লঙ্ঘন না করতে পারে-সেভাবে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে গড়ে তুলতে হবে। মূলত আমাদের মতো একটি শান্তিপ্রিয় দেশের জন্য আত্মরক্ষা বা প্রতিরক্ষামূলক নীতিই অবলম্বন করতে হবে। আমাদের কোনো ধরনের আগ্রাসী বা সম্প্রসারণবাদী প্রতিরক্ষানীতির কথা চিন্তা করা মোটেই উচিত নয়। শুধু স্থল ভাগে নয়, নৌ-পথেও আমাদের জলসীমা যেন কেউ লঙ্ঘন করতে না পারে-সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গভীর সমুদ্রে আমাদের বিপুল সম্পদ রয়েছে। তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের প্রতিরক্ষানীতির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। অনুরূপ আমাদের আকাশসীমা মুক্ত রাখার দায়িত্বও আমাদের প্রতিরক্ষানীতির আরেকটি অঙ্গ। মনে রাখতে হবে, আধুনিক বিশ্বে শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ হতে নয়, নৌপথে বা আকাশপথে দূর-দূরান্ত থেকে যে কোনো অপশক্তি আক্রমণ চালাতে পারে। সুতরাং সেভাবেই আমাদের নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীকে যে কোনো পরিসর থেকে আক্রমণ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।

মূলত একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর ভিত্তি করেই প্রতিরক্ষানীতি রচিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামরিক হুমকি থেকেও বড় ধরনের হুমকি। সুতরাং নীতি-নির্ধারকগণই ঠিক করবেন প্রতিরক্ষা খাতে কত অর্থ বরাদ্দ করা হবে। সরকারের অগ্রাধিকার হিসেবে বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্দ হয়ে থাকে এবং সেই অগ্রাধিকারে প্রতিরক্ষা বাজেট যে পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়, তার ওপরই ভিত্তি করে আমাদের প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই প্রতিরক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য যে আয়তন ও পরিমাপের সশস্ত্র বাহিনী

গড়ে তোলা দরকার, সেভাবেই এগুতে হবে। লোক দেখানো বা কারো সন্তুষ্টির জন্য সশস্ত্র বাহিনী সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন নেই। আয়তনে সশস্ত্র বাহিনীকে বড় করলে অথবা তার সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই তার কার্যক্ষমতা বাড়ে না। একই সঙ্গে পরনির্ভরশীল আধুনিক সমরাস্ত্র দিয়ে শুধু প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সজ্জিত করলেই তার দক্ষতা বাড়ে না। একটি সশস্ত্র বাহিনীর গুণগত মান নির্ভর করে তিনটি উপাদানের ওপর 'Men, Material & Motivaton.' অতীতে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে বহুগুণ লোকবল বৃদ্ধি করা হয়েছে, অনেক আধুনিক ও অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে-কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর যে মূল চালিকাশক্তি 'Motivaton' তার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সুতরাং আমাদের প্রতিরক্ষানীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে সশস্ত্র বাহিনীকে একটি আদর্শবান, পেশাগত দক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ এবং অত্যন্ত আস্থাভাজন শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। প্রত্যেক সেনাসদস্যকে দেশ রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে অটুট থাকতে হবে এবং তার প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজের অঙ্গীকারনামার প্রতিটি অক্ষর তাকে স্মরণ রাখতে হবে-'আমার উপরস্থ কর্মকর্তার আদেশ জীবন বিপন্ন করিয়া হইলেও পালন করিব'। Motivaton-এর পাশাপাশি Men এবং Meterial-এর মধ্যেও একটি ভারসাম্য রাখা উচিত। বাংলাদেশের জন্য কোনো বিশাল সেনাবাহিনীর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না এবং প্রয়োজন মধ্যম পরিসরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অতি উচ্চ মনোবলসম্পন্ন বাহিনী। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এই বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের মধ্যে থাকতে হবে আত্মত্যাগী মনোভাব এবং দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনে তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে আমাদের মতো জনবহুল দেশের জন্য সীমিত সম্পদের মধ্যে যন্ত্রভিত্তিক সশস্ত্র বাহিনীর পরিবর্তে লোকবলভিত্তিক বাহিনী গড়ে তোলাই শ্রেয়। আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় করতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় বৃদ্ধিই হয় না, আমাদের পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বহির্বিশ্ব হতে সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং, আধুনিক সমরাস্ত্রকে সেই পরিস্থিতিতে সচল রাখা দুষ্কর হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, আমরা যদি লোকবলভিত্তিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলি এবং তাদের যদি স্থানীয়ভাবে তৈরি হালকা অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করি, তা হলে দেশ রক্ষার কাজে তারা আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। হিসাব করে দেখা গেছে, একটি ট্যাঙ্ক ক্রয় করতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা দিয়ে ৫০ জন সৈনিককে নিয়োগ দেয়া যায়। বাংলাদেশের মতো নদীমাতৃক দেশে ট্যাঙ্কের কার্যকারিতা খুবই সীমিত। এছাড়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। পরিশেষে, শত্রুর একটি গোলাবর্ষণে ট্যাঙ্কটি সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে, আমরা ঐ অর্থ দিয়ে যদি ৫০ জন সৈনিককে নিয়োগ দেই, তারা রণক্ষেত্রের ৫০টি স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে এবং সবাই একসঙ্গে নির্মূল হয়ে যাবে না। এ ছাড়া ৫০ জন সৈনিককে নিয়োগ দিয়ে শুধু কর্মসংস্থানেরই ব্যবস্থা করা হবে না, বরং দেশে যুবসমাজের জন্য একটি সু-শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলো একটি যুগোপযোগী

প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়নের কয়েকটি বিবেচ্য বিষয়মাত্র। জ্ঞানী-গুণীরা এবং বিশেষজ্ঞমহলই আমাদের দেশের জন্য একটি উপযুক্ত প্রতিরক্ষানীতি রচনা করতে পারেন। [মাসিক এশিয়া ডাইজেস্ট-এর সৌজন্যে]

[নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের মতামত নেয়া হয়েছে দৈনিক প্রথম আলোর ১৪ আগস্ট ২০০০ সংখ্যা থেকে। প্রথম আলো আয়োজিত এক গোলটেবিলে বিশেষজ্ঞগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।]

আমাদের এমন একটি সেনাবাহিনী থাকতে হবে যাতে প্রতিবেশীরা আমাদের সমীহ করে

মেজর জেনারেল (অব.) কে এম সফিউল্লাহ, বীর উত্তম, পিএসসি

আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী এবং প্রতিরক্ষানীতি। এ শিরোনামে আসলে ঘোড়ার আগে গাড়িকে জোতা হয়েছে। সশস্ত্রবাহিনীকে শক্তিশালী করে আমরা প্রতিরক্ষানীতি করব, না-কি নীতি করার পরে সশস্ত্রবাহিনীকে শক্তিশালী করব? সশস্ত্রবাহিনী তো আসবে প্রতিরক্ষানীতির পরে।

আমাদের চিন্তা-ভাবনায় প্রতিরক্ষানীতি অদ্ভুত একটা জিনিস। আর্মিতে থাকতেও শুনেছি, আর্মি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরও শুনছি যে, একে ধরা বা ছোঁয়া যাবে না। কিন্তু প্রতিরক্ষানীতি তো কারো কাছ থেকে গোপন করা উচিত নয়। এটা হবে জনগণের দলিল। এর ওপর ভিত্তি করে যে প্রতিরক্ষা কৌশল নির্ধারিত হবে, সেটা আমরা গোপন রাখতে পারি। নীতিনির্ধারকরাই শুধু সেটা জানবেন।

প্রতিরক্ষানীতির ওপর অনেকেই আজ মূল্যবান কথা বলছেন। প্রতিরক্ষানীতি কেমন হওয়া দরকার তা নিয়েই আমাদের প্রথম কথা বলা উচিত। আমাদের প্রতিরক্ষানীতি আক্রমণাত্মক হলে সেটা অন্য রকম হবে। এই যেমন মিগ-২৯ ক্রয়। এটা কেনার ব্যাপারে আমাদের কারো কিছু করার ছিল না। এর কি আদৌ কোনো দরকার ছিল? বা এটা কি নীতির দ্বারা নির্দেশিত হওয়া উচিত ছিল কি-না। যখন এর সব কিছু স্বাক্ষর হয়ে গেছে তখন আমরা জানতে পেরেছি। ফলে আমরা যখন কমিটিতে আলোচনা করেছি তখন সেগুলো কেনার বিষয়টি আমাদের আওতার বাইরে চলে গেছে। আমরা শুধু দেখছি কেনাটা ঠিকমতো হয়েছে কি-না; তার মধ্যে অবৈধ কিছু আছে কি-না। আমাদের তিনটা বাহিনী আছে; সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী। এদের কিছু গুরুদায়িত্ব দিতে হবে। সেনাবাহিনীর জন্য এ কাজ, নৌবাহিনীর জন্য এ কাজ, বিমানবাহিনীর জন্য এ কাজ-বিষয়গুলো এভাবে নির্ধারণ করে দিতে হবে। এর ওপর ভিত্তি করে কমান্ডারদের বলা

হবে, এই হলো তোমাদের মিশন। এ মিশনের ওপর ভিত্তি করে অর্জন আসবে। মিগ-২৯ কেনার সময় এটা আলোচনা করা দরকার ছিল যে, আমাদের কাজ সফল করতে হলে এটা প্রয়োজন এবং এত দিনে কাজটা আমাদের করতে হবে। সে অনুযায়ী জাতীয় বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হবে। কেনা-কাটা কীভাবে করা হবে, কোত্থেকে টাকা আসবে-সে চিন্তা-ভাবনা তখন আসবে এবং তখন আমাদের সেটা করতে হবে। কারণ বিমানবাহিনীকে দেওয়া কাজটা তখন সম্পন্ন করতে হবে। সেটা ছাড়া আকাশসীমা রক্ষা করা যাবে না।

নৌবাহিনীর কথাও একইভাবে বলা যায়। সব হয়ে যাওয়ার পর আমরা ফ্রিগেটের কথা জানতে পেরেছি। আমরা শুধু দেখেছি সবকিছু ঠিকমতো হয়েছে কি-না। নৌবাহিনীকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে, সমুদ্রে আমাদের অর্থনৈতিক জোন বা স্যাটেলাইটে দেখা বঙ্গোপসাগরের ভূখণ্ড রক্ষা করার জন্য নৌবাহিনীর কী কী প্রয়োজন। হয়তো এই ফ্রিগেটে আমাদের কিছু হবে না। কিন্তু সেটা আলোচনার মাধ্যমে হলে ফ্রিগেটটা ঠিকমতো কেনা হয়েছে কি-না সে প্রশ্ন পত্রিকায় উঠত না। তবে আরেকটা কথা এর মধ্যে এসেছে; আমরা ফ্রিগেট কিনেছি এখান থেকে গান, রাডার ওখান থেকে, দূরবীন আরেকখান থেকে। নেভাল চীফ দেখলাম এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট। তিনি সন্তুষ্ট থাকলে আমিও সন্তুষ্ট। কারণ আমি ঠিক করে দিয়েছি, তুমি পেট্রোল করে এগুলো দেখবে। সেটা করতে দরকারি সবকিছু দেওয়ার পর যদি সে বলে, যা দেওয়া হয়েছে সব ঠিক আছে, তা হলে ঠিক আছে। ঠিকমতো লাগানো না হয়ে থাকলে সেটাও জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

স্বাধীনতার পর আমাকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। সে সময়ের অনেকেই এখানে আছেন। তারা জানেন, সেনাবাহিনীর অবস্থা তখন কী ছিল। কোনো প্রাতিষ্ঠা... নিরস্ত্র সমর্থন বা আনুষঙ্গিক সহায়তা ছাড়াই সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ... কিছু লোক আমাকে দেওয়া হলো। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি আ...র নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটি বাহিনী আমি রেখে...ছিলাম। তবে এর মধ্যে ১৫ আগস্টে যা ঘটেছিল তা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এ...ন্য দোষারোপ করা উচিত হবে না। যা হোক, তখন যাকে পাওয়া যেত তা...ই সেনাবাহিনীতে নিতে হতো। এসবের জন্য একটা এডহক ব্যবস্থা ছিল এবং আমাদেরই সব সিদ্ধান্ত নিতে হতো। এই ব্যবস্থার অধীনে মুক্তিবাহিনীর সদস্য ...ন্য পেশা বা বাহিনী থেকে আসা অফিসার ও সৈন্য এবং বিশেষ করে পাকিস্ত...ন প্রত্যাগতদের সেনাবাহিনীতে আত্মীকরণ করা হয়। এদের অর্গানাইজড একটা গ্রুপে নেওয়ার জন্য আমাদের এডহক অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয়েছিল। বাংলাদেশকে আমরা পাঁচটি ভৌগোলিক অংশে বিভক্ত করেছিলাম। এই পাঁচ ভাগকে ডিভিশনের কনসেপ্টে ফেলে সরকারের কাছে পাঠিয়েছি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন করেছে। তখন আমরা সবাই মোটামুটি একটা বিশুদ্ধ পরিস্থিতিতে ছিলাম।

এরপর ২৯ বছর গত হয়েছে। এর মধ্যে আমাদের একটা প্রতিরক্ষানীতি হওয়া উচিত

ছিল। অবশ্য প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মতে, আমাদের একটা প্রতিরক্ষানীতি আছে। নিজের দিক থেকে বলতে পারি, আমি সেটা জানি না। এ রকম কোনো নীতি না থাকলে তা প্রণয়নের জন্য অবশ্যই আলোচনা হওয়া উচিত। নীতি না থেকে থাকলে সিলেটে কীভাবে একটা ব্রিগেড গঠন করা হচ্ছে? কীভাবে বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় আরেকটি ব্রিগেড করা হচ্ছে? এসব অবশ্যই প্রতিরক্ষানীতির আলোকে করতে হবে। আমাদের একটা পররাষ্ট্রনীতি আছে। তার মূল দর্শন হচ্ছে- সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়। পররাষ্ট্রনীতির এই দর্শনকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রতিরক্ষানীতি নির্দেশিত হবে। সম্ভবত আমরা সে রকম একটি পথ অনুসরণ করে আসছিও। এখন আমার প্রশ্ন, অন্য কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের অংশ দখলের ইচ্ছা কি আমাদের আছে? আমি বলবো, না। সে বিবেচনায় নন অফেন্সিভ ডিফেন্স বা অনাক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে আমাদের সেই মনোভাব অবশ্যই থাকতে হবে যাতে কেউ আমাদের দিকে তেড়ে আসার সাহস না পায়।

সেনাবাহিনী গড়ে তোলার এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাদের খুব বড় সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। কারণ ইন্দিরা গান্ধীকে আমি যা বলব তিনি তাতেই সম্মত হবেন। আমি বললাম, স্যার, একটা সময়ে তো ইন্দিরা গান্ধীও থাকবেন না, আপনিও থাকবেন না। তখন কী হবে? তখন তিনি বলবেন, তা হলে কী করতে হবে? আমরা বললাম, আমাদের এমন একটি সেনাবাহিনী থাকতে হবে যাতে প্রতিবেশীরা আমাদের সমীহ করে। একটা কথা এখানে বলতে চাই, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দু'বার বড় ধরনের যুদ্ধ হয়েছে, এখনো তারা যেন প্রায় যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু তারা একে-অন্যকে সমীহ করে। এটা ভালোবাসার কারণে নয়, কারণ তারা জানে তাদের দু'জনেরই দাঁত আছে। সমীহ আদায়ের জন্য দাঁত থাকতে হবে।

অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে পারলে প্রতিরক্ষার অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারব

রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) সুলতান আহমদ, পিএসসি
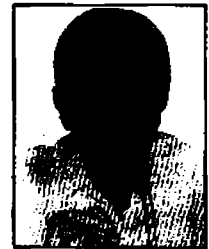
প্রথমেই আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত নৌবাহিনী ২৯টা থাই ট্রলার পাকড়াও করে। তারপর নৌবাহিনী সে ট্রলারগুলো তৎকালীন জিয়াউর রহমান সরকারকে দিয়ে বলে এগুলো আমরা ধরে দিয়েছি, এর আর্থিক মূল্যায়ন করে সে টাকায় সরকারের মাধ্যমে নৌবাহিনীকে দু'একটা যুদ্ধজাহাজ এনে দিন। সে পরিপ্রেক্ষিতেই দু'টি মেরিটাইম পেট্রল বোট ফিশারি প্রটেকশন দেওয়ার জন্য আমরা মৎস্য মন্ত্রণালয় থেকে কিনেছিলাম। সে সম্পর্কে অন্য অনেক আলাপ-আলোচনা আছে,

আমি তাতে যাব না। এ তত্ত্বটা না জেনেই কিন্তু আমরা এর প্রয়োগ করেছিলাম।

প্রতিরক্ষানীতি করার সময় আমরা কী এর অর্থনৈতিক ফলাফল দেখি না-কি দেখি না? আমরা ভৌগোলিকভাবে তিন দিক থেকে ভারতবেষ্টিত। একদিকে আছে বার্মা। সমুদ্র আমাদের একমাত্র উন্মুক্ত অবস্থান। আমার মনে হয়, সে সমুদ্রটাকে সব সময় খোলা রাখতে পারলে এবং তার সম্পদগুলো আহরণ করতে পারলে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে পারলে, দেশের প্রধান শত্রু দারিদ্র্যকে দূর করতে পারলে আমাদের প্রতিরক্ষার অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারব।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক দু'টি ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছু বলব। আপনারা সম্ভবত জানেন যে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চারটি ফ্রিগেট আছে। আমাদের প্রথম ফ্রিগেট এসেছিল ১৯৭৬ সালে। তারপরে আরো ক'টি পুরনো ব্রিটিশ ফ্রিগেট। চতুর্থ ফ্রিগেটটা আমরা নিয়েছিলাম চীন থেকে। সেটা ছিল মিসাইল ফ্রিগেট এবং সেটাই মিসাইলের সঙ্গে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয়। আমাদের মিসাইল ক্রাফটও ছিল। মাত্র ৭ মিলিয়ন ডলারে একটা একেবারে নতুন ফ্রিগেট কিনেছিলাম চীন থেকে। আমি তখন নৌবাহিনীর প্রধান। এখন আমরা যে ফ্রিগেট নিয়েছি সেটা আমরা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে নিয়েছি এবং সেখানে না-কি নানা দেশের ইকুইপমেন্ট আসছে। সমস্যা প্রকট হবে যদি জাহাজের রাডার হয় এক দেশের, পিপিআই এক দেশের, আর তার ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম হয় আরেক দেশের। এতে রক্ষণাবেক্ষণে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। আমি আরো বলতে চাই, আমাদের একটা কেবিনেট কাউন্সিল অফ ডিফেন্স থাকলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা বলতে পারতাম বিমানবাহিনী যে আটটা মিগ-২৯ কিনল সেগুলোর কতটা তারা ব্যবহার করতে [illegible]বে। তার বদলে চারটা মেরিটাইম পেট্রল এয়ার ক্রাফট কিনলে সেগুলো [illegible]নবাহিনীর পরিধিই বাড়াত। সেগুলো আমাদের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা দিতে [illegible]রত। তারা ২০০ মাইল পর্যন্ত যেতে পারত এবং এ ফ্রিগেটটার বদলে যদি চা[illegible] পেট্রল ক্রাফট কিনতাম তা হলে ওই এয়ারক্রাফট ইনডিকেশন দিলে আমরা [illegible]ট্রল ক্রাফট রিলিজ করে যারা সমুদ্রে থাকে তাদের ধরে আনতে পারতাম।

প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দিয়েছেন সিলেটে [illegible]ড গঠন করা হবে, ফ্রিগেট ও মিগ কেনা হচ্ছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করতে। [illegible]ডিকেল স্কুল, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনিক্যাল কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার [illegible]পর জোর দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে কি আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সমৃদ্ধ করছি, না-কি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে আর্মি মেডিকেল কোরে যে তরুণ যোগ দিতে পারে ক্যাপ্টেন হিসেবে তাকে নিয়োগ দেওয়া থেকে বঞ্চিত করছি। আমি মনে করি, এ পদ্ধতিতে সশস্ত্রবাহিনীর মেডিকেল কলেজে আমরা ভালো ছেলেদের পাব না। একটা ফোরাম থাকলে আমরা এসব বিবেচনা করতে পারি। সেই ফোরামের খুব অভাব। এখন একমাত্র ফোরাম

সংসদীয় কমিটি। এ কমিটিতে আপনারা একটু জোরেশোরে কাজ করছেন দেখে আমরা একটু উৎসাহিত হচ্ছি। সে কমিটির আহবায়ক ও তিনজন সদস্য আজ উপস্থিত আছেন। আশা করব, আপনারা আমাদের বক্তব্য সেখানে জানাবেন এবং বিবেচনা করবেন।

জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা শুধু মিলিটারী বিষয় নয়, অর্থনীতি ও জাতীয় সম্পদের বিষয়টাও এখানে প্রয়োজনীয়

মেজর জেনারেল জামিল ডি আহসান, বীর প্রতীক, পিএসসি

সামরিক প্রতিরক্ষা আস্তে আস্তে আরো বড় আকার ধারণ করছে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণটাকেই বড় করে দেখা হচ্ছে। অন্যান্য দেশে প্রতিরক্ষানীতি না বলে নিরাপত্তানীতি নির্ধারণ করে। বর্তমান সশস্ত্রবাহিনী বা মিলিশিয়া বা জাতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা তত্ত্ব কাজ করে। আমার মনে হয় আমরা অনেক সময় আমাদের সীমিত জ্ঞান নিয়ে বড় রকমের একটা কোয়ালিটেটিভ বক্তব্য দিয়ে দিই।

আমার জানা মতে, চারটা দেশ নিজেদের নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, আর সম্ভবত সুইডেন ও ফিনল্যান্ড। কিন্তু তাদের সশস্ত্রবাহিনী অন্য বহু মাঝারি দেশের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী ও বড় এবং তারা অনেক বেশি খরচ [illegible]। সুইজারল্যান্ডে বা অস্ট্রিয়া অন্য দেশের সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে তাদের সেনাবাহিনী বা নিরাপত্তা পরিকল্পনা গড়ে তোলেনি, তবে তাদের বড় একটা বাহিনী আছে। তাদের স্থায়ী সেনাবাহিনীটা ছোট হলেও তাদের যে আঞ্চলিক বাহিনী আছে তা অন্যান্য দেশের নিয়মিত বাহিনীর চেয়েও বড়। সেখানে একটা সেমিনারে আমার যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তাই বলছি, শুধু নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেই বা নিয়মিত বাহিনী ছোট রেখে সিটিজেন আর্মি করলেই তা ছোট হবে বা বাজেট কম হবে তাও নয়। এখানে ড. ইফতেখার বাজেটের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে আমার মনে হয়, শুধু প্রতিরক্ষার, অর্থাৎ একটি বিষয়ের ওপর পরিসংখ্যান দেওয়া হলে সেটাকে গাণিতিক সংখ্যা ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে তুলনামূলক স্টাডি করতে পারছি না। এখানে ডিফেন্সকেই দেখানো হয়েছে, কিন্তু এর সঙ্গে অন্যান্য সেক্টরের কি বাড়ল-কমল তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। '৮৪ ও '৯৮-এর একটি ফিগার দেখানো হয়েছে। অবশ্যম্ভাবীভাবে কিছু বেশি তো এমনিতেই হবে। কারণ টাকার মূল্যমান অনেক কমেছে, প্রয়োজন বেড়েছে, জিনিসপত্রের দামও বেড়ে গেছে। আবার জিএনপি বাড়া-কমার বিষয়টাও আছে। ভারতে এবার ২৮ শতাংশ প্রতিরক্ষা ব্যয় বেড়েছে। তারা তো চিন্তাও করেনি যে, কারগিলের মতো যুদ্ধ হবে।

বর্তমানে শুধু ভূখণ্ড নিয়েই যুদ্ধ হয় না। কারণ জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা শুধু মিলিটারী বিষয় নয়, অর্থনীতি ও জাতীয় সম্পদের বিষয়টাও এখানে প্রয়োজনীয়। এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কেউ নিয়মিত যুদ্ধে সম্পৃক্ত হচ্ছে না। তবে প্রক্সি ওয়ার হচ্ছে। অর্থাৎ বিদ্রোহ সৃষ্টি করে একটা দেশের সরকারকে সমস্যায় আটকে রেখে তাদের সম্পদ ব্যবহারে বাধা দেওয়া, তাদের স্থিতিশীল না হতে দেওয়া, এসবও একটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সামরিক উদ্দেশ্য হতে পারে। আমাদের এ অঞ্চলে এর উদাহরণ বেশ দেখা যাবে। এই প্রক্সি ওয়ার পুরোপুরি আভ্যন্তরীণ হতে পারে, শ্রীলঙ্কায় কোনো বাইরের হুমকি কাজ করছে না, এ হুমকিটা পুরোপুরি আভ্যন্তরীণ। তাদের পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। কিন্তু যেভাবে তারা বাজেট গন্ডিবদ্ধ করে রেখেছে, যেভাবে সেনাবাহিনীকে সম্প্রসারিত করেছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা সহানুভূতিশীল। আমরা বলছি না, ওদের উদাহরণ টানা যাবে না। কারণ ওটা একটা ভিন্ন পরিস্থিতি। জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিষয়ক কারণে আমাদের পরিস্থিতিও তো ভিন্ন হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীকে আবদ্ধ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে কখন সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কারা এটা করে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থা চলতে থাকুক- সেটা কেউ চায় না। যে কষ্ট ও পরিশ্রম তারা করে সেটা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে করে না। সেখানে তাদের সম্পৃক্ত হওয়ার স্পীরিটটা হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা ও ভূখণ্ডগত অখন্ডতা রক্ষা। আমার বক্তব্য, এটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার, কে কীভাবে বিষয়টা দেখছে। একজন সিভিলিয়ান সেভাবে দেখবেন না। সেনাসদস্যরা সেখান থেকে কাঠ নিয়ে আসছে, ফার্নিচার বানাচ্ছে, বেশি পয়সা পাচ্ছে, ব্যাপারটা এভাবেই তিনি দেখবেন। এর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার আছে, নিরাপত্তা হুমকি উপলব্ধির বিষয়টাও আছে যে, আমরা সেটা কোন্ পর্যায়ে উপলব্ধি করছি। শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দিয়ে বলছি যে, তারা কোনোদিন মনে করেনি ভারত তাদের জন্য হুমকি [illegible]কার বাইরের কোনো নির্দিষ্ট হুমকি তাদের ছিল না। কিন্তু তাদেরও সামরিক বাহিনী[illegible] সম্প্রসারিত করতে হয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রেও তো পরিস্থিতি এ রকম [illegible] পারে। আমাদের নীতি হচ্ছে, 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা [illegible]। এক বাক্যে না হোক, কিছু বাক্যে আমাদের একটা প্রতিরক্ষানীতি হতে [illegible]র; ভারতের মতো কিছু সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন করা যেতে পারে। একটি বড় [illegible]তান্ত্রিক দেশ হিসেবে সব সময় আমরা ভারতের উদাহরণ দেই। এ ক্ষেত্রেও [illegible]মরা ভারতের উদাহরণ গ্রহণ করতে পারি। তা ছাড়া যুক্তরাজ্যে সংবিধান অলি[illegible]ত থাকতে পারলে আমাদের প্রতিরক্ষানীতি কেন অলিখিত থাকতে পারবে না[illegible]তে পারেন তাদের সমাজ ও জাতীয় ঐতিহ্য ভিন্ন, আমাদের ক্ষেত্রে সেটা প্রযো[illegible] নয়। আমার মত হচ্ছে, একটা গাইডলাইন তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে। তবে কিছু অংশ আছে যা নিয়ে আলোচনা হতে পারে, যেমন শ্বেতপত্র বা বাজেট। কিন্তু নীতি কি হবে, প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য কী, সে উদ্দেশ্য পূরণে কী ধরনের প্রস্তুতি লাগবে, কোন্ ধরনের ফোর্স থাকবে, সেটা এক লাখ না দু'লাখ হবে, শুধু পদাতিক বাহিনী হবে, না-কি মানবনির্ভর সেনাবাহিনী না করে আমরা উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সমৃদ্ধ সেনাবাহিনী করব-সেগুলো আসতে পারে পরের ধাপে। আমার মনে হয়, তার আগে গাইডলাইনের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। এটা নির্ধারিত হবে আমাদের যে

রাষ্ট্রীয় নীতি আছে তার দ্বারা। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বলাই হয় যে, ফিজিক্যাল ডিফেন্স হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ডিফেন্স আর সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স হলো ডিপ্লোমেটিক এফর্ট।

বলা হয়েছে, বাইরের সাহায্য নিয়েই আমাদের ডিফেন্স করতে হলে আর ডিফেন্স ফোর্স থেকে লাভ কী? এখন তো সব জায়গায় তা হচ্ছে। আক্রমণকারী যাতে সহজেই সাফল্য না পেয়ে যায় ততটুকু কালক্ষেপণ করার মতো ফিজিক্যাল ডিফেন্সের সামর্থ্য আমাদের থাকা উচিত। কখনোই কোনো দেশ চিন্তা করবে না যে, অপরিকল্পিতভাবে একটা সামরিক সাফল্য পেয়ে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে। একটা ক্যাজুয়্যালটি ঘটলে জনসাধারণের কাছে জবাবদিহি করার মতো সৎসাহস নেই বলে আমেরিকা আজ ফিজিক্যালি বসনিয়া ও সোমালিয়ায় যায় না । তারা খবরদারি করতে চায় আন্তর্জাতিকভাবে।

আমরা খুব সহজ একটা গাণিতিক পরিসংখ্যান করি। মনে করা হয়, ভারতের ১২ লাখ সৈন্য আছে আর আমাদের এক লাখ। তা হলে আমরা কীভাবে তাদের প্রতিহত করব? ভারতের ১২ লাখ সৈন্য তো বাংলাদেশ সম্পর্কিত নিরাপত্তা হুমকির উপলব্ধি থেকে তৈরি করা হয়নি। চীন আছে, পাকিস্তান আছে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আছে-এ রকম সর্বপ্রকার নিরাপত্তা হুমকি থেকে তাদের ১২ লাখ সৈন্যের সৃষ্টি। বাংলাদেশ হয় তো একটা করোলারি অংশ। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই নয় যে, ১২ লাখ সৈন্যই তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। ১২ লাখ সৈন্য অপারেট করতে হলে তাদের সে রকম ম্যানুভারবিলিটি লাগবে। তত্ত্বে বলা আছে, আক্রমণই হচ্ছে উৎকৃষ্ট প্রতিরক্ষা। এটা কিন্তু জায়গা দখলের আক্রমণ নয়। যুদ্ধের সম্ভাব্যতা কমানোর জন্যও কিছুটা অফেন্সিভ থাকতে হবে। শত্রু আক্রমণ করার পূর্বে তাকে প্রতিহত করার প্রস্তুতিটুকু আমাদের থাকতে হবে।

নিরাপত্তা হুমকির সম্ভাবনার সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার সম্পর্কিত। এ উপলব্ধি বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে বিভিন্ন রকম। সৈনিক হিসেবে এ উপলব্ধি আমার কাছে স্পষ্ট বলে আমি মনে করি। আজকাল সশস্ত্র বাহিনীতেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সামরিক প্রেক্ষাপট ছাড়াও সব [illegible] প্রেক্ষাপটেই আজকাল স্টাডি করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, উন্নয়ন নিরাপত্তা, মানব নিরাপত্তা-এসব তাতে আসছে। এর সঙ্গে আমাদেরও সম্পৃক্ত হতে হবে। শুধু সামরিক নিরাপত্তার কথা ভাবলে প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব মনে হয় কমে যাবে। এ জন্যই এ ধরনের ফোরাম দরকার। সংসদ একটি উচ্চতর ফোরাম। তা ছাড়াও আরো নানা ফোরাম আছে। তারা এভাবে মতবিনিময় করতে থাকলে অনেক সংশয় মন থেকে চলে যাবে। এখনই এটা সম্ভব নয়, আরো দুয়েক বছর হয়তো লাগবে।

আপনারা অনেকেই বলেছেন, প্রতিরক্ষানীতি সবার জন্য উন্মুক্ত বলে দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়, তা উচিত নয়। তথ্যের মূল নীতিই হচ্ছে প্রয়োজনে তথ্য জানা। পররাষ্ট্র সচিব যে প্রেস ব্রিফিং দেন তাই কি তার মূল বক্তব্য? তা তো নয়। এ জন্যই বলছি, অনেক কিছু কিন্তু বলা যায় না। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি কী হবে তার সবটুকুই

কি বলা হয়? আমার তো মনে হয় না কোনো সরকারই তা বলবে। আমার কী আছে সেটা তো বলা উচিত নয়, সীমিত শক্তি নিয়ে তার কার্যকরী ব্যবহার কীভাবে করতে পারি, নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেটাই আসা উচিত। শুধু একটা গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়ে প্রতিরক্ষাকে বিবেচনা করা উচিত নয়। গুণগত মানটাও সেই সঙ্গে দেখতে হবে। এটা ইকুইপমেন্টনির্ভর আধুনিক সেনাবাহিনী হতে পারে। একটা ফ্রিগেট কিনে ১০টা ফাস্ট অ্যাটাক ক্রাফট ধ্বংস করতে পারলে বা একটা ফ্রিগেট দিয়ে নৌবাহিনীর উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারলে কেন আমরা সেটা কিনব না? ফ্রিগেট ক্রয় করাটাকে আমি যথার্থ বলছি না, আমি শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এয়ারক্র্যাফট না কিনে এন্টি-এয়ারক্র্যাফট মিসাইল দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করা বা আরো ট্যাঙ্ক কেনাও একটা পলিসি হতে পারে। বাজেট বরাদ্দ হবে সে হিসাবে। যথানুপাতিক একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে এটা হতে পারে। এক বছরে না হোক, হয় তো পাঁচ বছরে হতে পারে।

কেউ কামড় দিলে ফিরতি কামড় দেওয়ার মতো প্রতীকী প্রস্তুতি থাকা দরকার

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) মমতাজউদ্দীন আহমদ

আমাদের প্রতিরক্ষানীতি থাকুক না থাকুক, কেউ কামড় দিলে তাকে ফিরতি কামড় দেওয়ার মতো প্রতীকী প্রস্তুতি আমাদের থাকা দরকার। সে জন্যই কিন্তু প্রতি[illegible] ব্যবস্থা। পাকিস্তান শাসনামলের কথা ভবলে আপনারা দেখবেন, তাদের [illegible]ক্ষানীতি ছিল যদি দুর্বল পূর্ব পাকিস্তানে কোন আক্রমণ হয় তা হলে তার [illegible]শালী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আক্রমণ করবে বা চীনের সাহায্য নেবে। কি[illegible] আজকের বাংলাদেশের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশ আমাদের রাষ্ট্র। এর ভ[illegible], নৌসীমা, আকাশসীমা সব আমাদের রক্ষা করতে হবে। আপাতঃদৃষ্টিতে [illegible]নো হুমকি না থাকলেও হুমকির সম্ভাবনা যদি সৃষ্টি হয়, সমুদ্র তীরবর্তী কো[illegible] দ্বীপে যদি আমরা খনিজ সম্পদ পাই কিংবা তালপট্টির মতো একটা পরিস্থিতি[illegible] সৃষ্টি হয় তখন আমরা কী করব? সশস্ত্রবাহিনী তো একদিনে তৈরী কর যায় না। সে রকম পরিস্থিতির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। হয় তো এখন আমাদের সে রকম কোনো প্রতিরক্ষানীতি নাই, তবে দেখা যাচ্ছে প্রতিরক্ষার একটা গাইডলাইন আছে। প্রতিরক্ষার এ গাইডলাইনের ওপর ভিত্তি করে আমরা চলে আসছি। এ পর্যন্ত কোনো ভুল পরিস্থিতির শিকার হইনি।

এয়ার ডিফেন্সের প্রসঙ্গে আসি। ইস্টার্ন কমান্ডের অধীনে বাংলাদেশের চারদিকে এখন ১৩/১৪ টা ভারতীয় বিমাট ঘাঁটি আছে। তাদের লক্ষ্য শুধু চীন নয়, আমরাও। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি, বিগত দিনে যখনই আমরা বিমানবাহিনীর শক্তি বাড়িয়েছি, ইস্টার্ন

কমান্ডও সে হারে তাদের শক্তি বাড়িয়েছে। ভারতের সঙ্গে আমরা ১ ঃ ১ শক্তিতে যুদ্ধে যাব, সেটাও ঠিক নয়। আমাদের প্রতিরক্ষানীতি হবে সব সময় আত্মরক্ষামূলক। এখন আগরতলা থেকে ঢাকার ওপর কোনো বিমান আসতে থাকলে রাডার সিস্টেমে তা ছয়-সাত মিনিটের রেট যা ধরা পড়বে না। ধরা যাক ধরা পড়ল। এখন যে পাইলট ককপিটে স্ট্যান্ডবাই বসে আছে স্টার্টআপ আর টেকঅফ করতেই তো সে সময় নেবে দুই মিনিট। এ বিমান ঢাকার আকাশে উঠতে উঠতে আক্রমণ শুরু হয়ে যাবে। তাই আমি বলতে চাই, শুধু যে বিমান দিয়েই আমাদের এয়ার ডিফেন্স করতে হবে তা নয়। আমাদের পুরো রাডার সিস্টেমের একটা পরিবর্তন দরকার। শুধু ফাইটার এয়ারক্রাফট থাকলেই চলবে না। এর সঙ্গে রাডার থাকতে হবে, এয়ার ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট থাকতে হবে। এ সবকিছুর সমন্বয়েই টোটাল এয়ার ডিফেন্স তৈরি হয়।

আমরা যদি বলি, আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর দরকার নেই, সেটা ঠিক হবে না। ভূখন্ড রক্ষার জন্য আমাদের সেনাবাহিনী দরকার, আকাশসীমা রক্ষার জন্য দরকার বিমানবাহিনী, কোস্টগার্ডের জন্য নৌবাহিনী। আমাদের সম্পদ রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী থাকতে হবে এবং প্রতিরক্ষানীতি তৈরি করতে হবে। প্রতিরক্ষানীতি তৈরির দায়িত্ব আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের। এ জন্য রাজনৈতিক পরিপক্কতা দরকার। বিগত সরকারগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সশস্ত্রবাহিনীকে সামগ্রিক রূপরেখা তৈরি করে দিতে পারেনি। বর্তমান সরকারের সবচেয়ে পজিটিভ দিক হলো, এখন একটা জবাবদিহিতা আমরা পাচ্ছি। এখন প্রতিরক্ষা সাব-কমিটি হচ্ছে। আগে প্রতিরক্ষা নিয়ে কথা বলাই ভীতিকর মনে হতো। কিছু বলা যেত না। আমার সময়ে এয়ারক্র্যাফট বি[illegible] হয়ে লোকজন মারা গেছে, পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারপর নির্দেশ এসেছে, পত্রিকাও[illegible]কে বলে দাও, কোনো খবর দেওয়া যাবে না। এই যে প্রবণতটা ছিল তা থেকে এখন আম[illegible] অনেক ভালো পর্যায়ে আছি।

বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের [illegible]দিকে এক বিশাল প্রতিবেশী দেশ। ওদের কাউন্টার করতে হলে আমাদের এটা-ওটা দরকা[illegible] এ রকম ভাবনাও কিন্তু ভুল। নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমি বলব না যে, এক দিন বা দুই দিন বা তিন দিন। সেটা অন্য ব্যাপার তবে এখন [illegible] জিনিসটা ভুল হচ্ছে তা হলো বিভিন্ন দেশ থেকে এডহক ভিত্তিতে ক্রয় চলছে। এ ক্ষেত্রে কোনো নীতি নেই। হয় তো মিগ-২৯-এর ব্যাপারটা সঠিক উত্তর নয়। ১৯৭২-'৭৩ সাল থেকে আমরা বলছিলাম যে, বিমানবাহিনীর জন্য সাবসনিক বিমান দরকার। কোনো বড় বিমানবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তখনকার সরকার মনে করল নতুন দেশ, এটা একটা প্রেস্টিজ ইস্যু। তারা মিগ-২১ নিল, বর্তমানে মিগ-২৯ এল। আমি অবশ্য এর পক্ষে লিখেছি, কিন্তু আটটি মিগ-২৯ দিয়ে যে আমরা বিরাট কিছু করে ফেলব তাও কিন্তু না। এটা একটা ভুল ধারণা। মিগ-২৯ পুরো সিস্টেমের একটা অংশ। আজ আটটা মিগ-২৯ আছে, কাল আরো আটটা আসবে। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। সে জন্য আমাদের

নীতি ঠিক করা উচিত যে, এই হবে আমার সশস্ত্রবাহিনীর পুরো কাঠামো। সে লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে আমাদের এগুতে হবে। পরিকল্পনামাফিক না এগুলে মিগ-২৯ ক্রয় সম্পূর্ণ বিফলে যাবে। কালকে যদি আরেকটা সরকার এসে বলে, এখন আমরা এসব কিনব না, চীনা কিছু কিনব। তা হলে তো কোনো সমন্বয় থাকল না। আমাদের এয়ারক্র্যাফট আছে ৬৯/৭০ টা। এরই মধ্যে তার ভিতর তিন-চার রকমের টাইপ হয়ে গেছে। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আমাদের ৬০%-৭০%এয়ারক্রাফট অকেজো হয়ে আছে। আমাদের অবকাঠামো থাকলে এত সমস্যায় পড়তে হতো না।

সশস্ত্রবাহিনী একটা প্রতিষ্ঠান। এর জন্য একটা উচ্চতর প্রতিরক্ষা অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। আর্মি, নেভি, এয়ার চীফের সেখানে একই র‍্যাঙ্ক থাকবে। এটা একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ, কিন্তু বেশ লম্বা সময় ধরে আমাদের ডিফেন্সের উচ্চপর্যায়ে সেনাবাহিনীর প্রধান্য আছে। এতে সমন্বয়ের অভাব হয়। চীফ অফ জেনারেল স্টাফ কমিটি অথবা কেবিনেট ডিফেন্স কমিটি এ রকম অনেক কিছু আছে নামে, আসলে এসব কার্যকর নয়। উচ্চতর ডিফেন্স অবকাঠামোতে সমন্বয়টা ঠিকভাবে করতে হবে। আগে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঠিক করলে নীতি স্বাভাবিকভাবেই ঠিক হবে। মুহূর্তে আমাদের হুমকির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কোনো হুমকি নেই। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে ভবিষ্যৎ হুমকির জন্য।

প্রতিবেশী দেশ থেকেই সম্ভাব্য হুমকি আসতে পারে

মেজর জে. (অবঃ) মইনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম

নিরাপত্তার কথাটা বৃহৎ প্রেক্ষাপটেই আসে। এর সঙ্গে আসে দেশের পররাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য বিষয়। আমরা এখানে সশস্ত্রবাহিনীর কথা বলছি, এর সঙ্গে প্রতিরক্ষানীতি শব্দটাই মানায়। এটা অনেকটাই নিষিদ্ধ এলাকা ছিল। আমি যতদিন সেনাবাহিনীতে ছিলাম এ উদ্যোগটা নেওয়া হয়নি। এ নিয়ে লোকে কথা বলত না। প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে কথা বলাই ছিল নিরাপত্তার জন্য হুমকি অথবা নাশকতামূলক একটা কাজ। সেটা ছিল একেবারেই ভুল এবং ঔপনিবেশিক এক ধারণা। ব্রিটিশ সাহেবদের নিরাপত্তা ও সেনাবাহিনী নিয়ে কথা বলা যেত না। স্বাধীন দেশে প্রত্যেকটা নাগরিকের প্রতিরক্ষা নিয়ে কথা বলার অধিকার আছে।

আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, এখানে মাননীয় সংসদ সদস্যরা আছেন, যারা সংসদে বসে আমাদের গন্তব্য নির্ধারণ করেন। এই যে এত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখেন,

সেগুলো কী কখনো বিবেচনা করা হয়? এই এক বছরে আমি কোনো প্রমাণ পাইনি যে, কোথাও এসব বিবেচনা করা হয়েছে। তা হলে কী আমরা বসে বসে ইনটেলেকচুয়াল বক্তৃতা শোনার অনুশীলন করছি? আমরা কে কতটা জানি তা-ই যদি প্রমাণ করতে হয় তা হলে তো আমাদের আন্তরিকতা বা সততা নিয়ে প্রশ্ন আসে।

আপনাদের কি জানা আছে, '৯৬ সাল পর্যন্ত ভারতের কোনো ঘোষিত প্রতিরক্ষানীতি ছিল না? '৯৬-এর সংসদে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আমাদের প্রতিরক্ষানীতি নেই? উত্তরে বলা হয়েছিল, না, নীতি নেই, তবে একটা গাইডলাইন আছে। আমি এ পর্যন্তই জানি, এরপরে কী হয়েছে আমি জানি না। আপনারা বললেন যে, বাংলাদেশে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী এডহক ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতেও কিন্তু এটা হচ্ছে। ভারতে বিস্তারিত নির্দেশগুলো তৈরি হতো আর্মি চীফ ও সচিবালয় থেকে, প্রতিরক্ষা সচিব সেগুলো স্বাক্ষর করে সংসদে পাঠিয়ে দিতেন। প্রতিরক্ষা সচিবের স্বাক্ষর নিয়ে ফেরার পর ওটাই গাইডলাইন হিসেবে ধরে নেয়া হতো। নীতি নিয়ে এত কথা বলার দরকার নেই। কিসের নীতি? গাইডলাইন থাকলেই হয়। সরকার সংসদে এ নিয়ে বিতর্ক করতে পারে।

আমি জানি না, আমরা কেন বলি না যে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক। চীন প্রকাশ করতে পারলে আমরা কেন পারব না? ক'জন জেনারেলের পেছনে কী খরচ হয়, একজন সিপাহীর পেছনে কত খরচ হয়, সেটা জানার অধিকার মানুষের আছে। এর মধ্যে কিসের নিরাপত্তা জড়িত? এ নিয়ে কিসের গোপনীয়তা? নীতি কি এর চেয়ে বড়? কিসের ওপর ভিত্তি করে আপনারা নীতি বানাবেন? কে বানাবে নীতি? প্রতিরক্ষার কিছুই তো আপনারা শোনেন না। কিছু না জেনে আমরা সিটিজেন আর্মির কথা বলি। সিটিজেন আর্মি বলতে কী বোঝায়? আমরাও সিটিজেন আর্মি দিয়েই যুদ্ধ শুরু করেছিলাম। আমাদের স্বভাব হলো, ন্যূনতম প্রস্তুতি ছাড়া সর্বোচ্চ চাপ দেওয়া। এ কারণেই '৭১ সালে এত লোক মারা গেছে। আমরা প্রস্তুত ছিলাম না পাকিস্তানে আক্রমণের জন্য। যদি কেউ বলে প্রস্তুতি ছিল আমি সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নই। আমি এটা লিখেছিও। ভারতকেও আমরা সর্বোচ্চ চাপ দিয়ে যাব ন্যূনতম প্রস্তুতি ছাড়া। এটা আমাদের [illegible]তন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিরক্ষা। এ কারণেই আমাদের প্রতিরক্ষা বা অন্য নীতি যা-ই বলুন, সবই এডহকভিত্তিতে চলছে। এ দেশে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। প্রথম আলোকে আমি কৃতিত্ব দিই যে, ডিফেন্স নিয়ে তারা একটা আলোচনা শুরু করেছেন। তারাসহ আরো দু'একটা সংগঠন যে বিষয়টাকে রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে হাইজ্যাক করে জাতীয় ইস্যুতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন- সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

আমরা যদি বলি যে, ভারত ভবিষ্যতে আমাদের আক্রমণ করতে পারে, তাতে মনে হয় না ভারতীয়রা লজ্জা পাবে। ভারতীয় জেনারেলদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। '৭৫-এ কী হয়েছিল? আপনারা এ হুমকি সম্বন্ধে জানেন না। সরকার পরিবর্তিত না হলে তারা অস্থিতিশীল করার উদ্যোগও নিয়েছিল। বার্মার কী উদ্দেশ্য ছিল? রোহিঙ্গা নিয়ে আপনি

কিছু করতে পারতেন না। আপনি পুশ করার চেষ্টা করলে বার্মা আক্রমণ করত। জনগণের এসব জানা উচিত। সম্ভাব্য হুমকি কার কাছ থেকে আসতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করায় তো কোনো সমস্যা নেই। প্রতিবেশী দেশ থেকেই সম্ভাব্য হুমকি আসতে পারে। তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের কোনো সংঘাত হলেও তো হুমকি আছে। আমাদের ভূখন্ডগত সমস্যাও আছে।

সুশীল সমাজের সদস্যরা যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত যে, বাজেটের টাকার অপচয় হচ্ছে। টাকা চলে যায় প্রশাসন, লজিস্টিক এসবের পেছনে। দেখুন আমাদের কতরকম গাড়ি। একেক সরকার এসে একেক রকম গাড়ি কেনেন। দশ রকমের গাড়ি আর ৮টা মিগ দিয়ে কি দেশ রক্ষা করা যাবে? আমি নিশ্চিত যে, যাবে না। কারণ অভিজ্ঞতার অভাব। পাকিস্তানের সঙ্গে কী হয়েছিল ভারতে[illegible] দু'দিন তো তারা এয়ারপোর্টই ব্যবহার করতে পারেনি। আমাদের ওরকম দক্ষতা নেই। এয়ারপোর্ট নেই, মিগ কোত্থেকে ওড়াব? আমাদের দরকার হেলিকপ্টার, এন্টি এয়ারক্রাফট গান। বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ক্রয়ের আগে জাতীয় স্বার্থে তার পর্যালোচনা দরকার। জাতীয় স্বার্থ না থাকলে সব কিছুই হ-য-ব-র-ল হয়ে যাবে।

আপনারা যে টোটাল সিকিউরিটির কথা বলেন, তার আগে অনেক কিছু আসে। মেন্টাল সিকিউরিটি আগে দরকার, ফিজিক্যাল সিকিউরিটি তার পরে। এ জন্য বলছি, একটা গাইডলাইন দরকার। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে গাইডলাইন করতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সে গাইডলাইনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিরক্ষার সব কাজ চলবে।

এখন আসা যাক ড. আমেনা মহসিনের তোলা ক্যু প্রসঙ্গে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে[illegible] অবস্থান শক্ত হলে সেনাবাহিনী কখনো ক্ষমতা দখল করতে পারবে না। [illegible]গের সমর্থন না থাকলে কোনো স্টুপিড জেনারেল ক্ষমতা দখল করতে যাবে[illegible] ভারতে ক্যু হয় না কেন? কারণ সেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো খুবই শক্ত। তার[illegible] আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কোনো পাগল জেনারেলও এখানে আর [illegible] চেষ্টা করবেন না। তবে সেনাবাহিনীর মধ্যেও শক্ত গণতান্ত্রিক কাঠামো [illegible]র। ক্ষমতায় বসে আপনারা বলবেন, আমার খালাতো ভাই এই হবেন, [illegible] অমুককে রাখব, ওকে এখানে বসাব। এরপর ক্যু হয়ে গেলে দোষ কার[illegible] শুধু সেনবাহিনীকে দোষ দেবেন না। সেনাবাহিনীতে মূল্যায়ন থাক[illegible]।

সেনাবাহিনীর আকার কী [illegible], পরিস্থিতিই তা বলে দেবে বা সে সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ। সহজ কথা হলো [illegible]ত হবে, আমাদের সশস্ত্রবাহিনী দরকার আছে কি-না। যদি বলেন দরকার নেই, তা হলে ভালো, যদি বলেন দরকার আছে, তা হলে তার পরের কথা হবে, [illegible]র আকার কী হবে? কতজন জেনারেল হবে? সিটিজেন আর্মি করা যায়, নয় মাস ট্রেনিং দিয়ে একজন সিপাহী তৈরি করা যায়, কিন্তু একজন মেজর বা জেনারেল তৈরি করা যায় না, নেতা তৈরি করা যায় না। সিটিজেন আর্মি যে করবেন, ওদের চালাবে কে? চালাতে হলে নেতৃত্ব ও নিয়মিত বাহিনীর একটা কাঠামো দরকার। জরুরি অবস্থায় যাতে আমরা অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা পাই, সে জন্য জনগণকে ট্রেনিং দিলে সে অনুযায়ী অস্ত্রও

থাকতে হবে।

আপনারা পাসের কথা বলেছেন। একজন সৈন্যকেও বাইরে আসতে হলে আউটপাস নিতে হয়। গাড়ি বের করার জন্য অনুমতি লাগে। তবে আপনাদের সঙ্গে আমি একমত, ক্যান্টনমেন্টে ব্যাপারটা একটু অতিরিক্ত। আমার ধারণা, এটা নিরাপত্তাজনিত সমস্যা নয়, মানসিক সমস্যা।

আমাদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকতে হবে, যাতে কোনো সম্ভাব্য আক্রমণকারী আক্রমণ করার সাহস না পায়

কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী
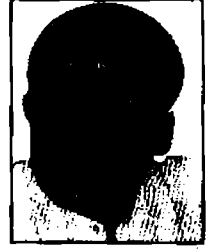
আমাদের সামনে প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত, দেশে কোনো প্রতিরক্ষানীতি আছে কি-না। কেউ যুক্তি দিতে পারেন, প্রতিরক্ষানীতি থাকলেও থাকতে পারে। তাহলে আমার কিছু বলার নেই। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রতিরক্ষানীতির চেয়ে অনেক বেশী দরকার নিজস্ব স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করা। যখন যেমন অবস্থা তখনকার সরকার সে আলোকে দেশে-বিদেশে তাদের অবস্থা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে। একে আমরা নীতি বলতে পারি না, বলতে পারি একটা সুযোগ বা সুবিধা। কিন্তু আমরা তো প্রতিরক্ষানীতির কথা বলছি। একটা নীতি থাকলে সেটা সবার কাছে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এ নীতির ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন সময়ে আনুষঙ্গিক অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। সশস্ত্রবাহিনী বলবে, আমরা অপারেশনাল প্ল্যান করি। অপারেশনাল প্ল্যান তো আপনাকে করতেই হবে, কিন্তু সেটা তো নীতি নয়। সে নীতিটাই আমরা রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে আশা করি।

উর্দিপরা ব্যক্তি যারা সময় সময় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তখন তারাও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ। আমরা বলি, একাত্তরের পরে আমরা কোনো কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িত হচ্ছি না বা কোনা ভূখন্ড আমরা যুদ্ধে হারাইনি বা কেউ জোর করে তা দখল করেনি। এ ব্যাপারে আমার তীব্র আপত্তি আছে। এটা কোনো নীতি হতে পারে না। বড়জোর বলতে পারি, আমাদের একটা পররাষ্ট্রনীতি আছে। পররাষ্ট্রনীতি আর প্রতিরক্ষানীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রতিরক্ষানীতি পররাষ্ট্রনীতির ওপর নির্ভর করবে এবং আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর পররাষ্ট্রনীতির প্রভাব পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা যদি একমত হই যে, আমাদের প্রতিরক্ষানীতি নেই, তা হলে ঠিক করতে হবে প্রতিরক্ষানীতিটা কি হওয়া উচিত। আমাদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকতে হবে, যাতে কোনো সম্ভাব্য আক্রমণকারী আক্রমণ করার সাহস না পায়। যদি কেউ তা করেই ফেলে তা

হলে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাড়াতাড়ি যা যা করার দরকার আমাদের তা করতে হবে। আমরা কীভাবে তা করব প্রতিরক্ষানীতিতে সেটা ঠিক করে দিতে হবে। সশস্ত্রবাহিনী, সিটিজেন আর্মি বা যা-ই বলুন না কেন, তারা যাতে অল্প সময়ের নোটিশে মুভ করতে পারে সেভাবে তাদের সমর্থ করে তুলতে হবে। আপনি কোন্ দিকে যাবেন? আমাদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এ মুহূর্তে কোনো রিজার্ভ নেই। সেনাবাহিনীতে রিটায়ার করার পর কারোরই রিজার্ভের জন্য কোনো দায়বদ্ধতা নেই। অথচ পৃথিবীর সব দেশেই বোধ হয় এটা আছে। যুদ্ধকালীন সময়ে জাতিকে সেবা দেয়ার জন্য তাদের ডাকা হয়। এর অবশ্য নির্দিষ্ট একটা বয়স আছে। সে বয়স পর্যন্ত তারা আসতে বাধ্য। এসব বিষয় আমাদের ঠিক করতে হবে।

প্রতিরক্ষানীতি কেমন হওয়া উচিত? আমি এ মুহূর্তে শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, দেশের মানুষের নিরাপত্তা এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য যা যা করা দরকার, যে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন তা নিতে হবে। বিষয়গুলোর আরো টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের প্রয়োজন আছে। আরো তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রয়োজন। প্রতিরক্ষানীতি নির্ধারিত হলে তা গোপন রাখার কোনো বিষয় হওয়া উচিত নয়। আমরা এটা গোপন রাখার চেষ্টা করলেও সম্ভাব্য শত্রুরা তা খুঁজে বের করতে পারবে। কাজেই সেটা নিয়ে এত রহস্য কেন?

পরিশিষ্ট

সুইজারল্যান্ডের সামরিক শক্তি

সুইজারল্যান্ডের ১৯ থেকে ২০ বছর বয়সী সকল নাগরিকের ১৫ সপ্তাহের সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। এই প্রশিকক্ষণের পর ৩ সপ্তাহ মেয়াদী ১০টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২২ বছর সময়কালে অর্থাৎ ২০ থেকে ৪২ বছর বয়সসীমার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে হয়। ২০০১ সালে ১ লাখ ৮৬ হাজার নাগরিক এভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

১। **রিজার্ভ ঃ** ৩,৫১,০০০

২। **সেনাবাহিনী ঃ** ৩,২০,৪০০ জনকে ২৪ ঘন্টার নোটিশে মবিলাইজ করা সম্ভব।

ক। **কমান্ড ট্রুপস্ ঃ** ২টি আর্মার্ড (সাজোয়া) ব্রিগেড, ২টি পদাতিক, ১টি গোলন্দাজ, ১টি এয়ারপোর্ট, ২টি ইঞ্জিনিয়ার রেজিমেন্ট। এছাড়া ৩টি ফিল্ড আর্মি কোর-প্রতিটিতে ২টি ফিল্ড ডিভিশন (৩টি পদাতিক, ১টি আর্টিলারী রেজিমেন্ট), ১টি আর্মার্ড ব্রিগেড, ১টি ইঞ্জিনিয়ার, ১টি সাইক্লিস্ট, ১টি ফোরট্রেস রেজিমেন্ট, ১টি টেরিটরিয়াল ডিভিশন (৫/৬টি রেজিমেন্ট)

খ। সমরাস্ত্র ঃ

(১) **মেইন ব্যাটল ট্যাঙ্ক (MBT) ঃ** ১৮৬টি পিজেড-৬৮/৮৮, ৩৭০টি পিজেড-৮৭, লিওপার্ড ২ শ্রেণীর (জার্মানীতে তৈরী) ট্যাঙ্ক।

([illegible]) [illegible]কি ঃ ৩১৯টি ঈগল ১/২

(৩) **সাঁজো[illegible] পদাতিক যুদ্ধ যান (AIFV) ঃ** ৪৩৫টি

(৪) সৈন্যবাহী [illegible]জোয়া যান (APC) ঃ ৮৪২টি এম-১১৩ ও ৪১৫টি পিরানহা

(৫) **সেলফ প্রপেলড্ আর্টিলারী [illegible]SP ARTY) ঃ** ১৫৫ মিলিটারের ৫৫৮টি এম-১০৯ ইউ কামান

(৬) **মর্টার ঃ** ৮১ মি.মি-এর ১,২২৪টি ও ১২০ [illegible]মি.-এর ৫৩৪টি

(৭) **ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ঃ** ২৭৬০টি ড্রাগন, ৩০৩[illegible] পিরানহা (TOW-2SP)

(৮) **রকেট লাঞ্চার ঃ** ১২,৫১২টি

(৯) **বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ঃ** স্টিঙ্গার (অজানা সংখ্যক)

(১০) ম্যারিন ঃ ১০টি এ্যাকুয়ারিস পেট্রোল বোট।

৩। **বিমান বাহিনী ঃ** ১টি এয়ারফোর্স ব্রিগেড, ১টি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্রিগেড, ১টি এয়ারবেস ব্রিগেড, ১টি সি৩আই (C3I) ব্রিগেড, এয়ারফোর্স রক্ষণাবেক্ষণ সার্ভিস।

ক। সর্বমোট বিমান ঃ ১৩৮টি (২০০২ সালে সংখ্যা আরো বেড়েছে)

খ। ফাইটার স্কোয়াড্রন ঃ ৮টি

(১) ৫টি স্কোয়াড্রন ৭০টি টাইগার ২/এফ-৫ই জঙ্গী বিমান নিয়ে গঠিত।

(২) ৩টি স্কোয়াড্রনে আছে ২৬টি এফ/এ-১৮সি ও ৭টি এফ/এ-১৮ডি বিমান

গ। রেকি স্কোয়াড্রন ঃ ১টি স্কোয়াড্রন-১৬টি মিরেজ ৩আরএস-২ মডেলের বিমান। এছাড়া ৪টি মিরেজ ৩ডিএস পাইলট প্রশিক্ষণের জন্য।

ঘ। পরিবহন ঃ ১টি স্কোয়াড্রেনে আছে ১৬টি পিসি-৬ বিমান।

এছাড়া রয়েছে ১টি লিয়ারজেট, ২টি ডিও-২৭ ও ১টি ফ্যালকন বিমান।

ঙ। হেলিকপ্টার ঃ ৬টি স্কোয়াড্রন। এগুলোতে আছে ১৫টি সুপার পুমা, ৫৮টি এ্যালিউট ৩ ও ৭টি কগার হেলিকপ্টার।

চ। প্রশিক্ষণ ঃ ৩টি এফ-৫ই, ১২টি এফ-৫এফ, ১৯টি হক, ৩৮টি পিসি-৭, ১১টি পিসি-৯।

ছ। বিমান থেকে বিমানে নিক্ষেপনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র (AAM) ঃ এআইএম সাইডউইণ্ডার, এআইএম-১২০ এএমআরএএম (AMRAM)।

৪। **আকাশ প্রতিরক্ষা ঃ** ১টি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্রিগেড। এতে আছে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপনকারী ক্ষেপনাস্ত্র (SAM) রেজিমেন্ট যা রয়েছে ৩টি ব্যাটালিয়ন। এদের ক্ষেপণাস্ত্র হচ্ছে বি/এল ৮৪ র‍্যাপিয়ার এছাড়া ৫টি আকাশ প্রতিরক্ষা রেজিমেন্টের প্রতিটিতে আছে ২টি ব্যাটালি। যাদের অস্ত্র হচ্ছে ৩৫ মি মি কামান ও স্কাইগার্ড ফায়ার কন্ট্রোল রাডার।

৫। **প্যারামিলিটারী ঃ** ২,৮০,০০০।

মায়ানমারের সামরিক শক্তি

	১৯৮৩-১৯৮৪	১৯৮৯-১৯৯০	১৯৯৩-১৯৯৪	১৯৯৬-১৯৯৭	২০০০-০১
সেনাবাহিনীর লোকবল	৮৫,০০০	১,৭০,০০০	২,৬৫,০০০	৩,২১,০০০	৪,০০,০০০
মেইন ব্যাটল ট্যাঙ্ক	২৪[১]	২৪	১৮০	১৮৫	১৮০
সৈন্যবাহী সাজোয়া যান	-	-	-	২৭০	৪৯৫
নৌবাহিনীর লোকবল	-	৭,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	২০,০০০
ডেস্ট্রয়ার	-	-	-	-	-
ফ্রিগেট	-	-	২	২	৩
কর্ভেট	-	০২[২]	২	২	-
মিসাইল গানবোট	-	-	-	-	৪
পেট্রোল বোট	-	-	-	৫৮	৫৪+
মাইন হান্টার	-	-	-	-	৬
অক্সিলিয়ারি	-	-	-	-	৬
বিমানবাহিনীর লোকবল	-	৯,০০০	৯,০০০	৯,০০০	১০,০০০
ফাইটার বা জঙ্গি বিমান	-	-	-	৩৬	২৫+
…কারী বিমান	-	-	-	২৪	২২+
প্রশিক…	-	-	-	-	৩২
পরিবহন বিমান	-	-	-	১২	১৯
হেলিকপ্টার	-	-	-	৫৭	৫৭

(১) ও (২)- অত্যন্ত পুরানো ও বাতিলযোগ্য প্রা…

ভারতীয় ইষ্টার্ন কমান্ড-এর বিন্যাস

ইষ্টার্ণ কমান্ড হেড কোয়ার্টার-কোলকাতা

<u>৩য় কোর-রাঙ্গাপাহাড়, ডিমাপুর, আসাম</u>

১। ৩ আর্টিলারী ব্রিগেড, ডিমাপুর, আসাম
২। ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন, শিলচর, আসাম
৩। ৫৭ মাউন্টেন আর্টিলারী ব্রিগেড, আগরতলা, ত্রিপুরা
৪। ১টি মাউন্টেন ব্রিগেড, কারং, মনিপুর
৫। ১টি মাউন্টেন ব্রিগেড, আইজল, মিজোরাম
৬। ১টি মাউন্টেন ব্রিগেড, কাকচিং, মনিপুর
৭। ৮ মাউন্টেন ডিভিশন, লাকিমা, নাগাল্যান্ড
৮। ৮ মাউন্টেন আর্টিলারী ব্রিগেড, লাকিমা, নাগাল্যান্ড
৯। ৩টি মাউন্টেন ব্রিগেড, লাকিমা, নাগাল্যান্ড

<u>৪র্থ কোর-তেজপুর, আসাম</u>

১। ৪ আর্টিলারী ব্রিগেড, তেজপুর, আসাম
২। ৫ মাউন্টেন ডিভিশন, ইটানগর, অরুনাচল
৩। ৫ মাউন্টেন আর্টিলারী ব্রিগেড, ইটানগর, অরুনাচল
৪। ২টি মাউন্টেন ব্রিগেড, তাওয়াং, অরুনাচল
৫। ১টি মাউন্টেন ব্রিগেড, গোচাম, অরুনাচল
৬। ২ মাউন্টেন ডিভিশন, দিনজান, আসাম
৭। ২ মাউন্টেন আর্টিলারী ব্রিগেড, দিনজান, আসাম
৮। ১টি মাউন্টেন ব্রিগেড, আলং, অরুনাচল
৯। ১টি মাউন্টেন ব্রিগেড, লোহিতপুর, অ[illegible]চল
১০। ১টি মাউন্টেন ব্রিগেড, মানমা[illegible]নাচল
১১। ২১ মাউন্টেন ডিভিশন, [illegible]পয়া, আসাম
১২। ২১ মাউন্টেন আর্[illegible]রী ব্রিগেড, হাতিগড়, আসাম
১৩। ১টি মাউন্[illegible] ব্রিগেড, রূপা, অরুনাচল
১৪। ১টি মাউন্টেন ব্রিগেড, ঠাকুরবাড়ী, আসাম
১৫। ১টি মাউন্টেন ব্রিগেড, রঙ্গিয়া, আসাম

<u>৩৩ কোর-খাপরাইল, শিলিগুড়ি</u>

১। ৩৩ আর্টিলারী ব্রিগেড, খাপরাইল, শিলিগুড়ি
২। ১৭ মাউন্টেন ডিভিশন, গ্যাংটক, সিকিম

৩। ১৭ মাউন্টেন আর্টিলারী ব্রিগেড, গ্যাংটক, সিকিম
৪। ৪টি মাউন্টেন ব্রিগেড, গ্যাংটক, সিকিম
৫। ২০ মাউন্টেন ডিভিশন, বিনাগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ
৬। ২০ মাউন্টেন আর্টিলারী ব্রিগেড, বিনাগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ
৭। ৩টি মাউন্টেন ব্রিগেড, বিনাগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ
৮। ২৭ মাউন্টেন ডিভিশন, কালিমপং, পশ্চিমবঙ্গ
৯। ২৭ মাউন্টেন আর্টিলারী ব্রিগেড, কালিমপং, পশ্চিমবঙ্গ
১০। ৩টি মাউন্টেন ব্রিগেড, কালিমপং, পশ্চিমবঙ্গ

<u>১০১ এরিয়া-শিলং</u>

১। ১০১ এরিয়া, নারানজি, আসাম
২। ৪১ সাব এরিয়া, জোড়হাট, আসাম
৩। ৫১ সাব এরিয়া, নারানজি, আসাম
৪। ৫৮ জিটিসি, শিলং, মেঘালয়

বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতীয় বিমান বাহিনীর অবস্থান

হাসিমারা
২৪টি মিগ-২৭
৩০টি মিগ-২১

বাগডোগরা
৪টি মিগ-২১

তেজপুর
১৬টি মিগ-২১

চাবুয়া
৪টি মিগ-২১

বোরঝাড়
২৫টি ডরনিয়ার বিমান

কালাইকুন্ডা
২৪টি মিগ-২৭

নেপাল
ভুটান
হাসিমারা
বাগডোগরা
গৌহাটি
তেজপুর
চাবুয়া
ভারত
বাংলাদেশ
কোলকাতা
কালাইকুন্ডা
বঙ্গপোসাগর
মায়ানমার
আই এস ভিরাত
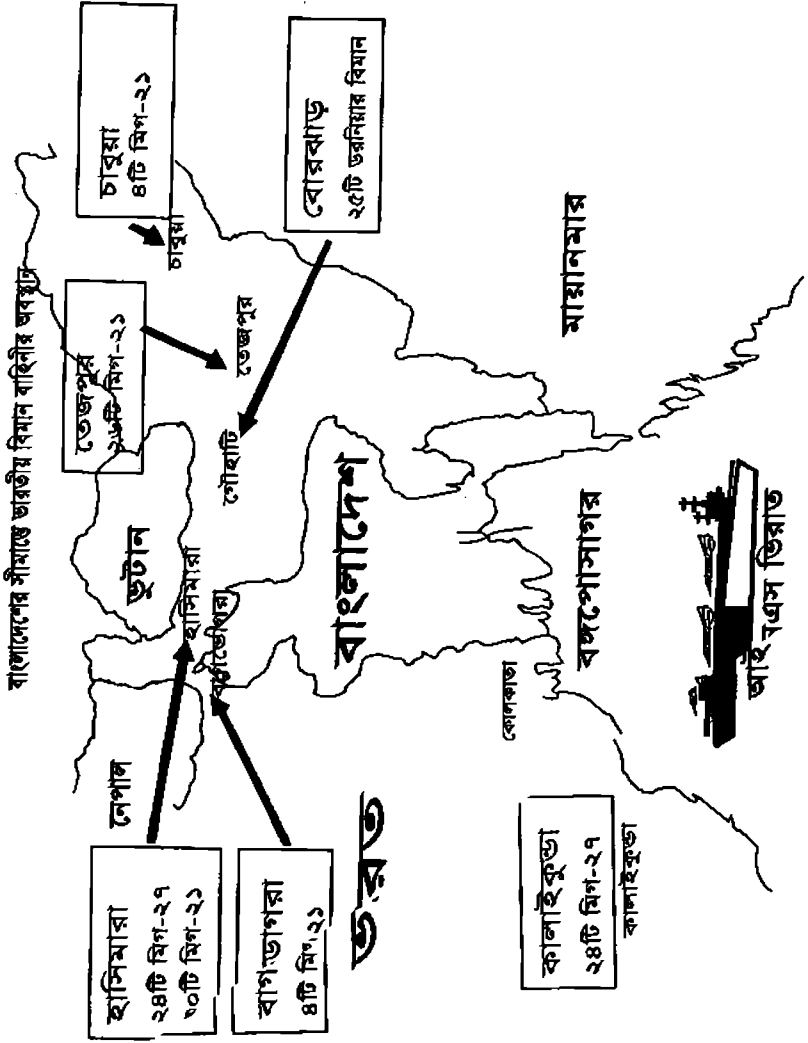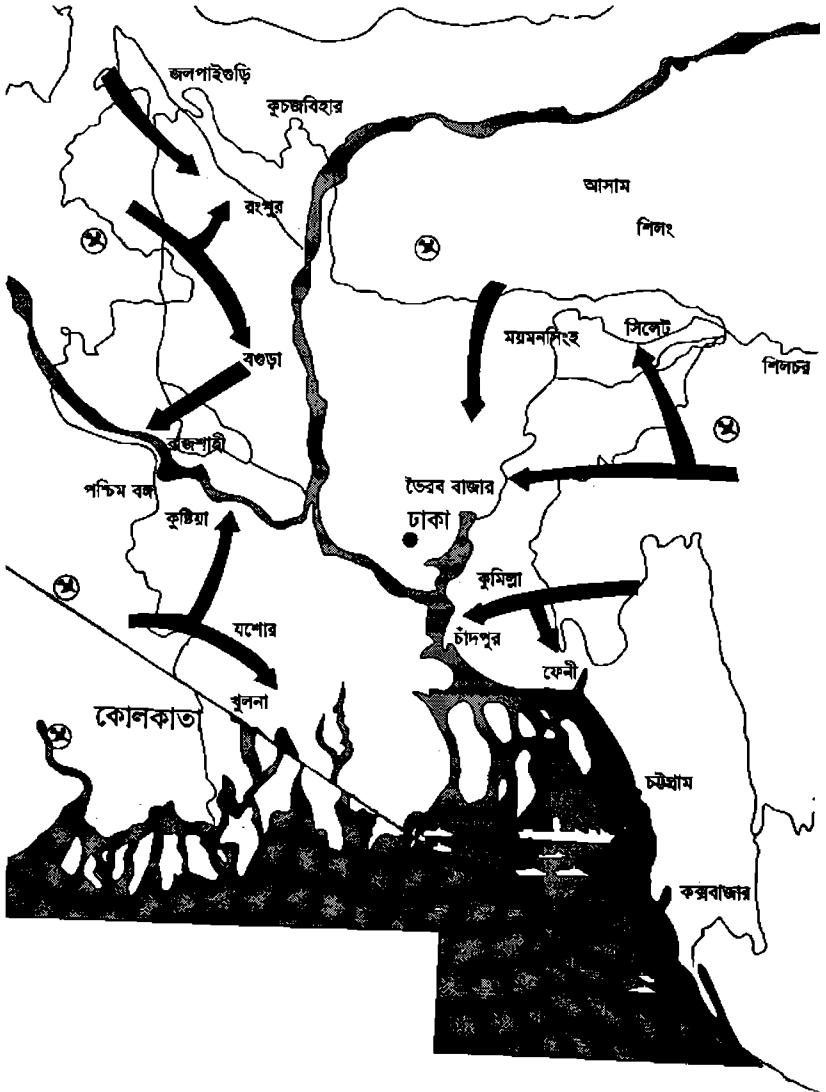
এশিয়ার দেশসমূহের সামরিক ব্যয় (১৯৯৮-২০০২)
(বিলিয়ন ডলার)

	নিউজিল্যান্ড	ফিলিপাইন	ভিয়েতনাম	ইন্দোনেশিয়া	উঃ কোরিয়া	মায়ানমার	থাইল্যান্ড	মালয়েশিয়া	পাকিস্তান	সিঙ্গাপুর	অস্ট্রেলিয়া	ভারত	তাইওয়ান	দঃ কোরিয়া	জাপান	চীন(প্রকৃত)	চীন (বাজেট)
২০০১	০.৬৮	১.৪	১.৮	১.৩		১.৭	২.৮	১.৯	২.৬	৪.৩	৬.৬	১৫.৬	৮.২	১১.৮		৪০.৪	১৭
২০০০	০.৮	১.৫	০.৯৫	১.৫	২.২	২.১	২.৫	২.৮	৩.৪	৪.৮	৭.১	১৪.৭	১২.৮	১২.৮	৪৫.৬	৪৫.৬	১৪.৫
১৯৯৯	১০.৮২	১.৬	০.৮৯	১.৫	২.১	২	২.৬	৩.২	৩.৫	৪.৭	৭.৮	১৪.২	১৫	১২	৪০.৮	৪০.৮	১২.৬
১৯৯৮	০.৮৮	১.৫	০.৯৩	০.৯৫	২	২.১	২.১	১.৯	৪	৪.৮	৮.১	১৪.১	১৪.২	১০.২	৩৭.৭	৩৭.৫	১১

সূত্র : **IISS Military Balance**

ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক ব্যয় (১৯৮৭-১৯৯৭)
(বিলিয়ন ডলার)

	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	[illegible]	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭
পাকিস্তান	২.৯	২.৯	২.৯	৩.৩	৩.৩	[illegible]	৩.৬	৩.৭	৩.৪	৩.৫	৩.৪
ভারত	৭.৭	৭.৯	৭.৯	৭.৭	[illegible]	৭	৭.৯	৮.৬	৮.২	১০.৩	১০.৯

সূত্র : **World Military Expendit·· ~ and Armed Transfers**

এক্স-কোপ সাউথে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর
কয়েকটি জঙ্গী বিমান ফরমেশন ফ্লাইং করছে
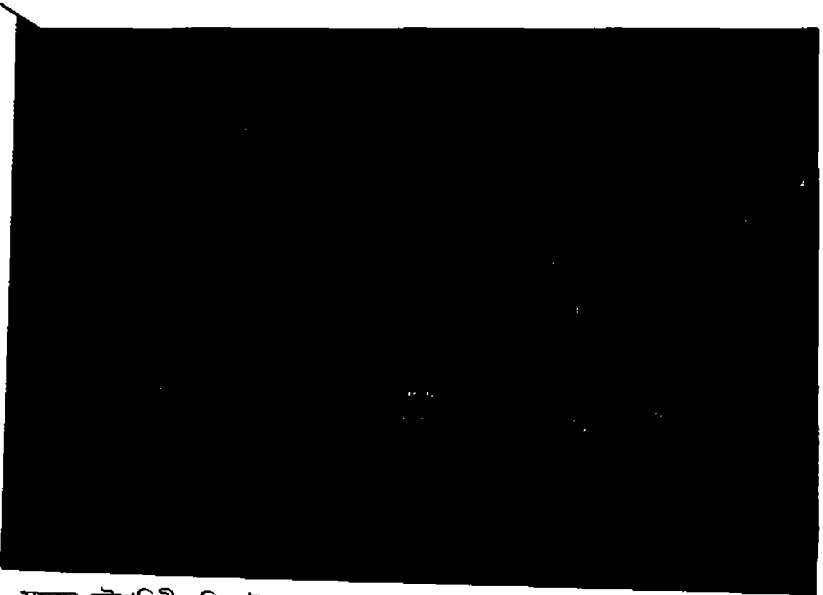
সমুদ্রে নৌবাহিনীর ফ্রিগেট এর সাথে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের সমন্বয়ের দৃশ্য
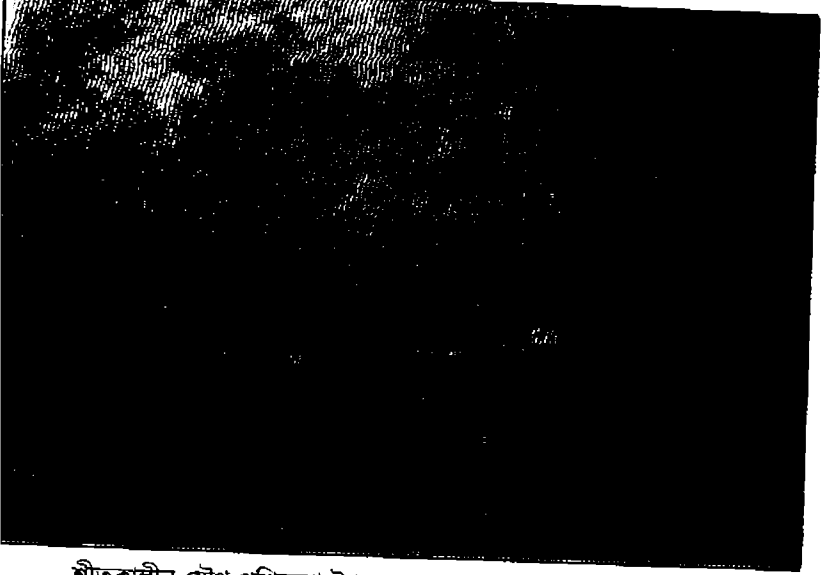
শীতকালীন যৌথ প্রশিক্ষণে ট্যাংকসহ আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব
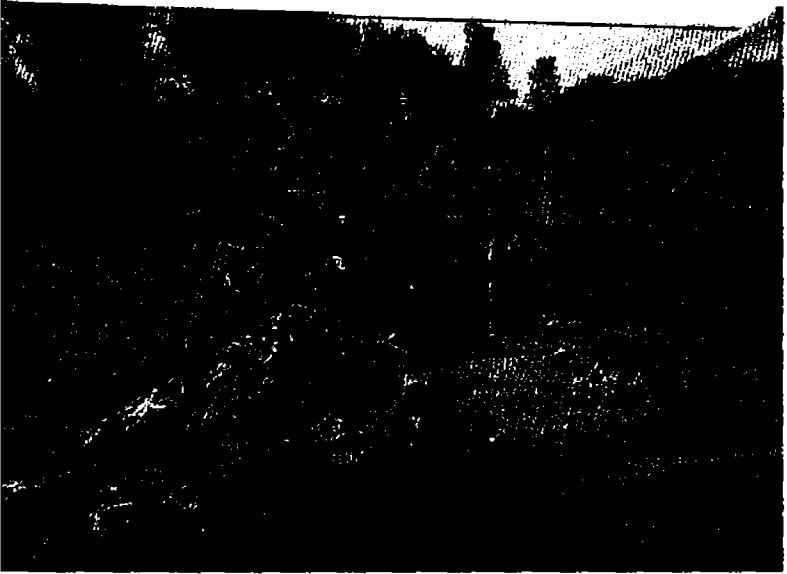
গ্রীষ্মকালীন যৌথ প্রশিক্ষণে ব্যাটালিয়ন পর্যায়ের আক্রমণের প্রস্তুতি পর্বে একটি পদাতিক ব্যাটালিয়নের সৈনিকবৃন্দ

সৈনিকদের ফায়ারিং অনুশীলনের দৃশ্য

সেনা সদস্যরা রকেট লাঞ্চার ফায়ার করছেন

১০৬ মি. মি. আর. আর. ফায়ারিং-এর দৃশ্য

কমান্ডোদের পানি বাঁধা অতিক্রমের দৃশ্য